আধুনিক বাংলা কবিতায় নিজেই একটা যুগের প্রবর্তন করেছিলেন সমর সেন, আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে, যখন প্রথম তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতার ভাব-ভাষা এবং গদ্যছন্দের অভিনবত্ব এমনই সংক্রামক হয়ে উঠেছিল যে, এমন কি, প্রতিষ্ঠাবান কবিরাও তার প্রভাব সেদিন এড়াতে পারেন নি। সাম্প্রতিক নগরজীবনের গ্লানি বিকার বিক্ষোভ ক্লান্তি, হতাশা এবং বিদ্রোহ, যেন মূর্ত হয়েছিল সেই সব কবিতায়। তার প্রেরণা ছিল সামাজিক বিক্ষোভ আর শ্রেণীসংঘর্ষের চেতনা। আজ, বিশ্রুপে, তির্যক কটাক্ষে সেই সব কবিতার দৃপ্তি কাব্যপাঠকের মনে কিছুমাত্র মলিন হয়নি।

সমর সেন আর নূতন কবিতা লিখছেন না, এবং তাঁর ধারণা যে আর কখনো লিখবেনও না। ইতিমধ্যে তাঁর সব কাব্য-গ্রন্থ নিঃশেষিত হয়েছে। এ-অবস্থায় ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬—এই বারো বছরের সমগ্র রচনাবলী থেকে তাঁর নিজের নির্বাচিত এই সংকলন নিঃসন্দেহে মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। সিগনেট প্রেসের বই। দাম আ০

সিগনেট বুকশপ
১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ

সমগ্র প্রাণের সুবিখ্যাত

গোল্ডেন

আমলা

হেয়ার অয়েল

কেশ চর্চা, ও কেশ চর্চার
শ্রেষ্ঠ প্রসাধন বলে, সকল
ও গুণে [illegible]

আজই ব্যবহার করুন এবং
[illegible] দোকানে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা · বোম্বাই · কানপুর

পূজোর আনন্দ...
প্রিয়জনের মিলনে
পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠুক
পূর্ব রেলওয়ে

ছোটো ছেলেমেয়েদের আনন্দদায়ক সরল সরস কবিতাবলী।
অনেকগুলি কবিতা এই প্রথম গ্রন্থে সংকলিত হল।

সূচীপত্র।

চিত্র	বিচিত্র
উষা	ছোড়দা-বোড়দা
আমাদের পাড়	স্বপন
জোতিরিন্দ্র	উড়ো জাহাজ
ঝড়	এক ছিল বাঘ
ছোটো নদী	বিষম বিপত্তি
ছোটো ফুল	আমকাঠ
শরৎ	কুপু
শীত	উল্টোরাজার দেশ
আগমনী	ঘাসেছাড়া
পৌষ-মেলা	ছবি-আঁকিয়ে
উৎসব	চিরকুট
ধুলা	চলন্ত কলিকাতা
লাভ	অদ্ভুতুরি
নতুন দেশ	সুন্দরবনের বাঘ
কাঙাল	চমৎচিত্র
তপস্যা	পিসারি

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসুর আঁকা বহুবর্ণ মলাট। কাগজের মলাট মূল্য ১৸০
শ্রীনন্দলাল বসুর অঙ্কিত বহুবর্ণ প্রচ্ছদপট ছাড়া তাঁরই আঁকা
আরো একখানি রঙিন ও এগারো খানি হাফ্‌ টোন্‌ চিত্রে
ভূষিত, কবির প্রতিকৃতি-যুক্ত, বাঁধাই, শোভন সংস্করণ ৩৲

বিশ্বভারতী

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬১

উনবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

ত্রৈমাসিক সংখ্যা ৭১

মায়াবী কবি র‍্যাঁবো

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে সর্বদেশের ও সর্বকালের একজন মস্ত বড় কবি জন্ম নিয়েছিলেন ফ্রান্সে—তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব প্রথম পালিত হ'ল অক্সফোর্ডে, তারপর ফ্রান্সে, তাঁর জন্মস্থান শার্লভিল শহরে। দেশ-কালের পারের উর্ধ্বে যে-কথা, সেখানে প্রাদেশিকতার প্রশ্ন অবান্তর, তাই এই অবসরে ফ্রান্স থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের অধিবাসী হ'য়েও আমরা তাঁকে স্মরণ করছি। তাঁর কাব্যের অজস্র দিকের মাত্র একটি নিয়ে আমাদের এই আলোচনা—তাও হয়তো অসম্পূর্ণ এবং উপযুক্ত জ্ঞান ও দৃষ্টির প্রসাদের অভাবে দুষ্ট।

তবু শ্রদ্ধাই হোক এই নিবন্ধের শেষ কথা।

•

যদি এইরকম বলি, সচেতনতম মানুষও এমন মুহূর্তে এড়িয়ে যেতে পারে না যা তাকে অনিবার্যভাবে আত্মকেন্দ্রের আসনে বসিয়ে দেয়, যেখানে সে মানতে পারে না, মানতে চায় না কোনো কার্য-কারণ; পৃথিবীর হাতে-দেখা চোখে-দেখা রীতি-নীতির মধ্যেও অনির্দেশ্য ভয়ের ইন্দ্রজাল ঘনিয়ে উঠেছেই, কেননা সব সত্ত্বেও কেউ-না-কেউ কোথাও-না-কোথাও প্রতি মুহূর্তেই আশা ভঙ্গ করছে, করছে সন্দেহ, মনে মনে বোঝাপড়ার অন্ত নেই; যদি বলি, আচ্ছা তুমি ঠাণ্ডা মানুষ, ঠিকমত চলাফেরা করো, কাজ করো, সময়ে খাও-দাও-ঘুমোও,

তবু তোমার অজানিত কারণে হঠাৎ কি তোমার চমক লাগে না কখনো, মনে হয় মুহূর্তে একটু থামতে, অন্তত কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্যে—যখন সময় মত সব ঠিক হয়ে যায়, পদে পদে ত্রুটি অনুভব করো, অসুস্থ তখন, যখন একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে নিজেকে প্রস্তুত করো, কপালে হাত দাও, নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে শঙ্কা-তাড়িত হাতড়াও, নাম দাও তাদের, নিয়তি বা ভবিতব্য? যদি বলি, একান্তে পাবে না সেই মুহূর্ত, সুযোগ খুঁজতেই হয় জীবনে, খুলতেই হয় আশা-নিরাশার, মাপ তো ঠিক যেমন অনিশ্চিতে—যদি ভুলও হয়, তাতো হয় ভবিষ্যতে, হয়তো পাবে সঙ্গীর সঙ্গ; এই যে ঘরে, বা আশা নেই, বিরক্তি আসে, যাতে চটপট ওঠে যাও, সে-আশা কি সম্পূর্ণরূপে মানসিক নয়?

এই প্রশ্ন যদি বলি, তা হ'লে নতুন তোমার কথা আমি বলব না। কিন্তু উত্তরে যদি বলি, ফুরোবে যাবে না, এই যে 'অকারণ' ভাবনা, পাশের ঘরে যে এই 'আ' বানানে ভেবেছ, এই সব কি আমাদের নিত্যকর্ম সমাজেরই অবশ্য প্রতিচ্ছবি নয়, যে সমাজে পরস্পরবিরোধী সত্তার একমাত্র সত্তা, যেখানে নিরাপত্তা বলে কিছু নেই, সবই সুযোগের ওপর, আশা আর ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করছে, কপালে হাত দিতে হয় যেখানে, যেখানে একটা কেরানির চাকরির জন্যে বাপান্তখানেক আবেদন পড়ে, তার মধ্যে পি-এইচ-ডিরাও যদি যান না? তাহ'লে জানি অপর পক্ষ প্রতিবাদ করবে, বলবে, তবে তোমার ভালোবাসা, তোমার কাব্য, তোমার সংগীত, তোমার শিল্পকলা? যখন ভালোবাসো তাইকে, অনির্বচনীয় বেদনা অনুভব করো না? তোমার কাব্য, তা কি সেই 'কাশের বনে শুভ্র নদীর তীরে' 'লক্ষ ঝীলের জলে' অকারণে ঝীল ভাসিয়ে দেওয়া নয়? গানে গানেরই পর মনের কেন ওঠে, মিলনের পর বিরহ মেঘেই বা আসে কেন—আর যখন ঘরোয়ি কাব্যোচ্ছ্বাস মিলন-কাহন ভেঙে কোমল 'রে' লাগিয়ে দাও, সভাসুদ্ধ 'সাধু সাধু' রব পড়ে না? শিল্প-কলাতেও দেখ, ছবিকে ফোটোগ্রাফ করবে না কিছুতেই শিল্পী।

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ কথা নয়। কারণ তাতে এমন উজানে যাইতে হবে যে হাত ছেড়ে দিতেও পারে। বহু শত শতাব্দীর অনুকোষ-

শাস্ত্রের ঐতিহ্যের বিরোধী হওয়া কম বুকের পাটা নয়। আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধের জন্যে কাব্য নিয়েই পড়ি আপাতত।

এক আর একে শুরু হয়, দুই আর একে তিন—তিনকে তিন দিয়ে গুণ করলে নয় হয়। কিন্তু এইভাবে কাব্য নিশ্চয়ই চলবে না, আমরা এ-সত্যকে অস্বীকারও করবে না কখনো। মায়া অতিক্রম করে যাবো, এ সেই শ্যাঙ্কিকের মায়া। এর মূলে আছিমযুগের সেই 'মানা' অথবা আফ্রীকার 'আরুণ্ডিনচা'র মতন আকাশ-পাতালের স্বপ্ন। মুস্কিল হচ্ছে এই যে আজ যাঁরা কাব্যের এই অনির্বচনীয়তা, এই 'absolute'-টুকু নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছেন, তাঁরা প্রায়ই ভিক্টোরিয়ান এই সন্দর্ভটাকে কাব্যের একটা শাশ্বত গুণ ব'লে, তাঁরা ভুলে যান যে সব কিছুরই মতন কাব্যেরও একটা ইতিহাস আছে, তারও একদিন জন্ম হয়েছিল এবং যেহেতু কাব্য মূলত বাক্য ও বাক্য একটি সামাজিক সম্পদ, সমাজই তাদের পরিবর্তিত নিয়মে।

আদিম কালে কাব্যটাই ছিল মানুষের একমাত্র সাহিত্য। তার কারণ যেমন সামাজিক, পরবর্তীকালে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উৎপত্তিরও ইতিহাস তেমনি সামাজিক। মানুষ যখন ধরে রাখতে চাইল সত্যকে, যে-সত্যকে নিয়ে সে প্রস্তুত হয়েছে, যে তাকে আশা দিয়েছে, তার বাঁচার সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ। প্রথম কাব্য তাই তার নৈসর্গিক অনুধ্যান, রোষ, মৃত্যু, দুঃখ ইত্যাদি নানান কাল্পনিক ও অকাল্পনিক শত্রুর বিরুদ্ধে সামাজিক মন্ত্র, মাঠে কখন বীজ বুনতে হবে, তার ঠিকুজি। কিন্তু সেই মন্ত্রটুকু বা ঘড়াটুকু কেবল মুখে আওড়ালে (সেখার সব তো ছেড়েই দিলাম, সেটা সৃষ্টি হয়েছে অনেক পরে) কোনো চমৎকারিত্বই থাকত না তার প্রোক্তৃবৃন্দের কাছে। তাই তাকে গাইতে হ'ত, সঙ্গে সঙ্গে নাচতে হ'ত নানারকম অঙ্গভঙ্গি ক'রে। নাচ গান ও কাব্যের উৎস একই। তাই ধীরে ধীরে মানুষ নিজেকে খুঁজে নিতে আরম্ভ করল প্রকৃতির মধ্যে, অনুধাবন করল তার শক্তি, শিকার থেকে কৃষিবিদ্যায় হাত পাকানো সুরু হ'ল, গৃহপালিত করল পশুদের, জন্মালো অর্থের জ্ঞান, ব্যবসার লেন-দেন, তাই তার সাংস্কৃতিক জীবনেও বহুতর নতুন অধ্যায় ধীরে ধীরে খুলে যেতে লাগল। কিন্তু সেই যে আদিম রীতি

ছিল কাব্যের, উঁচু পর্দায় বেঁধে বেওয়া কোনো কথাকে, সেই ঐতিহ্য মানুষের হাঁটি-হাঁটি-পা-পা সভ্যতার ইতিহাসে একেবারে মিলিয়ে গেল না। এমন কি আজো অনুরক্ত অনেক উপন্যাসিক গানে (বা ছড়ায় বা কাব্যে) এই উঁচু পর্দায় বেঁধে বেওয়া কথার সুরটি সহজেই কানে ঠেকে এবং সেইখানেই তার মনোহারিত্ব। ধরা যাক ওয়ার্ডসের এই গানটি :

সবুজ সবুজ ঘাস
সকাল সবুজ ঘাসে
হাঁটি পথের ঘাস যে রে তাই না।
হাঁটি পায়ে
চলি পায়ে
পা তো থামে না
হাঁটি থামে না।

(ফ্রেঞ্চ থেকে অনুবাদ। আর বসু—'কবিতা', আশ্বিন-পৌষ ১৩৫৮)

এই যে প্রতিটি পংক্তির শেষে 'ঘাস' 'না' ইত্যাদি শব্দের হঠাৎ থেমে যাওয়া ঢেউ কানে এসে লাগে, এর মধ্যে একটি মায়া আছে, এই সুর সাধারণ কথোপকথনের নিশ্চয়ই নয়। অনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস ইত্যাদিরও মূল একই জায়গায়—এই অসাধারণত্ব ও মনোহারিত্ব বজায় রাখবার তাগিদেই তাদের সৃষ্টি। যেমন বলি,

কী ফুল ফুটিল বিপুল অতলে
মত্ত ছড়াল ভুবন প্রাঙ্গণে—

তখন যা বলছি, তা ছাড়িয়েও আরেকটা কিছু বলছি—সেই-বলা বলা হ'য়ে গেলেও থেমে যাইল না, বাজতে লাগল নিঃশব্দের মধ্যে। তা হ'লে কি বলছ, এক অর্থে সমস্ত কবিই যাদুকর, সমস্ত কবিতাই যাদুকরের মায়াযন্ত্রে উদ্বোধিত ?

কিন্তু মুস্কিল হ'ল ঐখানেই। একথায় যখন অসাধারণকে মেনে নিলাম,

প্রশ্রয় দিলাম, তা আমাদের মাথায় চ'ড়ে বসল। এই অসাধারণকে যদি সকলে মিলে মেনে নিতে পারতাম, যেমন মেনে নিয়েছিল আদিমরা, তা হ'লে সমস্যাটা হয়তো এতটা কঠিন হ'ত না। ছড়া থেকে গাথা-কাব্য, তা থেকে রোমান্টিক কবিতা, তারও হরেক রকম শ্রেণী-উপশ্রেণীর মধ্যে এই অসাধারণের চেতনা দিনে দিনে বেড়েই যেতে লাগল। আজ এই বিশ শতকের শেষার্ধেও ঠিক পথের পথিক সমস্ত কবিদের ভরোসা এই যত সব অসাধারণ, তা একান্তভাবেই তাদের নিজের নিজের সম্পত্তি, অন্য কারুর নয়।

পরিষ্কার ক'রে বলতে গেলে, আদিমের উঁচু পর্দায় বেঁধে দেওয়া পদ্যে যে মাত্রা ছিল বুদ্ধির অগোচর, তাকে তারা সকলে মিলে উপভোগ করত তাদের সেই রকম অবোধ্য নাচ-গানের অনুষ্ঠানে, আগুনের চারপাশে দল বেঁধে সমবায়-নৃত্যে উদ্দাম হয়ে। কিন্তু আজকের আধুনিক কবি যখন 'অবোধ্য গীত', 'অচলায়ন অবগাহন' অথবা এই ধরনের আরো অনেক 'অসাধারণ' ছাঁদাবাঁধির ফেলকি দেখায়, তাতে সে নিজেই মুগ্ধ হয়, অন্য কাউকে কাছে টানতে পারে না। বুদ্ধির উল্টো পথে এই অভিযানে অবাধেই রয়েছে, আজ না-হয় অনুপ্রাস অন্ত্যানুপ্রাস ও নানারকম উপমার ঝাঁক-জমকে তার ঘোড়টা একটু বেঁকেছে, তবু তা জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে—যা ছিল সংস্কৃতির, তা একান্তভাবে ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়-বস্তুর দিক থেকেও কবিরা এত বেশি আত্মানুসন্ধানী যে তাদের সমস্যা একমাত্র তাদেরই সমস্যা, তার সঙ্গে বিশ্বের কোনো জনসাধারণের এতটুকু যোগ নেই। তাই আজ কেউ যদি গোমার

> শহর শহর গান
> সকল শহর ধ্যান
> ছাঁটি শহর ধান সে যে ভাই না,

তা আদিম হ'লেও, অনুন্নত হলেও, তাই লোকে শুনবে কান পেতে। সেই মাথার চেয়ে কানা মাথা ভালো।

ম্যাজিকের অন্তত দুটি প্রধান ধারা যা কাব্যের অন্তর্বস্তুতে অনুসৃত হয়েছে, তার একটি হ'ল অনির্বচনীয় পবিত্রের চেতনা, অন্যটি অপ্রকাশ্য মন্ত্রের ধারণা। আদিমদের 'মানা' (mana) অথবা 'টাবু' (taboo), এই দুয়ের পথেই 'absolute' খুঁজে গিয়েছেন কবিরা। ইচ্ছা বা কল্পনার সর্ব-শক্তিমত্তা, অর্থাৎ আমি বলছি ব'লেই এটা সত্য, আমি চাই ব'লেই এটা হবে, কাব্যের এই ধারণাটিও একান্তভাবে আচ্ছন্নতা। যা কিছু অনির্বচনীয়, যা কিছু বুদ্ধির অগোচর, তার সঙ্গেই ম্যাজিকের সম্বন্ধ। সার্থক জাদু-ব্যবহার কাব্যে এই মুহূর্তে কোন রূপে রক্ষিত হবে, তা বলা হয়তো সহজ নয়—তবে নিশ্চয়ই তেমনভাবে নয় যেমনভাবে ছিল এখন। আজকের সাধারণ লোক কাব্য পড়ে না—কেনই বা পড়বে? বোদলেয়ারের উক্তি মনে পড়ে: 'অতএব এই সব কুহকিনী ছাড়ো, হে, অধৈর্যবান ও অসহিষ্ণু, তোমরা ছিটকে পড়ো; পুরোর ঘোড়াকে দিয়ে যাক তোমাদের আলস্য ও নিঃসঙ্গতার বাস্তবীয় সৃষ্টি সব; কেনে ফারেথের দুধের মতো শুকদেব মত তোমাদের মুক্ত অহংকার ছাড়ো তোমরা নিজেদের বিছিয়ে যাও যেখান থেকে বেরিয়েছে তোমাদের এই সব স্বকপোলকল্পিত অস্থির মল, রোমান্টিক চেতনার আক্রান্ত পাল পাল ভেড়া।'

আর র্যাঁবো, ফরাসী সিম্বলিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবি, তিনি হ'তে চাইলেন 'voyant', যথার্থ অর্থে দার্শনিক। অন্তর্দৃষ্টির পথে আর যাবে না যন, এবার চোখ-কান খুলবে, জগৎ দেখবে, শুনবে, বোঝবার চেষ্টা করবে। তবু, হায় র্যাঁবো!

র্যাঁবোর কথায় আসবার আগে আমাদের এই ভূমিকাটুকুর দরকার ছিল ম্যাজিকের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক কী, সেই সম্পর্কে কতখানি জোর রাখা চলতে পারে আগামী কালের কবিতায়, সেটুকু আলোচনা করবার জন্যে।

২

'ইন্দ্রিয়ভূত যাহা অতিশয়' র্যাঁবোর জীবনই হ'ল তাঁর কাব্যের ভূমিকা। কোনটা আসল, তাঁর কাব্য না জীবন, বলা মুস্কিল। একাধিক মৃত্যু ঘটে

কাপুরুষদের—কিন্তু এই দুর্জয়তম বীরেরও মৃত্যু ঘটেছিল ভীরুর—প্রথম মৃত্যু তিনি বহন করেন। তাঁর প্রথম জীবন নিয়ে একটু আলোচনার দরকার, কারণ সেইখানেই মহাত্মা কবির সমস্ত সাধনার বীজ—নাটক আবেদনগীতের মত তাঁর সেই প্রথম জীবন মূল সুরের সঙ্গে আশ্চর্য সঙ্গতি রেখে গেছে।

শার্লভিল বেলজিয়ামের ঘাড়ে ফ্রান্সের প্রান্ত-সীমানায় ছোট্ট একটি শহর—সেইখানে জন্মালেন র‍্যাঁবো ১৮৫৪ সালের ২০শে অক্টোবর। ছেলেবেলা থেকেই গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে, সমস্ত রকম শাসন ও বুদ্ধিমার উর্ধ্বে। বাপ ছিলেন কবযুদ্ধে এবং অপূর্ব খরচে, সংসারী হবার জন্যে যারা জন্মায়নি, তাদের অন্যতম। মায়ের ছিল আশ্চর্য ধৈর্য, নিষ্ঠা, এবং যে পথে চলতে চান, তাঁদের বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নিজেকে নিজেকে সেই পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা। চাষীর ঘরের মেয়ে তিনি, মন ছিল ব্যবসাদারী, অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিলেন তিনি, উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকেও ক্ষমা করেননি কখনো। ছেলের বাড়াবাড়িতে মনে মনে তিতিবিরক্ত হ'লে উঠলেও মুখ ফুটে একটি কথা বলেননি, আসলে তার সম্বন্ধে সমস্ত হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। ইসাবেল, র‍্যাঁবোর বোন, বলতে গেলে সারা জীবন দুঃখ ক'রে গেছেন ভাইয়ের সর্বরকম অবিবেচনার বিরুদ্ধে। তার মৃত্যুশয্যা এসে ঘিরল তাঁকে ভয়ের সন্ধান। মায়ের কাছে চিঠিতে লিখছেন (২৮-১০-১৮৯১) : 'ওঁয়াকে শত সহস্র ধন্যবাদ। গত র‍্যাঁবোর এমন একটি সুখবর পেলাম যা আমি পরম আনন্দের সঙ্গে স্মরণ রাখব চিরকাল। আর আমার চোখের সামনে ঘিরে ঘুরে বেড়াবে না একটা পথভ্রষ্ট হতভাগা জীব—আজ সে মানুষের মত মানুষ, সহীম, সুকৃতোভয়, যাকে তুমি নির্বাচন করেছ, ভগবান! ধন্যবাদ তোমায়, অশেষ ধন্যবাদ।'

এই আশ্চর্য অভিধানকে র‍্যাঁবো বহন ক'রে গেছেন তাঁর জীবনে, বিশেষত তাঁর কাব্যে, এক শুদ্ধ, সুচেতা, নির্ভীক, অকুণ্ঠনীয় সাধীনতার সঙ্গে। নিজেকে ছড়িয়ে গেছেন বহু দূরে, দেখতে চেয়েছেন পরিষ্কার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে, যথার্থ চিত্তপ্রসন্ন মনে। বেদনা থেকে বিরাম খুঁজেছেন এক অপূর্ব ছেলেমানুষি আনন্দে, যে আনন্দ শুধু শিশুরাই উপভোগ করতে পারে। তাই আশ্চর্য হই না যখন এই কিশোরকে হাত দিতে দেখি উগ্র ও ভ মুক্ত নাটকে—ওঁয়া

আর্কি 'colossal vulgarians'। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসকে এই মোসাহেব-বাওয়া ছেলে মেয়ে অসভ্যতার এক পঙ্কিল জলের মত একটি মাত্র ঢু'তে উপবাস ক'রে উঠিয়ে দিলেন। লিখলেন ষোল বছর থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত। ব্যস, তারপর সব শেষ। 'তখন নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাই না,' পরে বলেছেন। আসলে লেখবার আর কিছু ছিল না; তাঁর সমাজ, তাঁর পারিপার্শ্বিক তাঁকে এমন কোনো অভিজ্ঞতার আলো দেখাতে পারেনি যা নিয়ে তিনি আরো পরীক্ষা চালাতে পারতেন। নিরাসক্ত ভাস্কর্য, কবিতা তাঁর অনেকগুলি খেয়ালের একটি মাত্র বই তো নয় ('une du mes folies')!

ফিরে যাওয়া যায় তাঁর জীবনে, পারী-কম্যুনের সেই গৌরবময় দিনগুলিতে। যখন সমস্ত ফ্রান্স বিপন্ন, প্রুশীয় সেনাবাহিনী উপকণ্ঠে পৌঁচেছে—তখন, বলা বাহুল্য, ঢাকোয়েও আর অস্তিত্ব নেই। পারী 'কম্যুনার্দ'দের হস্তগত। ষোল বছর বয়স তখন, কবি হেঁটে আসছেন শার্লভিল থেকে সাত ফেড়েনো মাইলের ওপর, পায়ে ঘা এবং শেষের দিকে প্রায় চলৎশক্তিহীন। প্রথম বিপ্লবী শিবির যেটি পেলেন, সেখানে গিয়ে বললেন, আমাকে নাও তোমাদের সংগ্রামে। এর আগে আরো একবার এরকম ক'রে পারী পৌঁচেছিলেন—কিন্তু সেবার ধরা প'ড়ে যান, বন্দী হন এবং শেষে ফিরে আসেন বাড়িতে। এবার এক পক্ষ কালের মধ্যে শুধু আন্দোলনকারীদের দলে নামই লেখালেন না, অনেক উত্তেজনাকর কীর্তিস্তম্ভ জালিয়ে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে হাত লাগালেন তাঁদের সঙ্গে। শুধু এভাবে আর কতদিন চলতে পারে? এখানেও ফিরতে হ'ল—ছিন্ন কুটিকুটি জামাকাপড়ে, চরম ফিকিরায়। মা আঁতকে উঠলেন না, ছেলেকে বরে তুললেন। ছোট্ট সেই মফস্বল শহরের নির্জনতা ও বিরক্তা তাঁর যেন চুঁটি চেপে ধরল। সৈনিক তো কেটে গেছে এই একই ভাবে, কখনো পথে পথে, কখনো অর্ধাচীন শহরের মাস-মা-জামা বাগানে বাগানে। শুধু এবারের এই নির্জনতা আরো তীব্রতর চেতনা তাঁর কাছে। মনে রাখতে হবে, কবির সমস্ত কাব্যের পটভূমিকা এই আশ্চর্য নির্জনতা। তাঁর ট্রাজেডিই হ'ল একেবারে একলা পথ হাঁটার।

ষোল বছরের একটি লেখা এখানে উদ্ধৃত করি—

'বিশ্বাসের পুরীতল সন্ধ্যায় যবে আমি পায়ে-চলা পথ দিয়ে, কয়কণে সন্তের কণায় পা ফেলে, হ'লে যাব ছোট ছোট তৃণদল। স্বপ্নবিলাসী, পায়ে আমার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে—বাতাস বহি চায়, দিক সে ঘুচে আমার সব মুখ।

'বলব না কথা, ভাববও না কিছু, অনন্তের চেয়ে পূর্ণ আমার হৃদয়—প্রকৃতির পথ দিয়ে চ'লে যাব ঘুরে, দূর হ'তে আরো দূরে অন্তহীনের মত—মন খুশিতে ভরপুর কেন সঙ্গিনী নিয়ে চলেছি কোনো।'

সঙ্গিনীর প্রয়োজন নেই, তাকে নিয়ে চলার অনুরূপ আনন্দ আপনার মধ্যেই পেতে পারে এই নিশ্চয়ই। এত অল্প বয়সে সঙ্গিনীর কথা কেন এবং সেই বোধ থেকে মুক্ত হওয়ার স্বপ্নই বা কেন? ড লাফে বলেছেন, বাল্যকালে সমবয়সী একটি প্রেমিকা ছিল চার্লবোর্ড—সে পাখী শিকার করতে অনুসরণ করে ও পরে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। তাই তার কথা উঠলেই কবির মেঘাচ্ছন্ন মুখ, সমস্ত সঙ্গের মেয়েদের প্রতি এক অদ্ভুত ভাবশূন্য নির্লিপ্ততা, কখনো বা ঘৃণাও।

'প্রিয় আমার প্রেমিকারা, ভয় যে দূরে তোমাদের করি।'

অথবা 'মাতাল তরণীর' সেই নির্বেদ, অথচ নিরিবিলির ভাব :

তবু তৃষা কাঁদে। আমি মর্মান্তিক ঈথার কাঁদিয়া,
চন্দ্রমা অনহ চিরকাল, ভিজে রাত্রি-রাত্রি-ভর।
কটুঘাসে প্রেমে তবু শীত হয়ে মাতাল তরণী—
যার-তীর তরী, যার চিরস্থির সমুদ্র-ঘুমন্ত।

শুধু প্রেম অথবা নারীর ব্যাপারেই নয়, ধর্মের ব্যাপারে, ঐতিহ্যের ব্যাপারে, আগন্তিক সমস্ত সংস্কারের ব্যাপারে এই বালক ইতিমধ্যেই মোহমুক্ত। তাই তার বাসনা, একবার ডুব দেবে সমস্ত আবেগের মধ্যে, চেখে চেখে দেখবে যাবতীয় রস রোগ, তাকে হ'তেই হবে বিশ্বের সব চেয়ে প্রাচারোগ্য রোগী, মুক্তি পাবার অযোগ্য অপরাধী, চিরকালের অভিশপ্ত আত্মা এবং সেই সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের মতো যিনি প্রাজ্ঞতম, তাঁর চেয়েও বড় পণ্ডিত। অর্থাৎ এক কথায়

আশ্বিন ১৩৬১

আজ পর্যন্ত সভ্যজগতের যা কিছু 'ট্যাবু', তাতে তো হাত পাকাবেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবন্ধুর যে স্বর্গীয় অনির্বচনীয়তা, তাকেও একবার ছোঁ মেরে কাছে টেনে আলিঙ্গন ক'রে নেবে। হেন আত্মহারার সোহাগাগারে যে বস্তু উৎপন্ন হবে, তাতে নিশ্চয়ই সাধারণ প্রেম অথবা সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখ-বেদনার কথা সঞ্চিত হবে না। তাই একদিকে যেমন :

সুখের আরশুলী অনুক্ষণে
যাবিনি তোমো কাঁকি তোমোইখানে—

এবং

আমার সাথে কথনো মত,
তবু সাথে মত—
সাধ্য আর সাধনা, সবই
বিচ্ছেদময়।
আগামী চিরকালের তরে
আমে তো আমো প্রিয় :
যেখানে ঢাকা আছেন সেই
তোমার মহনীয়।

অন্যদিকে তেমনি

'আমাকে টানে অর্থহীন ধ্বনি, ঘরনার কলস্বর বিশুদ্ধ, অনাদেবীর পট, বিজ্ঞাপন-ফলক, লোকশিল্পের রং-চং, মেকেলে সাহিত্য, গির্জার ভাঙা লাটিন, বাজার-মুদ্রণে ভক্তি আদিরসের বই, প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী, রূপকথা, শিশুদের বই, রং-চ'টে-যাওয়া কাবাদীপ্তি, সরল, অহাটী, অবাঞ্ছিত ছন্দ।'

এমন কি :

'আমার পছন্দ মরুভূমি, জলে-যাওয়া ফলের বাগান, বিবর্ণ গ্রাম্য দোকান, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাওয়া পানীয়। নিজেকে টেনে নিয়ে যাব পচা দুর্গন্ধের কলিগলি দিয়ে বড় আঁধির কাছে, উৎসর্গ করব সূর্যের চরণে, আগুনের দিনি দেবতা।...রূপে আকৃষ্ট সমাহিতের পেছনে প্রধাব-

খানার গন্ধে মাতাল হ'য়ে, মূত্রমূত্রিকারক ভস্ম-উদ্রিকের প্রেরিক সে—
একটু মদির দিচ্ছিয়ে দিয়ে যাক।'

কাব্যের জগতে যা 'ট্যাবু' বা নিষিদ্ধ ঐতিহ্য-অনুসরণকারী কবির কাছে, আদর্শবাদের হাতে তা অস্ত্র।

হেরলেনের কথা বাকিটা জানতে হয় এখানে। 'নরকে এক বছর'-এর শেষে 'বছর দশ, বশ দুর্দশা—কোন হৃদয়ে নেই ফুলের ক্ষত' ইত্যাদির পরে র‍্যাঁবোর বাণী থেমে যায়। তার, তাঁর অভিশপ্ত তাঁর আগাটি খুঁড়িয়ে দিয়েছে বন্ধু। হেরলেন তাঁকে নিয়ে পারী ছাড়তে চাইলেন—নতুন নতুন দেশ, সমুদ্র ইত্যাদির আশা দেখালেন। প্রলুব্ধ হলেন র‍্যাঁবো। উঠলে উঠবার দিকে পাড়ি দিলেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই হেরলেনের সঙ্গ তাঁর কাছে অসহ্য হ'য়ে উঠতে লাগল। দুজনের স্বভাবগত বৈসাদৃশ্য প্রকট হ'তে আরম্ভ করল। হেরলেন তাঁর চাপা কপাল, গর্তে ঢোকা ছোট ছুটি ধূর্ত চোখ এবং স্থূল ও ক্ষুদ্র নাসিকা নিয়ে স্বভাবতই উদ্ভটপ্রকৃতি ও উদ্ভটগঠন র‍্যাঁবোকে নিয়ে কী করবেন ভেবে পেলেন না। ফলে তিনি হ'য়ে দাঁড়ালেন 'নরকে এক বছর'-এর 'পাগলিনী কুমারী', নির্বোধ ও ব্যর্থ প্রেমিকা। মহাদরবারে আহ্বান হল, অথচ কাছ ছাড়তে পারেন না। একমাত্র ভয় তাঁর, যদিচ যেন তাঁকে ছেড়ে না যায়। র‍্যাঁবো তাঁর উত্তর দিলেন 'নরকে এক বছর'-এ :

'নরকের এক সঙ্গীর অকপট স্বগতোক্তি হ'ল :

"প্রভু আমার, প্রিয় আমার, তোমার সেবিকাদের মধ্যে দুঃখীতমা যে, তাকে অধিকার দাও আত্মনিবেদনের—"

'আমি ওর হৃদয়ে ছিলাম এক প্রাসাদের মত যা ঝিক হ'য়ে গেছে ...কেন যে ওর ওপর এত নির্ভর করেছিলাম! কিন্তু আমার এই আদলা মীরস অস্তিত্ব নিয়ে কী করতে চেয়েছিল ও? ওর সংস্পর্শে তা' এতটুকু উন্নত হ'ল না—এক যদি নরকে পাঠি!...এই ভাবে দিনে দিনে আমার দুঃখ থেকেই সেল, নিজেরই ফুল নিজের চোখে প্রকটতর

হ'য়ে উঠেছে··· । আমার প্রথমে বেরোবে, শিকার করব বন-প্রদেশে, ঘুমোবে নাম-না-জানা পশুদের পথহারার অরণ্যে, তুরঙ্গমে। আপনি তখন, দুঃসাহসী শক্তির দাপটে রীতিনীতি সব মেনে পালটে—পৃথিবী সেই সময়তা থেকেও মুক্তি দেবে আমাকে আমার ইচ্ছায়, আমার আনন্দে, আমার অনুরোধে। ওঃ সেই দুঃসাহসী জীবন যা কেবল শিশু-শিল্পিকের বইয়ের পাতাতেই বিরাজ করে, নিজেকে তোলবার জন্যে, মুক্তি পাবার জন্যে যার কথা ভেবে আমি এত দুঃখ পেয়েছি, তুমি কি তা দেবে আমায়?— ও তা পারবে না। ওর আদর্শে আমি বিশ্বাস করি না। আশা রাখবার জন্যে, অনুতাপ সঞ্চয়ের জন্যে কতই না বলেছে ও— তাতে আমার কী লাভ!···এর যে ফিটফাট যুবকটিকে দেখছ, চুলে যে নিঃশেষ সুখের বাড়তির মতো, নাম এর হুতাশ, চুরুট, আর্থা, মোটর—আমি কি জানি না? এমন পাপী পৃথিবীতে একটি নারী সমস্ত জগৎ দিয়ে ভালোবেসেছিল—আজ সে মৃতা, এতদিনে স্বর্গে সে নিশ্চয়ই কোনো বুদ্ধিজীবির আসনে অধিষ্ঠিতা। তুমিও আমায় মারবে তেমন ক'রে যেমন এই লোকটা মেরেছে সেই নারীকে।'

ফ্লাঁবোর এই জটিল কবি-মানসের পিছনে আছে বিচিত্র ঘটনা-সমাকীর্ণ তাঁর জীবন। সমস্তটাই সামাজিক। ফ্রান্সে, যেখানে বিশেষ ক'রে ধনতন্ত্রী সমাজের সংস্কৃতি তার সকল দোষগুণ নিয়ে বিকশিত হ'তে পেরেছিল, একমাত্র সেখানেই এই রকম কবির জন্ম সম্ভব। যে ফ্লাঁবো voyou, পাজোস্কর হুজ্জোড়া, তিনি হ'তে চাইলেন voyant, যথার্থ অর্থে দার্শনিক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যের পথে না গিয়ে গেলেন ম্যাজিকের পথ ধ'রে আপাতসত্যের বাণীকে সমস্যায় করতে, হ'লেন জাদুকর। অন্য ভাবে বলতে গেলে, যে ফ্লাঁবো voyou এবং যে ফ্লাঁবো voyant, তাঁদের দুজনের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। এ ছাড়া তাঁর উপায়ও ছিল না—একে বিদ্রোহ (যতই বিদ্ধ হোন), তার সেই সমাজ। কিন্তু সে-প্রশ্ন পরে আসবে।

নারী সম্বন্ধে ফ্লাঁবোর এক ভাবপ্রবণ নিশ্চিন্ততার কথা বলেছি।

আবার অন্যভাবে বলতে গেলে, নারী তাঁর কাব্যে এক মস্ত বড় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাকে তিনি দেখেছেন যথার্থ প্রকৃতির আসনে, পুরুষের থেকে পৃথক ক'রে, এবং বলেছেন, মনুষ্যত্বের ত্রুটি এইখানেই যে সে নারীকে মুক্তি দিতে পারেনি, বন্দী ক'রে রেখেছে। এই মুক্তির আকাশের দিকে চেয়ে থাকা বন্দিনী নারীর কথা অনেক জায়গায় তিনি বলেছেন। যেমন 'আতাল তরঙ্গী'তে শহীদের প্রসঙ্গে নারীর কথা :

> প্রতিবেশে কঠিনতে আমরা শরীর—নিষ্পাপ
> যাতে খুব মনুষ্যের বিহ্বল-বিলাসে অনুকূল।
> আঁখোর পুষ্পের দৃষ্টি পীত হ'য়ে যাবে ঘুমায়,
> আর আমি ব'সে থাকি বন্দিনীর মতন!...

তবে একেত্রে যা উল্লেখযোগ্য ও বিস্ময়ের কথা, তা হচ্ছে এই যে তেরলেনের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে নারীর এই রকম প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যে আর নেই বললেই হয়।

র‍্যাঁবোর কাব্য প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পটভূমিকাটুকু ছাড়াও আরো যা আলোচনা করার থাকে, তা হচ্ছে তখনকার সাহিত্যিক আন্দোলন। তীব্র আত্মকেন্দ্রিকতা, অকারণ মানসিক বিক্ষোভ-জনিত অনুভূতি, আবেগ ও ধারনার সংকেত, ছায়াবাজি, এসব পেকে বেরোতে পারবার একটা দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা পার্নাসিস্টদের পাগল ক'রে তুলেছিল। মুক্তি আনলেন বোদলেয়ার তাঁর 'অল্প দিনের ফুলশয্যা' দিয়ে। সেই বোদলেয়ার, র‍্যাঁবোর ভাষায় যিনি 'প্রথম দার্শনিক, কবিদের রাজা, সার্থক এক ঈশ্বর জেনে।' বোদলেয়ার প্রবর্তিত 'আর্টিস্টে'র দুটি ধারা দুদিকে প্রবাহিত হ'ল—একদিকে রইলেন মালার্মে ও ভালেরি, অন্যদিকে র‍্যাঁবো ও তাঁর অনুসারী দুর্দম বাস্তবের দল। এঁরা অনুভব করলেন এমন একটি প্রয়োজন যার দ্বারা কবি তাঁর সমস্ত জীবনকে রূপান্তরিত করতে পারবে, একেবারে সত্তার গুহ্য স্বরূপে গিয়ে আঘাত হেনেবারে। 'আমি' ও বিশ্বের যে দ্বন্দ্ব, তার একটা সমন্বয় চাই। বোদলেয়ারের 'সমন্ধ' ('Correspondances') সনেটটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আর র‍্যাঁবো সম্বন্ধে সবচেয়ে যা স্মরণীয়, তা তাঁর

১৮৭১ সালের ১৫ই মে তারিখে লেখা বিখ্যাত চিঠিটি যাতে তিনি কবির আদর্শ ব্যক্ত করেছেন, voyant হ'তে চেয়েছেন। তিনি বললেন, চোখ আর বুদ্ধি মন্থর যে কায়িক পর্দা আমরা টাঙিয়ে রেখেছি, তাকে তুলে দিতে হবে—যা দেখব, তা সাধারণীই দেখব, এবং সেইভাবেই তাকে ব্যক্ত করব।

মালার্মে, ঘনিষ্ঠ সমগোত্রীয় (অবশ্য একটু ভিন্ন অর্থে), র্যাঁবোর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেই আদর্শ কতখানি অনুসৃত হয়েছে, সে বিষয়ে বিশেষ আগ্রহবান ছিলেন না। র্যাঁবোকে বলেছেন 'spiritually exotic', একটা বিস্ফোরণ, যেন একটা উল্কা, কেবল আলোর তরঙ্গই এনেছিলেন, তারপর নিরুদ্দেশ হলেন। র্যাঁবো তাঁর অন্যতম দিক্‌ছেন, 'আমি' 'আমি' ক'রে চেঁচাক তোমরা, কিন্তু 'আমি' একটা মস্ত ভিনিস—ইন্দ্রিয়ানুভূতির চিরাচরিত জানটাকে একটু ওলটাও পালটাও। বললেন, তাহা থেকে যদি কেউ বৈচিত্র্য হয় এবং সেই ভেলা বেয়ে ওঠে, তার তো কোনো দোষ নেই—সেইটাকে মানুষ জগতের একটা সত্য ব'লে মেনে নাও, তা নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না। কিন্তু ট্রাজেডি হ'ল এই যে র্যাঁবো নিজেই (মালার্মে, ভালেরি, কেউ বাদ নন) কায়িক দর্শনের দ্বারা আক্রান্ত, পারসেপ্‌শনিস্ট—আর অন্ধতার ফলে চোখে যে রঙিন পর্দা ওঠে, সেই পর্দার আলোকে তিনি দেখছেন নিজেকে—সে বিস্ময় এবং চেতনাও তাঁরই বর্ণিত 'রঙের শেষে ঢালা মধু অন্ধের অশ্রুক' অনুতাপের হাসির মত দেখতে-দেখতে মিলিয়ে যায়। র্যাঁবোর অন্তরতলে যে-আত্মকলহের বাস, সৃষ্টি তার মন্ত্র নয়, তার মন্ত্র ক্ষয়ের, বিক্ষয়ের—আত্মকয়ের সময় তিনি বহন ক'রে এনেছেন ('le temps des Assassins')। 'ঝাঁসাসি'র মধ্যে অন্তত এমন তিন চারটি কবিতা আছে যার মধ্যে তাঁর এই আদিম বর্বর মনের ছবি বলকিত হ'য়ে উঠেছে।

'আতাল পূর্বাহ্ণে'র শেষের দিকে বলছেন

'আতাল আসনের জ্যোতি একটু ম্লান, তুমি তখনই পবিত্র হবেন
যখন আমাদের পুরস্কৃত করেন তোমার এই মুখোসটুকুর মানে।

তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমরা যাব প্রীতির সঙ্গে—বুলব না, আমাদের সমবয়সী সকলকে তুমি কাল বশ করেছ। সত্যিই আমাদের বিশ্বাস আছে। প্রতিটি দিন কী ক'রে জীবন উজাড় ক'রে দিতে হয়, জানি আমরা।

এই তো বাস্তবের সময়।'

আমি যান্ত্রিকপ্রকরণে এই কবিতাটির সঙ্গে বোদলেয়ারের 'Enivrez-vous'-র ('মাতাল হও তোমরা') তুলনা না-ক'রে পারি না। দুঁাবো যেন অনেক জোরে ঝাঁপিয়ে পড়া। তাঁর ভাষা অনুকরণীয়—কিন্তু যা ভিন্ন।

সবচেয়ে বড় কথা যা এবং যা আমাদের মুগ্ধ আলোড়া, দুঁাবোর দর্শন ঐন্দ্রজালিক আলোকে দীপ্ত। সে শুধু একটা কথার কথাই নয়, বা যে অর্থে সমস্ত কবিই মন্ত্রবশের যাদুকর, সে অর্থে তিনিও যাদুকর, তাও বলা নয়—আসল সত্য এই দাবীর কথার চেয়ে অনেক বেশি। নিজের লোকায় পা যদি সাত বাড়াই, তবে যা দেখাই তাঁর কোন কবিতার কোনখানে পরস্পর-সংক্রামক (contagious) বা সহানুভূতি-সূচক (sympathetic) যাদুবিদ্যের নমুনা রয়েছে, তাতেও কিছু যায় আসে না। অনর্থক কতগুলো গূঢ় পরিভাষা ঢুকিয়ে আলোড়নকে চারাক্রান্ত ক'রেও লাভ নেই। কিন্তু খাঁটি কথা হচ্ছে এই, জাদুকরী বিস্তার ওপর দুঁাবোর একটু নেকনজর ছিল। তাঁর গদ্য ও পদ্যাংশের নানা জায়গায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই সবলতা কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট। 'স্বরবর্ণ' সনেটটি তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ। কিন্তু আরো আছে। বাউডলেরকে উৎসর্গিত কবিতাটি, 'ফুলের প্রসঙ্গে কবিকে কী বললে সে', তার মধ্যে কোনো এক কিগিয়ে-র (Kigoier) নাম পাওয়া যায়। এই ভদ্রলোক ছিলেন একজন লেখক। তাঁর বই বার করতেন 'হাশেৎ' প্রকাশকরা। ভদ্রলোক বই লিখতেন গূঢ় সমস্ত তত্ত্বের ওপর, যাদুবিদ্যের ওপর, alchemy-র ওপর। শুধু তাঁর বই-ই যে দুঁাবো অভিনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন,-তা-ই নয়, গত শতাব্দীর দেবার্ণে'র যাবতীয় গূঢ় তান্ত্রিক এলিফাস লেভির রচনাবলীতেও তাঁর রীতিমত জ্ঞান ছিল। এগুলি প্রমাণিত সত্য।

আশ্বিন ১৩৬১

'আগুন চুরি করা' যাঁর খেলা, যিনি 'অন্ধকার-পথে নিজেকে শিকার' করতে বেরিয়েছিলেন, voyant হ'তে চেয়েছিলেন, 'absolute'-কে জয় করবেন ব'লে পণ করেছিলেন, আত্মিক ছাড়া তাঁর গতি কী? তাঁর অন্যান্য সাহিত্যিক জীবনকে পিছনে ফেলে গেলেন অসীম তরুর স্পর্ধায়, অভূতপূর্ব নির্লিপ্ততায়, সেই ঔদ্ধত্য বয়সের কিশোর। মনুনতন্ত্র বাঘবোয়ালির হাতে আধার আত্ম-সমর্পণ করলেন। কিন্তু হাজার হাত-পুঁথি ঘেঁটেও যে রোগ সারাতে পারে নি, সেই আত্মকেন্দ্রেই নিহিত রাঁবোরও। কোনো 'absolute' পাননি তিনি। শুধু আশা রেখে গেলেন:

'তোমরেলা ধীর এক আগ্রহে নিশ্চল হ'য়ে আমরা পৌঁছব আজব নগরীতে।'

৩

মনে পড়ে কোনো এক রবীন্দ্র-বৃত্তিসভায় এক নাম-করা গায়ককে রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি তার উত্তরে কিছু না-ব'লে শুধু কয়েকখানি গান গেয়ে দিলেন। এর চেয়ে ভালো উত্তর গায়ক দিতে পারতেন না। আমারী কবি রাঁবো সম্বন্ধে অনেক বলবার আছে। বেশি বলার আলোচনা শুধু তারুণ্যের হয়। এবার কিছু উদ্ধৃতি করি তাঁর কাব্য থেকে। এক ধরনের সমালোচকদের মত, বেশি উদ্ধৃতিতে আলোচনা তরল হ'য়ে যাক—কিন্তু রাঁবোর লেখা এত সংহত, এত গুরুত্বপূর্ণ যে তাঁর থেকে উদ্ধৃতিতে আলোচনা তরল হ'য়ে যাওয়ার কোনো ভয়ই নেই কোনোখানে। তা ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে যত প্রশ্ন, তার সবেরই উত্তর একমাত্র তাঁরই লেখার মধ্যে খুঁজতে হবে, আমাদের আলোচনার মধ্যে নিশ্চয়ই নয়।

উদ্ধৃতির প্রসঙ্গে আসলে তাঁর কাছ থেকে পাতার পর পাতা তুলে দিতে ইচ্ছে করে। তবে সে লোভ সামলাতে হবে। অবকাশ কম আমাদের। আপাতত তুলে দিচ্ছি 'নরকে এক ঋতু'-র সুরুটুকু—পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম এই ঔদ্ধত্য বয়সের কাব্যকলাটিকে বিচার করার দায়িত্ব

'আগেকার দিনগুলো, ঠিক যদি স্মরণ হয়, জীবন আমার ছিল উৎসব যেন, যেখানে বিবিধ হৃদয় এসে মেলে, সমস্ত সুরার স্রোত অনুকূল হয়।

একদিন সভায় সুন্দরকে বসিয়েছি কোলে, দেখি সে তিক্ত হ'ল, দেখি তাকে আঘাত করেছি আমি।

ন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালাম মুখোমুখি।

পালালাম—হায় আত্মকরী, অন্ধকরী, হায় যে ছলা, যা কিছু সম্বল আমার লুকোনো তোমার হাতে।

মন থেকে মাধুরী আমার সমস্ত মুকুল নির্মূল ক'রে দিলাম। হিংস্র পশুর এক বীভৎস রবির বক্ষে গলা টিপে ধরলাম প্রতিটি আনন্দের।

ডাকলাম ভদ্রাবদের, মরবার আগে তাদের খাঁড়ার ঘাটে কামড়ে মরব ব'লে—তাড়া করলাম আঁস্তাকুড়ের কুকুর, তারা যেন ধ'রে নিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে পারে আমার মাথার সঙ্গে, বুকের সঙ্গে। দুঃসহ হ'ল ভগবান। কাঁথার মধ্যে বিছিয়ে দিলাম নিজেকে—পালের হাওয়ার হাওয়ায় শুকনো হলাম, অনর্থের পাকে পাকে চক্রিবাজি খেলাম চমৎকার।

আর বসন্ত এসে দিল আমায় নির্বোধের অপূর্ব এক হাসি।

অবশেষে শেষ প্রবঞ্চনার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মনে হ'ল যেন যা কেন খুঁজে আমার হারিয়ে যাওয়া উৎসবের চাবিটি, পেলেও পেতে পারি আবার শূন্য জীবনে!

সেই চাবিটি, মরা তার নাম। হঠাৎ এই প্রেরণা—এ তবু মরব, আমি। মরবই যেমনভাবে। "থাক এইখানে, তারপর কোথাকার" ইত্যাদি, চেঁচিয়ে উঠল বৈদ্য, যার যেওয়া এমন আশ্চর্য মালা পরেছি আজিম গায়ের, "সকল ক'রে চল মৃত্যু তোর শূন্যের শূন্যায়, তোর মৃঢ় অন্তরিক্ষতায়, তোর পালের মত অমূল্য উপচারে।"

একটু বাড়াবাড়ি হ'ল না? হে শয়তান, বন্ধু আমার, কথা

রাখো, কটাক্ষটা ফিরিয়ে করো—লেখকের কাছে তুমি যা চাও, কবিতা নয়, উপদেশ নয়, শুধু ছোট সেই সব অর্থহীন তীক্ষ্ণ কথা—তার বদলে আজ তোমাকে দিয়ে দিই আমার অভিনন্দন ইত্যাদারের তরেকটি গোপন পত্রপুট।'

'মরতে এক খতু' সম্বন্ধে অনেকে বলেছেন, এতে 'আত্মহত্যার প্রশংসিত হয়েছে ফরাসী ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা—অন্তত সাময়িকভাবে মরতে কার কাটাতেই হয় মানুষকে। আমাদের মনে হয়, এ-ভাবে না-দেখলেও চলে এবং এ-ভাবে দেখা উচিতও নয় র্যাঁবোকে। এ-সময় তাঁর একান্তভাবে আপনার, এ সেই আত্মোন্মুখ কঠিন সমাজ ও সভ্যতার অনিবার্য সৃষ্টি যেখানে মানুষ নিজেকে ঘৃণা করতে শেখে ('merde pour moi') নিজের দলে পার্টিপার্বিকের কিছুতকিমাকার সব সমস্ত গজিয়ে ওঠে, ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, ঈশ্বরকে গালাগাল দেয় ('merde à Dieu', 'merde' মানে বিষ্ঠা)।

আমরা এসে আসছি তাঁর এক অতি বিখ্যাত কবিতায়, 'বুকুস'তে—উনিশ বছর বয়সের লেখা। যে-র্যাঁবো voyou, পানোন্মত্ত হুল্লোড়বাজ, তিনি অন্য কোনোখানেই তাঁর এই প্রবণতা এত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেননি যেমন এখানে করেছেন। এখানে দুটি জিনিষ লক্ষ্য করবার। প্রথমত সেই কারুকর যে, কোনো বৌদ্ধ তান্ত্রিকের মত চক্রবাক ছন্দ, ফুটো হাঁড়ি ও নানান অর্থাচীন তন্ত্র-উদ্ভিদের সিকড় একত্র ক'রে অদ্ভুত সাধনায় ব্রতী হয়েছে—কী সে তৈরি করতে চায়, কে জানে! অন্যদিকে এখানে লক্ষ্য করবার সেই র্যাঁবোকে যিনি সমাজের সমস্ত গরল পান ক'রে নীলকণ্ঠ হ'তে উদ্যত।

কবিতাটি সম্পূর্ণভাবে না তুলে দিয়ে আমার উপায় নেই—এর প্রতিটি পংক্তির মধ্যে দিয়েই সেই আত্মকেন্দ্র ও সেই সর্বগ্রাসী র্যাঁবো নিজেকে ঘোষণা করেছেন যেন রক্তের অক্ষরে :

যদি যদি থাকে ফিরে যেতে,
তবে মাটিতেই আর মাটিতেই—

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১

শুধু সাওতা থেকে আমি ভরপুর,
পাই অজানা, ঝিলা, লোহা-চুর।

হায় মুকুলা ভটাও,
তুমি হ'বে দেখাও
তুমি, শস্য, ফুলবল,
চুমন করো মুকুরায় নীল উজ্জ্বল প্রোহল।
আমো আর আলো পোড়ো ঈষ বাস বায়,
অমল ভর নির্ভার মুক্তা পাবের দিগীবলোকে,
মুলর উপত্যকায় রোপিত যে-ঘর তারাদের বাস,
বিস্তৃত কোলে সন্ধ্যা-তাড়িত যে-সৃষ্টি সুপ্তপ্রাণ।

যেমনটি যেমন টেউয়ে সাতার আড়ালে,
ছুটিছুটি করে চাঁদ সুকুমার ডালা,
দুপুরে সোনের মধ্যে মধ্যাহ্ন মাতালে—
এ-আকাশ সাওতার বয়স ত্রেমবিপনা।

তল দেশ আর শাস্তদর্শীই মল,
মহুয়ম ঢেউয়ে কলে তারা তমসেই—
দৃষ্টিবাদনের ইর্ষনাতের বল,
তারোনোটে ছাড়া কবি সেই ঠাঁই নেই।

নির্ভাবনায় তাই ঘুম দিই। সনোরম মহাকাশের
বক্ষদেশীতে উপবন ভরে ফল।
সে-ফোলে তরল মহলে পুড়িয়ে ছুটেছে সকল পাবের
পাবে যেইখানে সাতার প্রবাহ মর্ত্যের তলতল।

কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন যে 'মহকে এক শুভু' ও 'দীপালি'-র ('Illuminations') মধ্যে মূল তফাৎ হ'ল এই যে প্রথমটিতে অজানারায় আত্মোত্তরণ আত্মানুসন্ধান, যে-অনুসন্ধানে ধ্বনিত হয়েছে কোনোরকমে আলোকে পৌঁছে যাওয়ার এক প্রাণপণ অথচ নামহীন উদ্যম; কিন্তু অন্যটি শুধু প্রতিচ্ছবি, প্রভাব, যাতে মন যেন দর্পণে প্রতিফলিত। অনেকে আবার উল্টে বলেছেন, এ দুয়ের মধ্যে কোনোরকম যোগসূত্র স্থাপন করাই

বাহুল্যের নয়। যাই হোক, এখানেও এমন কিছু কিছু লেখা পাওয়া যায় যা অন্তকারণের সূত্রতন্ত্রের আলোকে আলোকিত। দুটি মাত্র উদাহরণ দিই। 'সৈন্ধবের তৃতীয় অংশটি মেওয়া যাক প্রথমে :

'ঐ বনে একটি পাখি আছে, তার গায়ে তুমি লেখে দাঁড়াবে, তা তোমায় লজ্জা দেবে। একটা ঘড়ি আছে যা বাজে না।

প্যাচলেতে ঐ কাদার মধ্যে আছে একটি নীড় যাতে থাকে শাদা শাদা সব পাখিরা। একটা মির্জা আছে অধোমুখী, এবং একটি ঘর তলায় উঠে গেছে।

কোপের মধ্যে ছোট্ট একটি গাড়ি পাবে—পরিত্যক্ত ; অথবা সে ছেলেটি ছুতোর জড়ানো, পায়ে-চলা পথ দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে ছুটতে ছুটতে।

ছোটখাটো একটা বাজার তলও পাবে, তাদের বিচিত্র লাভগোছে —বনাঞ্চের ধারের রাস্তায় তাদের দেখা মিলবে।

সব শেষে, যদি তোমার খিদে পায় কি চেষ্টা পায়, এমন কাউকে কাউকে খুঁজে পাবেই তুমি যে তোমার পেছু-তাড়া করেছে।'

বিখ্যাত শুদ্ধ তান্ত্রিক এলিফাস লেভির নাম আমে করেছি। তাঁর অপস্রাত ন্যাঁয়োও হলেন উদ্বুদ্ধ। 'বাপালিয়' 'H' কবিতাটিতে যৌন আচারকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এক কথায়, কবিতাটি যেন যৌনি সংক্রান্ত কোনো ধীজমন্ত্র।

'যত রকম পাশবিকতা আছে, সকলকে হার মানায় অরতাসের (Horlanus) উৎকট অমরতি। তার একাকীত্ব মৃত্যায়ুসের কৌশল, তার ক্লান্তিতেও প্রেম প্রাণময়। যত মৃত্যুপ্রান্তরে যখন সে ছিল কোনো সৈন্যের অভিসারনায়, তখনো লাভির শরীরে সেই তো বহ্নিমান আগ। তার যায় মুক্ত হয়েছে, মূর্তিমান দুঃখ।'

উদ্ধৃতির এই প্রসঙ্গ শেষ করি 'স্বরবর্ণ' নিয়ে। প্রতীক বা নিধন এখানে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা দেখবার মত বস্তু। আমলে শোনা যায়, অক্ষরগুলির সঙ্গে রঙের এই সম্বন্ধের ধারণা রিঁপোর কবি পেয়েছিলেন এক পুরোনো বর্ণপরিচয়ের বই থেকে। 'নরকে এক ঋতু'তে 'আত্মজীবনী ক্রিয়া'র মধ্যে বলছেন, 'আমি করেছি স্বরবর্ণের রং—আ কৃষ্ণ, অ শ্বেত, ই রক্ত, ও নীল, উ সবুজ—প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের গতিপ্রকৃতি নিরূপণ ক'রে দিয়েছি; আর সহজাত প্রেরণার ফলেই আজ আমার লালায়িত হয়েছি কাব্যিক এমন একটি সূত্রপদ আবিষ্কার করতে যা একদিন না একদিন প্রযোজ্য হ'তে পারবে সমস্ত অর্থে; এই অনুবাদের সর্বস্বত্ব আমি সংরক্ষিত ক'রে রাখলাম।'

এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে—সে বলছিল, যখন সে গান শোনে, স্বর শুনে মানা করে, তখন সে যেন মনে মনে নানান রকম রঙের খেলা দেখতে পায়। সেখানে সংগীত ও বর্ণ, এখানে বর্ণ ও সাহিত্য।

এই সনেটটিতে আমরা দেখব, র্যাঁবো আরম্ভ করছেন 'একদিন' টিনি স্বরবর্ণদের পরিচয় বলবেন ব'লে—কিন্তু পরে হঠাৎ কোন এক দিব্যিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ব'লে যাচ্ছেন তাদের পরিচয়, যেন তাঁরা বাস্তবিকই সেই রকমই, যেহেতু তাঁরা তাঁর মনে সেইভাবে স্থান পেয়েছে। এই চেতনা সম্পূর্ণভাবেই ঐন্দ্রজালিক। এখানেই প্রশ্ন ওঠে কল্পনার সর্বশক্তিমত্তা অথবা 'omnipotence of ideas'-এর। পাঠকরা আমাকে ক্ষমা করবেন যদি ঋগ্বেদের একটি আশ্চর্য মন্ত্রের (১০.৯৮.১—৭) প্রসঙ্গ এখানে আনি যেখানে যজ্ঞ পুরোহিত দেবাপি প্রথমে প্রার্থনা করছেন দেবতার কাছে বৃষ্টির জন্যে, তারপর কোনো দেবতার কোনো ধার না ধেরেই নিজেই বৃষ্টি নামিয়ে আনলেন এক আশ্চর্য ক্ষমতায়।

প্রথমে সনেটটি তুলে দিই। তারপর তার প্রত্যেকটি স্বরবর্ণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

আ কৃষ্ণ, অ শ্বেতবর্ণ, ই রক্ত, উ সবুজ, ও নীল:
স্বরবর্ণ, একদিন তোমাদের গূঢ় পরিচয়
বোলাব: আ, কৃষ্ণ নীবিবাস, ঘিরে দুর্গন্ধময়
ঘোরণ মৌমাছি তারে অবিরত গীত করে, নিল

মহা ওঙ্কার। অ, দীর্ঘ অথবা প্লুতে উচ্চারণ,
বরফ হিমবাহের, শ্বেত রাজা, স্তব্ধ পুরাতন।
ই, লোহিত, রক্ত ইতস্তত, হাসি কোমল চঞ্চল
অথবা মধুর শেষে হাসে বধূ অধরে অশেষ।

উ, অন্ধকারপুত, শঙ্খবাদ দিয়া দমুজ মাধব,
আদি ত্রাসিত জীবের, যে-পাখি ঘিরিয়ে আছড়ে
ঐ'কে নিস্তব্ধতার ঘনে চিরাচীন মুক্তির কলোলে।
এ, পরম স্নেহী মাঝে ঔদাসীন্যে অসুখী ধরিত্র,
লোক-লোকান্তরে স্নেহযোনি-পুরে মৌন সঞ্চরিত।
ওমেগা, তোমার দৃষ্টি কাঁদে এই বিরহ-বিক্ষোভে।

'আ'—যুলে আছে A। ফরাসীরা উচ্চারণে করে আ-ই। তাই A-কে 'আ' করেছি। 'আ' কৃষ্ণ, সেই মূল যার থেকে সমস্ত কিছুই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়—বর্ণমালার প্রথম বর্ণ, তাকে তুলনা করা হয়েছে তাই সৃষ্টির আরম্ভের সঙ্গে বা বর্ষারম্ভের দুঃস্বপ্নে কুটিল। 'A'কে যদি উল্টে V-র মত ক'রে দিই, তা হোমি-চিহ্নে পরিণত হয়। 'আ' তাই সেই নীহারিকা বা ক্রূর পূতিগন্ধময় রোমশ যৌবাহিদের দ্বারা অধিকৃত স্তীত, বিল মহা ওঙ্কার।

'অ'—যুলে আছে E। 'E'-র ফরাসী উচ্চারণে আমাদের 'অ' আর 'এ'-র মাঝামাঝি এমন একটা ব্যাপার যা বিদেশীদের আয়ত্ত করতে রীতিমত বেগ পেতে হয়। আমি বৈজ্ঞানিক দেখে 'অ' বসিয়ে দিয়েছি। 'E' মূর্তিমতী স্ত্রী, সৃষ্টির নিষ্ক্রিয় উপাদানে, চাঁদ, ফুল, বৃষ্টি, শিখা—আলোকের পথে উঠতে গেলে এদের সাহায্য অথবা অতিক্রম অপরিহার্য। 'E'-কে শুইয়ে দিয়ে এই রকম করা যায়: ɒ। হ'য়ে গেল ওজুয়েথ, শাদা থেকে এল হিমবাহের ঔজ্জ্বল্য ও শ্বেত রাজার প্রশ্ন। এই ভাবে E-কে শুইয়ে দিলে মনে হয়, এ যেন জোয়েলের কোনো ক্যাথিড্রির চিমনির দাড়ি, তলায় যেখানে মেঘে-আসা সায়ন্তনের মেঘের পুঞ্জ।

'ই'—যুলে আছে I। যদিও ইংরিজি উচ্চারণ 'আই', ফরাসীরা উচ্চারণ করে 'ই'। 'ই'-ই রেখেছি। 'ই' লোহিত, রক্ত ও কামের চিহ্ন (তুলনীয়

—'রক্তকে এক রকম' এ 'দুই শোণিত'), সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উপাদানের সংঘর্ষ এতে। 'I' কে যদি ওইনে দিই, হয় —, ঠোঁটের রঙ। ঠোঁটও লাল এবং তা থেকে হাসির কল্পনা, চোখ হাসি, মস্তরার পরে অনুভাসের।

'উ'—মূলে আছে U। ফরাসীরা উচ্চারণ করে 'য়ু'। 'U' শক্তি, ধ্যান ও বিজ্ঞানের রঙ। ক্লান্ত চোখে সবুজ প্রান্তর শান্তির দিগন্ত আনে। 'U'ও সবুজ। সমুদ্রের রংও সবুজ কোনো কোনো জায়গায়—তার তরঙ্গে তরঙ্গে অনেক 'U'-র সৃষ্টি হয়। সবুজের ফরাসী 'vert'—তাই আকাশগঙ্গা ও বিশ্বজগতের ('univers' ফরাসীতে বিশ্ব, তাকে ক'রে দেওয়া যাক 'U'ni+vert) প্রথম বঙ্কিম রঙের কল্পনায় সবুজ হ'য়ে এল।

অন্যদিকে কেউ কেউ মনে করেন যে ফরাসী 'vert' যেমন শুনতে পান্না পান্না লাগে, তেমনি ফরাসী 'U'-ও তরল ঢোলালো ও গম্ভীর বড় বড়টা জার্মান 'O'। জার্মান grün এর (মানে ইংরিজিতে 'green' বা সবুজ) কল্পনা তাই আপনা থেকেই আসে তাদের O হ'তে। তাই 'green' ও ('খ্র' উচ্চারণে) এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাই যাঁরা মৃদু আপত্তি তুলেছেন, তাঁরা বলেন, ফরাসী 'U' থেকে সবুজের কথা তত্তটা মনে হয় না যতটা নীল বা blue-র কল্পনা জাগে।

রাঁবোর কাব্যে সবুজের একটি বিশেষ আসন আছে। যেখানে সবুজের কথা আপনা হ'তে আসে না মনে, সেখানেও তিনি সবুজ চালিয়ে দিয়েছেন—যেমন 'মাতাল তরণী'তে 'যত্র দেখি, রক্তদিগ্ধ কুয়াশের সবুজ প্রহরী...'

'ও'—মূলে আছে O। ফরাসীরা উচ্চারণও করে 'ও'। 'O' ওমেগা, প্রাণ —'O'-র মধ্যে 'আয়েলেকটিকে'র চেতনা। ওমেগা বা শেষ, দুই অর্থেই। বর্ণমালার শেষ অক্ষর, তাই একদিকে মনে নিশ্চিত অবসানের ইঙ্গিত, অন্যদিকে শেষ, লক্ষ্য বা গন্তব্য স্থান। ভেনী (ভেনীতেও নিম্নে দিকটা 'O'-এর মতনই আকার) বাজছে অসীম নীলে—তাতে লোকলোকান্তরে বেদধ্বনি-পূরে যৌন সচকিত। 'O' দিয়ে পাওয়া পাষণ্ডীর প্রতীক।

আমার ছিন্ন শ্লেষোক্তি তারে।
কারে?—পাষণ্ডীরে।

'রোদশ যৌবাড়ি' থেকে উঠলেন গাঁরো 'নীল কিরণ-হরোলে'।

কাঙ-কারখানা দেখে এলিয়ট বললেন : 'After such knowledge, what forgiveness ?'

কিন্তু কথা ভেবেছিল কে ?

তিনটি কবিতা

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আর একটু আগে

আঁধার নামে গগনে, রাত্রি নামে মনে আমার—স্মরণে আমার ছিন্নে-পাওয়া সুরভির ঢেউ :

রাত্রি নামে শ্রান্তির পরে, মায়ের স্নেহের হাত বুক হ'তে বুলায়ে—রাত্রি আনে বসন্তীর চেতনায়।

আর একটু আগে, যখন সারাদিনের ঝড়ের শেষে দক্ষার বুকে ফিরে গেল ঝলমল জ্যোতিঃ ঝলিকা,

সহসা শুনলাম মানুষের প্রবের যে-সন্ধান ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে মাঠে, তাকে নমস্কার ক'রে গেল চিরন্তনের সেবকা।

সেখানেও

চোখে আমার জল, সে-জল শুধু অশ্রুর, সে শুধু স্বপ্নের—তার দিকে চেয়ো না। হৃদয়ে আমার ব্যথা, সে-ব্যথা শুধু ক্লান্তির—তাকে বুঝ বুঝো না।

প্রবাসী মন আমার বিস্রান্ত পাখাঘাত, উড়েই চলেছে অন্ধকার কাটল না।

বড় ভয় করি এই কথাকে—সে আমার ঢেউয়ে ঢেউয়ে কেবলি নিয়ে যায় যে-পারে যেতে চাই তার অন্য পারে ;

জেনো শুধু, আমার অক্ষম বাণী যেখানে পৌঁছোল না, সেখানেও আমি আছি, ভালোবাসি।

সে

লিখেছিলাম দিনের পর দিন, আজ তাদের ছিঁড়ে ফেলে দিলাম : বহু যোজন পায়-হ'য়ে-আসা পথের নামলো অবসন্নের। কুটিকুটি ছিন্ন হেসে সন্ধ্যাও হ'ল এক বিস্তৃত পাণ্ডুলিপি।

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬১

রাত্রি নামেনি এখনো।

আঁধার কেঁপে ক'রে সে আমার দিকে চেয়ে আছে, চেয়েই আছে—আমার অমানিশার বুক হ'তে শুনি সমুদ্র-গর্জন :

সে যে আমার পাশে, আমার বসবীতে বসবীতে, শিরায় শিরায়, সে যেন নিশীথ আমার কালকের রাত্রিটিতে।

দিনযাপন

বিষ্ণুশঙ্কর সেনগুপ্ত

কী ভবে আমার কাজ : কী কর্তব্য বলো না যখন
প্রত্যহ দৈনিকে পড়ি পৃথিবীর আসন্ন বিপদ
যন্ত্রের বিকৃত ঘন্ত্রে। রাজনীতিবিদ্ অনুক্ষণ
মাতায় বিদর্ষ দেশ বক্তৃতায়, ক্লান্ত চোখে তার
ভবিষ্যৎ, ভবিতব্য,—ব্যক্তিগার্থাবৃত খুঁজে-খুঁজে
যদিও উধাও প্রাণ, অন্তদিকে যুদ্ধবাজদের
উন্মত্ত হুংকার শুধু, শিশু শিশু মাঠের সমূহে
ছায়া রেখে চোখ বোজে। পশ্চিমের ইউরোপে ঢেউ
ওঠে, দল, আন্দোলন ; ক্রতগতি প্রচারের সনে
মধ্যাহ্নে সকাল ছায়া ; পথান্তরে সুদূর প্রাচ্যের
স্বর্ণাভ অরুণো বীপে রজনীর অন্ধকারে ঘুমে
কোরিয়ার তাইয়ানে ইন্দোচীনে মালয়-জঙ্গলে
যন্ত্রের চলে রোল ; বর্বরের লালসার যূপে
রক্ত ঢালে নির্বিরোধ অজস্র শহীদ অবিরাম।
হাত নেই, অন্যোপায় নেই ; আছে রাজনীতিবিদ্
প্রকৃত বিমূঢ়প্রাণ নায়কেরা। সংবাদকাগজে
তাঁদের বিচিত্র কীর্তি রোজ পড়ি—যদিও শহীদ
এদিকে সংখ্যায় বাড়ে, সাধারণ লোকের মনকে
বাষ্পের উত্তাপ শুধু, শক্তিহীন ফসলের মাঠে
ধু-ধু জলে ঘরদোর, ছায়াহারা জনপূর্ণ ঘাটে।

কী ভবে আমার কাজ : আমিও তো নিরীহ মানুষ
খাটি খুঁজি জীবিকা অর্জনে, আরো অনেকের মতো
সংসারের পূর্ণাবর্তে ঘুরে ঘুরে ভরাই কানুষ

আশ্বিন ১৩৬১

অসার্থির কল্পনায় ; যদিও হৃদয়ে সমুদ্যত
সমুখেই ব্যর্থতায় নিশ্চিহ্ন বিস্ময়। আছি ভুলে
বিস্মৃতির মুক্তাকাশ ; অবিরাম সংসারের কাছে
নৈপুণ্য প্রার্থনা ক'রে আকর্ষের জট খুলে-খুলে
সমুখে এগোই ধীরে-ধীরে। আমি যদিও যান্ত্রিক
প্রকাশ্য বিতর্ককালে, তবু যেন মনের গহনে
কোথায় সংশয় যাদে। পরিপূর্ণ নির্মম নির্ভীক
হ'তে যে পারিনি সেই ভাবনাই সন্তাপিত মনে
যাতায় বিষণ্ণ একতারা। পক্ষান্তরে বন্ধুজন
অনেকেই প্রতিষ্ঠিত, বিয়োগান্ত সংসারকে ছেঁকে
অন্তত কিছুটা রসে হৃদয়ম ক'রেছে জীবন।
তোষামোদে আত্মবাক্যে অভ্যস্তই, দিয়ে জলাঞ্জলি
সুযোজিত রুচিবোধে সংসারের সাগরসঙ্গমে
ডুব দিয়ে তোলে সোনা, কেবায় মিথ্যে মুদ্রাদুলি
আত্মসন্তুষ্টির মতো আদর্শকে ; এমনকি, ঢেউয়ে
হরি পড়ে, সহজেই অবশেষে প্রেয়াস্পদা ছেড়ে
সিকতা পালনার্থে পক্ষদর্শীকেই পত্নী মেনে
ভাসায় সোনায় তরী ; পক্ষান্তরে ফালের প্রাচীরে
লাল অক্ষরের লেখা ; ঘাটে-ঘাটে যন্ত্রাহত লোক
বেকারির পূর্ণাবর্তে খাবি খেয়ে বিষর্ষ হিহিদে
আংধার ভিক্ত করে, ঘনকিত করে বিশ্বলোক
সর্বঘাত পশুশ্রমে, ক্রুদ্ধস্বরা অবরুদ্ধ নীলে।

কী তবে আমার কাজ : অবিরাম উদ্বাস্তুসভায়
বিদীর্ণ করাত কাঁদে, মধ্যবিত্ত ছা-পোষা মানুষ
আরো অনেকের মতো আমিও ছুটেছি প্রাণপণে
নারী, স্বর্ণ, মান যশ, সুপ্রভাত পত্তির সন্ধানে

পথে মাঠে তেপান্তরে ; পথকষ্টে ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ;
তবুও হর্ষের আশা মুহূর্তেই জানে চঞ্চলতা
বিক্ষত প্রাণের পাত্রে,—বারংবার তীব্র আত্মত্রাস
করায় সাক্ষর নিয়ে ফিরে আসি ; প্রাণের শূন্যতা
ভরে না সংক্ষেপে শুধু ; অন্ধকারে যে দিকে তাকাই
নিষ্ফল জোনাকি ছাড়া অন্য কোনো আলোর মশাল
স্নিগ্ধপ্রাণে আনে না আশ্বাস ; সন্ধ্যাকালে বাড়ি ফিরে
বারান্দায় কোণে ব'সে আকাশের নীল তারা গুনে
কিছুটা সময় কাটে। কখনো বা রোগীর শিয়রে
ব'সে-ব'সে নানা কথা ভাবি তার পরিচর্যাকালে
অল্প-মুহূর্ত-ভবিষ্যৎ নিয়ে। চন্দ্রালোকে ঘর ভরে
সহসা নিথর রাতে। কোনায় দু'হাতে শির গুঁজে
হুতাশ আশ্রাণ করতলে ; মস্ত বাতাসের ঢেউ
মুখে চোখে বেগে লাগে, মনে পড়ে এদিনেও কেউ
দূরের মাঠের পথে বাড়ি ফেরে শিস দিতে-দিতে
জোৎস্নায় হাওয়ায় মুখ রেখে ; কালো দীর্ঘ এলোচুল
তাইই বউ ভেবে প্রাণে দূর মাঠে যেখানে শিমুল
দাঁড়ায় প্রাণের জোরে আকাশের দিকে ডানা মেলে
পরিপূর্ণ প্রতীক্ষায় ; মেঘলোকে নিমগ্ন পাখায়
বালুহাঁস উড়ে যায় জ্যোৎস্নাময়ী অজানা যাত্রায়
অনুদ্বিগ্ন অগ্রগীর অমুগ্ধ সংকেতে। আর আমি
তন্দ্রাতাড়া শেষরাতে শশিপথে হরিধ্বনি শুনে
চমকে পড়াতো ফিরি, কল্পনায় পাখা স্থির ক'রে
শ্মশানযাত্রীর ধ্বনি ডেকে যায় দূর থেকে দূরে।

কী তবে আমার কাজ : আমি জানি বাঁচে না মানুষ
স্মৃতিকে সম্বল ক'রে। কল্পনায় অমিতা মানুষ

আশ্বিন ১৩৬১

উক্তিরও শেষ কথা যদিও কখনো কোনো কালে।
তবু গতি, প্রবল দুর্বার বেগে একটি পদক্ষেপ
সৃষ্টির গোপন মূলে কাজ করে,—যোগসূত্রহীন
আমরা তলিয়ে যাই সমুদ্রিত ঢেউয়ের আড়ালে
যদাদাড়া বোকো দিনে ; রাত্রিকাম, বাকি রক্তস্রোত,
তোমাদের তীব্র টানে অনিবার্য হয় অধোগতি।
আজো তাই ক্রুদ্ধ ধরাদাড়া দিনে দিগন্তে তাকিয়ে
নিশ্চিত আঘাত খুঁজে যাযাবর ভগ্নস্বাদ শ্রমে
ক্লিষ্টিত শরীর কাঁপে ; ইউরোপে এশিয়াতে হানে
ক্লান্তি তার ক্রুদ্ধ বর্শা, কদাচিৎ নক্ষত্রসন্ধানে
দিগন্ত খণ্ডিত হয়ে ; আর আমি আবদ্ধ নগরে
আপন কর্তব্য খুঁজে নিদ্রাহীন রাত্রি যাপি ঘরে
বেদনাবিলীন ক্ষণে ; বহুদূরে সোনা যায় যেন
গর্জনে উল্লাসে জাগে অন্ধকারে সমুদ্র সফেন,
অস্থির শ্রাবণবেগ ; তারা দূর পদক্ষেপে বেগে
সমুখে এগোয় পথে মাত্রিশেষে মহীয়া আবেগে
দীর্ঘ দৃপ্ত অস্তিমানে ; সে-গতির তাপ তপ্ত মনে
অকৃত্রিম অভিজ্ঞান সৃষ্টি করে ভূলদক্ষিণে ॥

অরিন্দম
বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১

আমার

কবিভূষণ আচার্য

তবে তাই হোক, ক্ষমাতেই আনো দাহ
আমার এ-দেহে হেমন্ত-হিল্লোলে
আর তুলিয়ো না বৈদেহী হিল্লোলে
এ-জগতে আনো প্রণয়ের উৎসাহ।

তুমি গাও গান আনন্দে অনবদ্য
সুরের প্রণামে মুছে ফেলে আনো খেদ
নীল আকাশে ফেড়ে নাও উদ্বেগ
উদ্যানে তুমি কোটাও যে শ্বেতপদ্ম।

তোমার দু' চোখে আমার অহংকার
কী গভীর স্নেহে আকাশে ছড়াও সন্ধ্যা
ঝরে ঝরে যুমে যাও নিশিগন্ধা
বেদীবরনে ছড়াও অন্ধকার।

শ্বেত বাসনায় শাশ্বত অবগাহ
তাই যদি হয়, হরুপলাশ ছিঁড়ে
কাজল আনো গান এ-অগ্নিমীড়ে
তবে তাই হোক, ক্ষমাতেই আনো দাহ॥

পুরোনো তৈলচিত্র

শামসুর রাহমান

পৃথিবী ঘুরছে নিত্য, ছিঁড়ছে শীতের বেড়া বসন্তের শিশু
এখানেতো ঘানা দেয় উঁকিয়ে নিশেন।
বিস্মৃতি-পথে ভুল কিনে সন্ধ্যায় পথিক
কড়া নেড়ে ঘরজায় যাকে পায় তার
আঁচলে প্রদীপ কাঁপে, প্রাণের হাওয়ায়
জানা কবিতার
উন্মীলিত অমি,
সাম্বাতের ঝিং :
দু'দণ্ড পুণ্যের জলে ডুবোও হৃদয়,
ঘুরে যাও নরকের খালি।

তুমি আর পারবে না ফিরাতে সেখানে
জীবনের মুখর সাহিত্যে
ঘামোজাবে,
যেখানেই কাঁপুক পৃথিবী।

যুম-ভোবা সাত জলে পাখি মেয়ে সূর্যাস্তের পরে
নিত্যসঙ্গী কুকুরের গলায় শিকল প্রান্ত হাতে
সুখদুঃখমের হাতে ধোঁয়া-ওঠা তীব্রুর আয়াসে ফিরে আসা,
রহস্যসিরিজে ডুবে কাটা আর চাদরের বিতর্কে উৎসুক
প্রহর কেটেছে যার আয়াপুত্রকন্যার সংসারে
অথবা চিন্তায় ছুটি সিনেমায় রূপে আর পাহাড়ি হাওয়ায়

বর্ষ ১১, সংখ্যা ১

পল্লীর অন্তরঙ্গ প্রেমে রূপ মম (আপাতদর্শনে)
যাদের ভক্তের শ্রীতি ছিল যার মর্মসিঁড়ি তার

প্রস্থানের নেপথ্য নাটকে

সে কি শুধু ভেসে গেছে পৃথিবীর শেষ কোনো স্রোত,
স্বপ্নে তাকে করেছে কি তাড়া চন্দ্রবোড়া, অন্তরালে
কে জানে জঠরে তার ছিল কিনা কীটের উৎসব ॥

এসো বসু

আনন্দ বাগচী

আমার পিপাসা তুমি, অন্ধকার ঘিরে ঘর করো,
দুকূলে বিপুল রাতে বার্ধ করো এ এক বিস্ময়
কলস্বর সন্ধ্যের ঘর বারে বারে উঠোনে তুলে ধরো
কী বিচিত্র বাসনার ডাকে তুমি আঁকো দিগন্তর।

আমার জিজ্ঞাসা তুমি। দেবতাকে পরাভূত ক'রে
মাটিকে বানাও তীর্থ, যৌবনের ফলাবর্তী রস
প্রেমের প্রার্থনা করো, মন্ত্র দুয়ে বিস্ময়ের ঘোরে
পূর্ণ করো। আশ্চর্যাক্ষী পৃথিবীতে তুমি সুনির্ভর।

ত্রিকালস্তায়িনী দেব কেকাদাহারের আরোহণ
নগরীর রক্ত মধে ; আলোকতীর্থের আলো যদি
অন্ধকার ফলাবৃতে মিটবে না আমার যৌবন ;
নির্জন সাহিত্য নও, তবু তুমি অকল্পিতা নারী।

কাকে যে চিনি না, যার ছলনায় উত্তরাধিকার
আমার মাদুর স্বপ্নে, সে কি তুমি সে কি তুমি হায়,
রোদ্দুরে বিরহ জাগে এ কি কোনো যৌন মাধিমায় ?
দোয়েল ডাকায় তুমি দরবারি কানাড়া যেন গায়।

এসো বসু খুঁজে নাও তোমার আশ্চর্য ঘরটির,
ঘরকে পৃথিবী করো অনায়াসে, পৃথিবীকে ঘর।

জয়া আঠাঘোর গান

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

তীক্ষ্ণ চোখ মুক্ত হলো জীবনের পদাবিলাপিতে ;
দূরের বীণের তার কাছের গভীর গূঢ় টানে
জেগে এলো এ-হৃদয়ে। তীব্রবহা প্রপাত সোপিতে
যাত্রার মায়ার মোহ তারা পেল পাল-ছেঁড়া গানে,
চরু যতো অনিচ্ছুক, তবুও ভেসে মনে হয় পরে
আছে বন্দর আছে, বিজুরিত আঙুরের আভা
বিদায়ী আঙুলে, ঠোঁটে, দেহতটে নিকৃত নারীর
ভেসে যেতে পাশের প্রচুর। জীবনের হিংস্রতম পাখা
সহসা লুকাবে জলে,—দাহদীপ্ত এ-তরণারির
উচ্ছল শরীরে তারি অন্তরাত্মা মন্ত্র হ'য়ে পড়ে।
বাতাসে সমুদ্রঘ্রাণ, জীবনের লবণাক্ত স্বেদে
শিল্পীর অতন্দ্র শ্রম সাক্ষ্য দেয় নিহিত নিয়মে,
তাকে চিনি যাকে চাই আতিশয্য তারি প্রাণবেগে
প্রাণের পরাগ ভ'রে আকাঙ্ক্ষার গাঢ় মধু জমে ;
ক্ষয়িত হৃদের মতো বাসনার তীব্র অনুভূতি
ঢেউয়ের চিরায়ু নদী স্পর্শসহ গতির গভীরে—
কখনও গভীর তীরে দু'দণ্ডের আধার বিস্মৃতি
আঁধিয়ে আবার আলে কামনার একই মনে ফিরে।
ও বিচিত্র স্থিতিস্থাপকতা !
প্রেরণার একই তাবকতা
কখনও ডোবার তরী, কখনও বা অনুকূল জলে
ভাসায় আবার তাকে পূর্ণাতনী প্রণয়ের ছলে,
আঠাঘো বলয় ধ'রে ডোকিনের একই ধাঁধাধূলি
আমাকে দেখালো শুধু বা দূরের নদি যেন ভুলি,

ভুলি না যা কারে এলো, যা আমার বাহুতায় বুকে
সৃষ্টির নিহিতমন্ত্র ঢেলে দিলো তুলাবিহা মুখে,
যা কখনো তার মুখ, তুমিবিহ তারি তরা চোখে
সজল শ্রাবণ-রাত্রি দিয়ে আসে গন্ধরাজ শোকে,
কখনো আকাশ ছুঁয়ে সে নারীর দেহ ভ'রে ওঠে—
যেখানে বাড়াই চোখ—তাকে ছুঁই, একই যা কোটে
পৃথিবীর প্রতি ফুলে বাসনার স্বর্গরাগে আনী,
হৃদয়চারিণী
তাকে নিয়ে পারি দিই অমিতের অজানায় ভুলে
দিগন্তে বৈরেব তার মাটি পায় আরেক তুলোকে,
যেখানে প্রাণের মন্ত্রে প্রাণে প্রাণে মিলিত যোজনা
যুগল পাখির মতো একই সুরে অপার সাহানা
তুলে ধরে অমলিন দিনে। মধুমুর্ত মমতার তাপে
প্রাণের নিকৃত ইচ্ছা স্পর্শাতুরা তন্ত্রী হ'য়ে কাঁপে,
অদূরে অনেক যাকে হয়তো বা নিখুঁত নিখাদে
খুঁজে নেবে সংগীতের মায়াবেরা মুগ্ধ অবকাশে,
আলোর আভাস আজ হৃদয়ের অন্তহীন সাথে—
আঠারোর আরক্ত আকাশ।

হেমন্তের চাউল

রাজলক্ষ্মী দেবী

দিগন্তের অন্ত হ'তে অন্ধ মধু ঝরে।
একটি কথাই পড়ি বার বার, রৌদ্র-লিপি, ছায়ার অক্ষরে।
শীতের দুপুরে বাড়ি-ভরা জানালায়
মিষ্টি রোদ একবার ছড়ায়, গড়ায় আর কখন পালায়!
বাইরে চেয়ার টেনে বসার ব্যর্থতা,
তাই তো, ফুরোয় দিন একে একে! মনে মনে কতগুলো কথা,
—যেগুলো বলার নয়, সেই সব কথা মন বলাবলি করে।
উনের সোনারে কাঠি, উনের রূপোয় কাঠি নড়ে আর চড়ে।

ঘুম ভেঙে শীতের সকালে
রোদ্দুর ছড়ায় এই সামনে ঘাসের ঘাসে।—ডালিয়ার ডালে
হঠাৎ প্রচণ্ড লাল সন্তকোটা ফুলের বিস্ময়।
জীবনটা একেবারে একঘেয়ে নয়।

বাঁকে বাঁকে কচি মুখ জবে ওঠে রাস্তার পাশে,
টুকুনের মত ঘাস কাঁচা শুমে আটটার আসে।
ধুলো ওড়া, কলরব,—লেমোনেড-লৌরভে মেশা,
আমারো অলস মনে কী-একটা কাজবার নেশা।
ঠিক যেন, রোদ্দুরে ধ'লে ধ'লে যেন উল বুনবারো পরে
দিব্যোই, মনে হয়, ফিরে যাওয়া ঘরে।

শাদা-শাদা মেঘগুলি-বাস্ত সাজানো সারি সারি,
আষাঢ়ের বাড়ি।
দিগন্তে আঁকা আছে প্রভাতের আলোয় নৈরিক
অন্ত নিধানিক।

আশ্বিন ১৩৬১

এখানে শীতের রোদে রোজকাল সারা হয়ে গেলে
কটির টুকরো ফেলে
ব'সে থাকি, লেজকোলা কাঠবেড়ালিটা ঠিক আসে,
ওঁকে ওঁকে আসে,
কটির টুকরো নিয়ে তখুনি মিলোয়।
রোজ।

দুপুরে রোদের বৃত্ত ঘুরে যায়। নেমে আসে ঘুম।
ঘুমিয়ে পাতার মতো প'ড়ে থাকে ক্লেমেন্ট টাউন।
ঘুমহীন কারো চোখ মিছিমিছি চেয়ে থাকে ঘুরে
লাল রাস্তাটা গেছে যে-খানটা ঘুরে।
চোরাটা টেনে এনে রোদে পিঠ দিয়ে উল-বোনার যাদুটা।
মনে ভাবে কতগুলো কথা।
কথা নয়, যেন এক যাদুমায় ওঙ্কারোত্ত অনির্বচনীয় গুনগুন।
হৃদয় আকুল করে নিঃস্ব দুপুর ঘ'রে ক্লেমেন্ট টাউন।

বিকেলে স্বল্পায়ু রোদ প'ড়ে আসে—
খাঁকারাঁকা ছায়া নেমে আসে।
তারপর যাই তুলি,—ঘরে কিছু গোছগাছ প'ড়ে আছে যেন।
শীতের আরেক দিন ক'রে গেলো,—কেন?
অপূর্ব অতৃপ্তি নিয়ে সন্ধ্যা নামে,—কালকে পূর্ণিমা।
আবার জাগাবে সেই আকুল প্রত্যাশা।

আবার শীতের রোদ অলকাবে মাঠের শিশিরে,
একটি পুরোনো কথা মন আওড়াবে ফিরে ফিরে,
প্রত্যেক সকালে তা-ই রোদের রঙের মতো লাগবে নতুন।
হৃদয় ভোলালো, আহা,—ক্লেমেন্ট টাউন।

কবিতা
বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১

নৌকাডুবি

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সমস্তের সমারোহ প্রকাণ্ড প্রান্তরে :
চক্রবালে শুভ্র ফেনপাল
মিশিতে মেঘের চ'য়ে ; কদাচিৎ দোঁহার ব্যবধান
ছিন্ন বর্মান্তরে ॥

খালি রোদ্দুরে সাদা, তারা ছাড়ে শুধু,
পায়ে-চলা পথে কে একাকী ?
দু-চোখে সোনার স্বপ্ন : সমস্তাই ফাঁকি আর বাকী
সহসা অশুচি ॥

কিন্তু বেলা প'ড়ে আসে : দ্রুত উবে যায়
মহাশূন্যে মাঠের ধরিৎ ;
নির্ঘাত আঘাতে ক্ষুব্ধ অন্তর্লোম অমার সরিৎ
পৃথিবী ডোবায় ॥

নৌজীবী অসত্যা পায় ; অনন্ত নয়ন
মজ্জমান সাধের তরণী :
উত্তরঙ্গ অনোজ্ঞাসে তাই তার সমগ্র ধরণী,
উদ্বৃত্ত মরণ ॥

অবশ্য অপ্রতিকার্য অন্তিম মুহূর্তে :
অন্তর্ভার নাস্তির কিনারা ;
বৈকল্যের ঝঞ্ঝাসঙ্গে তুলাদণ্ড তুর্যী একবারা
ও মহা চুম্বক ॥

আশ্বিন ১৩৬১

তবুও অভাবে যবে গুমরে মানিক,
তখনই তো স্মৃতির বিদ্রোহে
পাবে সে নিজের দেখা, তার পরে মিশে আসিবারে,
হবে স্বাভাবিক ॥

কবিতা
বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১

অনুচিন্তন

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

ভয়শঙ্কার বাদুড় যখন বেরোয়
অন্ধ বেগে আকাশের নীল মনের পাখা পেরোয়—
আলো হ'য়ে এলে ঘিরের পাখিরা নেমে আসে যেই দুপারে
পৃথকাশ-মায়া অবসর দেহ আমলনা মন ভুলারে
শহরে আকাশে ঘুড়িগুলো সব একে-একে যেই নাবে
ছাদের আলসে ধ'রে সে তখন কোনো কিছু যদি ভাবে—
সেই ভাবনাই আমার দু'চোখে বাড়িয়ে আনে ঘুম
ঘুমের স্বপ্নে আনে এক বাঁক রূপকথা মনোরম!
সে-ছায়াই ক্রমে ঘ'নে ঘ'নে পড়ে হ'য়ে যায় নিঃঝুম।
সে-ছায়াই ডেকে আনে কোন্ কাঁকে
ধূসর-রেণু করা ডানা সন্ধ্যাকে—
সাঁঝের দীপের শিখায় শিখরে জমে কাজলের ঘুম—
তখনো কি ঘরা পড়ে রাখো তার মনে কোথা জাগে মরু,
কোথা জাগে দীপ সজল শিউলি, কোথা জাগে ছায়া-তরু?
হলফ ক'রেই ব'লে দিতে পারি—ঘরা পড়ে, ঘরা পড়ে;
একা-একা সেও ভোগে নিশ্চয় সারা রাত স্মৃতি-জ্বরে।
সকালে আবার কাজের প্রবাহে
সেই সব স্মৃতি কোনখানে যায় ভেসে!
সত্যে হ'লেই মন শুধু চেয়ে
পুরোনো কথায় আবার কাটায় বেলা।
চিন্তায় চিরকালের অধিতে
শুধু চেয়ে পথচারণা।
দুর্নিবার আয়ুর পথিতে
প্রাচীন ছন্দে নবীন ধ্বনিতে

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬১

• ফুল-ফুল একই অঞ্জলিতে অর্ঘ্যহারণা!
অবাক্ কাণ্ড! বুঝিনে কিছুই, জেরও পাইনে দিশে—
ধ্যানে অহর্নিশের ছায়ায়
ভাবনা আমার তার ভাষায়
একাকী হ'তে কখন যে যায় মিশে।

কবিতা
বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১

আজকে প্রার্থনা নয়

শান্তিকুমার ঘোষ

সে-দিনো ছিলেছে মেঘ মেলে-মেলে যায়-যায় কতকাল ধ'রে
বিজয়ী সৈন্যের মত ক্রীতদাস নারী আর গজদন্ত নিয়ে :
কেঁপেছে অনেক শিশু দীর্ঘ ঘরে শুধো মার আঁচলের তলে।

গ্রচিত্ত মেঘের ছাদ নিকষ পাহাড় যেন ঠেলে ধরে বুক,
বন্ধ আর অভিশাপ লাগলো সমান বেসে—একাকী কৃষক হাহা মাঠে,
নিয়তি নিয়তি ব'লে ফিরেছি অনেক পূজা ছুড়ি কিংবা বটবৃক্ষমূলে।

আজকে আকাশে লাগো চূর্ণ নীল ঘন্টি ধরে চিক্ক-খাওয়া মেঘে—
চকচকে ভেন এক কেমন সহজে চলে তাই চিরে-চিরে,—
মানচিত্র তাদে নীচে হ্রাসিমায়-হ্রাসিমায় বিস্তীর্ণ জীবন সমুদ্রের।

শ্রমিক বন্ধুরা সব মেলেছে প্রধীপ আজ পথের দু-ধারে কিংবা বুদ্ধ
বাস্তিঘরে,
কত না সতর্ক দৃষ্টি বিজ্ঞানীর চোখে জাগে কত মানবহিতে যে প্রতি
মুহূর্তেই ;
কত সে নিয়েছে তুলে অবার্থ পেনসল হাতে—খেলেছে কালের পাশা
ভবিতব্যতায়।

পাহাড় প্রান্তর পারে সমাসে পাঠাও তার বহ্নিকণ মেঘে,
বিদ্রুহ ক্ষণিক হেন ; তোমার আবেশ হল নবজি-নীলে ঘেরা উপত্যকা,
এখন প্রার্থনা নয়, আদেশ করতে পারো, নিয়ে যাবে মেঘ।

খেয়া নেই

সুধীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেই গাঁয়ে কতোদিন খেয়া নেই আর।
পুবালি বাতাস কেন পুরোনো জলের কথা জিজ্ঞেসেছে এ-বছর আবার!
আনাচায় ধার থেকে মুছে নিয়ে গেছে আর্দ্র চুল তার এখনি বাখিত
অনেক আঁধার বেলা, মেঘের মন্থর খেলা, পাল তোলা, কাঁপা, অবধিত।
মেঘের মাটিল তায় উজল সুতোল রেখা ফুটে ওঠে হাওয়ার কাপটে,
আঙুলের ছায়া তাতে ঝরিয়েছে কত জল, এক কোঁটা আলো লাগে ঠোঁটে।
সেই ভুলে বহু দূর ঘুরিয়েছি, হ'য়ে গেছে চোখ মেলে চেয়ে থাকা আজ,
পুবালি বাতাস কেন মুখ চোখ পায় হ'য়ে খোঁজে এই আনাচ কানাচ।
এখন মোহরাঙ্কিতা ভাদ্রমাসের দিন জেগে এলো আকাশের চরে,
সেই গাঁয়ে খেয়া নেই, তবু জল, স্থল সেই সব জাগে বুকের ভিতরে।
মেঘ নামিয়েছে ঝুরি, চোখ তার ভরোভরো তাদের ধারার মতন,
ধারা নিয়ে চ'লে গেছে বৃন্দাবন পায় হ'য়ে নদীয়ের উজানে কখন।

দুটি কবিতা

অরুণ সান্যাল

সমুদ্র

"For the sky and the sea, and the sea and the sky
Lay like a load on my weary eye,
And the dead were at my feet."
—S. T. Coleridge

সমুদ্র দেখিনি আমি, সমুদ্র কোথায় কত দূরে
কতটা দক্ষিণে, পূবে, কতটা পশ্চিমে আছে, তার
জানা আছে পরিষ্কার ভূগোলের পাঠ্য তালিকায়
বালোর অচল্য সাথ অনন্তাবা প্রাণের অসুখে।
অবশ্য নিশ্চিত জানা সমুদ্রের বিশাল উপমা,
আমি দিগন্তের প্রেমে বাঁধা এক মুগোত্তর ছবি—
কখনো ওঠেনি তার ঢেউ। কিংবা সন্ধ্যার পূরবী,
অথবা মুক্তার মত কিংবা পরিচ্ছন্নতার কথা।

অবশ্য এটুকু জানা:—সমুদ্রের প্রতীকলক্ষণ—
যত দূর পুরী, কন্যাকুমারিকা, বম্বাই বা হুহু
অথবা বিখ্যাত দ্বীপ, কিম্বর্ত লেগুন যত, যত
উদ্‌ভ্রান্ত পায়রাচিহ্নে ছেয়ে থাকে জীবন মরণ।
যাদো সে-সাগর চেনা। সে-কাল দিয়েছি তবু পাড়ি
উদ্ভব অস্তিত্বে শেষে প্রাণপণে করেছি তাহির—
মেয়েদের অত মনে কতখানি ভিতর বাহির
এবং সেখানে কত দ্বীপ, দ্বীপ, যত্ন বালিয়াড়ি।

যতবার ভালোবাসা দিয়ে আমি ভিজিয়েছি মন
জেনেছি সমুদ্রে হাত ডুবিয়েছি, অনন্ত আত্মার

আশ্বিন ১৩৬১

অনিবার্য নীলময় আকাশের এপার ওপার।
ছুঁতে ছুটে গেছে খুঁজে নীলকণ্ঠ অনন্ত যৌবন।
সমুদ্র অতৃপ্ত সাধ তৃষ্ণায় ব্যাকুল সমাহার—
এটুকু বুঝেছি তাই রক্তের গভীর তলে যখন
যদি কেউ বলে তার সঙ্গীহীন অসহ্য মার্থতা
বুদ্বুদের বিস্ফোরণে ভেসে শুধু নিঃস্ব অহংকার।

সমুদ্রও শিশুক্রীড়া। কাকা আর জলায় প্রলাপ
দেখেছি অনেক পরে ফলিত বিদ্যায় কাছাকাছি—
হিমির নির্জনে খুঁজে যখন ওটিয়ে ব'সে আছি
সমুদ্রকল্লোলে যেন কানে আসে মুক্তির সংবাদ।
বুঝেছি বালির বুকে মুখ গুঁজে অনেক কাঁকড়াও
সহজে উত্তাপ পায়—স্বাধীন হাওয়ার আর তিমি
হার্পুনের তীক্ষ্ণ ঘায়ে গাঁথা হোলে মূর্ত কালনেমি
কঠিন মিক্তির ভাগে তাগাবান—উদ্বৃত্ত হারাণ।

সাগরসন্তান নই, শতমুখী গলার প্লাবনে
কোনোদিন পাবো কিনা নিধারিক পাহাড়ের স্মৃতি।
জানিনা কেবল আমি রক্তে গাঢ় ঘন্তার পীড়নে
আরণ্যক অন্ধ ইচ্ছা টেনে আনে স্রোতের প্রাঙ্গণে।
একান্ত শৈশব থেকে সমুদ্র দেখার সাধ আছে—
অজানা সে সাধ মেটে দুর আর ঘোলের তরঙ্গে
দুর্নিবার পাওয়ার পাওনা গণ্ডা দিয়ে হাতে হাতে
যেতে চাই সত্যকার চিরন্তন সমুদ্রের কাছে।

অভিজ্ঞান

ভেবেছিলাম তোমার কথা সুধাবো না সমস্তিত,
ভেবেছিলাম তুমিই আছো, তাই
দিনের ঠোঁটে রাতের ছোঁয়া সন্ধ্যা বেলে অলক্তক
ক্লান্তি দিয়ে শান্তি কিনে পাই।
কত যে আশা ভালোবাসায়, তোমার নীল আলস্যিকে
সাগরসেঁচা মুক্তো ভাবি, আর
যে-কথা আছে বুকে মিশে তোমাকে তাও জানাইনি—
ভেবেছি—সে কী বুঝিয়ে বলা যায়।

গিয়েছে দিন গিয়েছে রাত—শুকুর হাতে বারোটা মাস
পড়েছে ঝরা ফুলের মতো ঝরে—
হারিয়ে গেছে পরাগ তার আকাশ ছুঁয়ে, হতাশাদের
তখন যেন হৃদয় দিলো ভ'রে।
তোমার যত কথার মোলা—খেয়াল খেলা বিপথে
ঝরিয়ে দিলো পাপড়ি গোটা-গোটা,
যে-মন তুমি জড়িয়ে দিলে, অনেক পাওয়া অনায়াসে
সেখানে কোটে শুধু কৌটা-কৌটা ॥

জানিনে আমি জানিনে তবু তোমার আশা কতটা বাঁধা
সে-বাঁধা নাকি চোরাবালির চর—
জানিনে আমি জানিনে তাও, তোমার স্থির নিশ্চয়তা
উপমা দিই সাঁঝের সরোবর।
যে-প্রেম তুমি জ্বালিয়েছিলে, যে-শিখা তুমি তৃপ্তিহীন
অকম্পিত বিদ্যুৎ রেখা—তাকে
কী বেসো আমি বেসার মতো, যে-আমি এক দীপ্তিহীন
সে-আমি আজি দিনের ঝাঁকে-ঝাঁকে।

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬১

প্রাণের যত মূল্য ছিলো, হে মেঘবতী, তোমাকে সে তো
দিয়েছি পুরো দানের অধিকার—
তোমার স্নিগ্ধ ঘাটে যাকে যে আলো আছে অনাবৃত
আমি সে-জ্যোতি চক্ষু তারকার।
আমার তীক্ষ্ণ মূর্ছনাকে জেনেছি আমি, সে জেগে রাখে
কত না আশা প্রত্যাশার চাওয়া,
—আমার তুমি দিয়েছো চোখ—এমন বড় বিশ্বাটাকে
জেনেছি আমি যত বড় পাওয়া॥

কবিতা
বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১

একটি প্রশান্ত প্রার্থনা

সত্যেন্দ্র আচার্য

খেয়ালি আকাশের সজল ছায়ায়
একহারিণী চোখে কী ছায়া নিয়তলে ?
কার সে ছায়াছবি চকিতে চমকায় ?

সাগরে দীপ জেলে কেমনে সে-নাবিক
হারায় নিকেতনে প্রবাসী তারা গোনে
জলের উপছায়া মমতা এনে দিক ।

কতো আকাশের খেয়ালি সে-খেলায়
তারায়া দীপ আসে নগরে উপবনে,
কার সে ছায়াছবি চকিতে চমকায় ?

তবু তো শুধু আজ আকাশে সমধিক
নাবিক চমকায় চকিত উচাটনে,
জলের উপছায়া মমতা এনে দিক ।

স্পর্শ-মায়া কেন মিটালি তৃষিকায়,
দুই চলমল মেঘের ছাওা মনে,
কার সে ছায়াছবি চকিতে চমকায় ?

কী কথা আসে মেঘ সজল সে-মায়ায়
মায়াবী ছত্রায় এ-কোন মণিদীপ ?
কার সে ছায়াছবি চকিতে চমকায় ?
জলের উপছায়া মমতা এনে দিক ।

চক্ষুদানপাখী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তুমি কবিতার পক্ষ। কবিতার মণির সৌরভ
মুহূর্তেই মুছে যায়—তুমি এলে আমার এ-ঘরে।
শুধু থাকে যৌবনের যন্ত্রণায় তীব্র অনুভব
কামনার অন্ধকার বিশাল বৃষ্টির মতো ঝরে।

আমাকে নিষ্ঠুর হাতে ছিন্ন ক'রে নাও তুমি এসে
সমস্ত পৃথিবী থেকে তোমার আপন তমসায়,
নিজেকে নিঃশেষ ক'রে ইচ্ছা করে সেথা যাই.ভেসে
যেখানে তোমার স্নেহে কবিতায় কীর্ণ শিখা মিঃশেষে বিলায়।

তুমি চ'লে গেলে দূরে—সূর্যমুখী উষার মন্থন
ফিরে আসে অন্ধ সখী, কবিতা, আমার এই ঘরে
শূন্যের বিস্ময় থেকে তুলে নেয় মায়াবী সংসার-তীক্ষ্ণ মন্ত্র
সে আমার বক্ষমাঝে আনন্দের স্বাদে সিক্ত করে।
কাব্যের সঙ্গিনী তুমি, তুমি তাকে চাও না অন্তরে,
সে তবু আমার মনে তোমারই স্বপ্নের মূর্তি গড়ে।

দুটি কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

আত্মদর্পণ

নদীর বুকে বৃষ্টি পড়ে
জোয়ার এলো জলে,
লুকিয়ে-রাখা আমার মতো
ঘাসের কাঁকে ইতস্তত
একটি দুটি ম্লান জোনাক
ক্বচিৎ নেবে, জ্বলে।
আকাশ ভরা মেঘের তারে
বিশ্বচেতন বাণী
গুমরে উঠে জানায় শুধু
অবোধ আকুলতা।
আকারহীন, হিংস্র, খল,
অনিশ্চিত কেমিল জল
মিলিয়ে গেলো অদৃষ্টের
ঘোর ইশারাতে ;—
তোমায় আমি ছেড়ে এলাম
ঈশ্বরের হাতে।

তাকিয়ে-থাকা একটি দীপ
জ্বলছে ছোটো ঘরে,
একটি হাত এগিয়ে আছে
কম্পমান বুকের কাছে
ছিন্ন-ছুটি-সেলাই-করা
শীতল কাঁথার 'পরে।

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬১

মনে পড়ায় ইন্দ্রজালে
আপনা হ'লো হায়,
আমায় হাতে লাগিয়ে ওঠে
তীক্ষ্ণ তলোয়ার।
দূরের কালে হারিয়ে-যাওয়া
বেদনাভরা উঠলো হাওয়া ;—
ছেলেবেলার গল্পকথা
অন্ধকার রাতে
আমায় প্রেম যেথে এলেন
ঈশ্বরের হাতে।

পালের তাঁবে তরিতে।
সর্প ওঠে দুলে,
অনাসক্তের ছন্দ চালে
পাটাতনের পাঁজর কাঁপে,
ক্রন্ত মাঝের অস্থিরতায়
পদুই ওঠে জ্বলে।
কঠিন হাতে নাবিক ধরে
আকাঙ্ক্ষার হাল,
কপট স্রোতে তালে আমার
মৃত্যুস্নেহের তাল।
দূরের-তলে ঘাটের টানে
অন্ধ নাম প্রেমের আনে
ঢেউয়ের আর দিনান্তের
আড়াল সংবাদে ;—
আমায় প্রাণ যেথে এলাম
ঈশ্বরের হাতে।

উল্টো দিকে ছুটলো আমার
আঁধার আয়নাখানা ;
কঠোর নীল ঘুমের 'পরে
বন্ধুদায় কড়িয়ে ধরে
মস্তিষ্কীন আসঙ্গদের
মূর্খ প্রতারণা।
তবুও আছে একটি ঘর
কুঞ্জলতার ঘেরা,
দাওয়ায় ব'সে গল্প করে
পূর্বপুরুষেরা।
তাঁদের মৃদু খিলখিলানি
সম্বল ক'রে সাথীখানি
তাদের তরু, সংশয়ের
অন্ধ অজানাতে ;—
আমি তোমায় রেখে এলাম
ঈশ্বরের হাতে।

যাওয়া-আসা

আবার আমায় ফিরতে হবে তোমার কাছে,
প্রিয়তমা,
নয়তো আমার মরণ-বেলায় কেমন ক'রে
হবে ক্ষমা।
কোথায় আমি চলেছি আজ বাঁকা পথে
ঘুরে-ঘুরে,
অস্ত-রবির অস্ত-জ্বলা আকাশ থেকে
অনেক দূরে।

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬১

এগিয়ে আসে অন্ধকার, ঘনে বেলা,
শিহরনে যায় আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গেরা,
সকল দিকে হাওয়ার ছেলে বিদায়ের
পরিক্রমা
বলে, আমায় ফিরতে হবে তোমার কাছে,
প্রিয়তমা।

অনেক ঢেউয়ের দোলায় ধরা খাপছাড়া
নৌকো আমার
আলিঙ্গনের আবেগ-ভরা পাগল জলে
ভাসলো এবার।
স্রোতের টানে অন্তহীন স্মৃতির গান
কলস্বরে
ছড়িয়ে যায় আসন্ন নীল বৈশাখের
বিপক্ষরে।
দেখার কোন মায়ায় চোখ ভুলোয়লো
সান্ধ্যনার প্রান্ত মোর ছুঁয়েছিলো,
সেই জলে না ডুবলে পরে কোনোখানেই
পৌঁছবো না ;—
তোমার কাছেই আবার আমায় ফিরতে হবে,
প্রিয়তমা।

পুরবে আমি ছুঁয়ে আছি অকূল জলের
কণায়-কণায়,
নিরাবরণ তরুণ তাম চিরকালের
মন্ত্র শোনায়।

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১

বুঝি না তার কঠিন ধরা, কী মিঠুর
ভালোবাসা,
কেবল এই বক্ষ-মাঝে এক হ'য়ে যায়
যাওয়া, আসা।
দেখেছি এক সাগর-তটে ইন্দ্রধনু
বরষহীন আকাশ দিয়ে সাজায় তনু,
জেনেছি তার আলোয় তারা পাখি কোথায়
হইলো হারা ;—
আমার আমায় ভুলতে হবে তোমার সাথে,
প্রিয়তমা।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[১২৯৪—১৩৬১]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা কাব্যের সেই যুগের প্রতিনিধি, যখন রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছেটা জেগে উঠেছে, কিন্তু অন্য পথ ঠিক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেন একটা আলো-আঁধারি সময়, বদল-বদলের ঝিলিক দিচ্ছে তারস্বরে, অথচ ঘরের মধ্যে জড়ো হ'য়ে আছে পুরোনো আসবাবপত্র, বাতি, ঝনঝ, মশগুলের অভ্যাস।

সব কটা জানলা খুলে বদলের হাওয়া প্রথম যিনি সাহসে ঘরে দিলেন, তাঁর নজরুল ইসলাম। নজরুলের ছিলো বৃত্ত কণ্ঠস্বর, অবারিত আঘাতের শক্তি, তাই রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিদের মধ্যে তাঁকেই আজ উল্লম্ফনের সেতু ব'লে মনে হয়। কিন্তু এই সহজের তৃতীয় দলকে যে-কবিরা মুখর কিংবা কিশোর ছিলেন, তাঁদের বদল কাব্য টক্কিত পেয়েছিলো আরো দু-জন অগ্রজ সমসাময়িকের কাছে: তাঁরা মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

মোহিতলালের চরিত্রলক্ষণযুক্ত 'বিস্মরণী' যখন বেরোলো, ততদিনে, যতদূর মনে পড়ে, যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা', 'মরুশিখা' দুটোই প্রকাশিত হয়েছে। আমরা 'কল্লোলে'র অর্বাচীনেরা যখন বিস্মিত হ'য়ে তনছি 'বিস্মরণী'র বড়ো-বড়ো তাল, ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে-চলা কল্লোল, সেই সময়েই যতীন্দ্রনাথ আমাদের অভিনিবেশ দাবি করলেন প্রায় উল্টো রকমের সুর শুনিয়ে—সংক্ষিপ্ত, টাটকা, আটপৌরে, এবড়ো-খেবড়ো মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যাবার শুকনো হাওয়ার মধ্যে খুব ক'ষে সোজা গাড়ি চালিয়ে নেবার মতো সুখ।

যতীন্দ্রনাথের কাছে কী পেয়েছিলাম আমরা? পেয়েছিলাম এই আশ্বাস যে আবেগের ভাষাবাদ জগৎ থেকে সামাজিক সমস্যগুলো মেখে এসেও কবিতা বেঁচে থাকতে পারে। পেয়েছিলাম একটি উদাহরণ যে পরিশীলিত ভাষা ও সুবিন্যস্ত ছন্দের বাইরে চ'লে এলেও কবিতার আভা যায় না। 'মরীচিকা'য় তিনি যে-ভিন্ন ধারায় ছন্দকে অনেকটা গদ্যের ভঙ্গিতে মুক্তভাবে ব্যবহার

করেছিলেন, সেই ছন্দেরই একটি মিষ্টি, সুপরিমিত প্রকরণ নিয়ে ব'সে উঠলো অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা'র কবিতাবলী।

আরো কিছু পেয়েছিলাম। প্রথমত, প্রবহমান যুক্তি-অর্থের ফাঁকে-ফাঁকে হঠাৎ এক-একটি আলো-জ্বলা, ঢেউ-তোলা পঙ্‌ক্তি ('রাত্রি নয়নে বাসনা ক'রে ঘুমিনু বাসরঘরে')—বিরল ব'লেই তাদের চমৎকারিত্ব যেন বেশি। দ্বিতীয়, একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। ভিন্ন মানে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন থেকে ভিন্ন। যেমন রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ অতীন্দ্রিয়তার পরে যোগিকলালের নিষ্ঠুর বেদনা-বোধে আমরা উৎসাহ পেয়েছিলাম, তেমনি, অন্য দিক থেকে যেন একটা নিষ্প্রাণ-ফেলা নিষ্কৃতি ছিলো মতীন্দ্রনাথের সরল, বৈরাগী দুঃখবাদে। দৃষ্টির আত্মস্থতার অভিনিবেশে আমাদের অভ্যস্ত আমরা সেই প্রথম তত্ত্বমূল বাক্যোক্তি, দর্শন, নৈষ্ঠিকবাদ। 'আমার মতে জগৎটাতে ভালোটাতেই গামার, মন্দ যদি লাগেচিন্তে ভালোর সংখ্যা বাড়ায়'—এই একেবারে বিরুদ্ধ কথা ব'লে মতীন্দ্রনাথ আমাদের মনোহরণ করলেন—

বন্ধু, বন্ধু গো,
আলো জ্বেলে রেখো যদি বে বেশি রাতি তার সংশয়।

স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিলেন তাঁর অবিশ্বাস—

তবু, মুখা আর বুঝে
কবরখানার মরমর যা কুক দিয়াই শুক,
সবাই বলেছে, পাঠালেন মোরে যিনে বিধি ভগবান :
তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তার—তোমাদেরি তিনি ভাই।
উপায় পেয়েছি মুখ্য।—
হ'বে না মনের অন্ধ রাত্রি লোক শাশ ভাগ আধি দুঃখ।
যেমন আগে তেমনি রহিল, বাড়িল না একচুল,
ভগবান চান আমাদের শুধু—একথা বাঁচিল ভুল!
কি হবে কথায় ছলে?
ভগবানে চাব—তবু হয় থাকো, একথা পাগলে বলে।

কথাটা উপাদেয় সন্দেহ নেই, হয়তো অকাট্য ব'লেও মনে হ'তে পারে, কিন্তু এ থেকে কোনো গতিশীল চিন্তার যে সূত্রপাত হ'তে পারে না সে-কথা

অবশ্য না-বলনের ছলে। মানুষের জীবনে বা বিশ্বব্যাপারে দ্বন্দ্ব কিংবদন্তী। ঠিক কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ, সেটা জেনতে হ'লে আর দৃষ্টির প্রয়োজন হয়, কবির মনো সেটা সব সময় আশা করাও সংগত হয় না। সমসাময়িক বাংলা কাব্যের উপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে রূপের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে দুয়; এতেও বোঝা যায় তাঁর দুঃখবাদ বা নেতিবাদের প্রধান রূপ ছিলো—অনুপ্রেরণার শক্তি নয়, প্রান্তিহারক রমণীয়তা।

সুখের বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব তাঁর মতবাদের উপর নির্ভরশীল নয়, আর এই মতবাদও তাঁর কবিজীবনের প্রথম এবং একটি পর্যায়েই আবদ্ধ। তাঁর সম্পূর্ণ কাব্যের পরিমাণ যদিও অত্যধিক নয় তবু তাতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই; সাংসারিক জীবনের হাস্যচুরিত বর্ণনা থেকে ঈষৎ-গভীর ভাবব্যঞ্জক মনস্তোক্তি পর্যন্ত নানারকম বিভাগেই তাঁর আনাগোনা ছিলো। আজকের দিনের পাঠকের পক্ষে তাঁর কাব্য শুধু ঐতিহাসিক কারণে ঔৎসুক্য-জনক নয়, সেখানে উপভোগের জন্যও বিভিন্ন উপাদান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে।

বু. ব.

[অনুপদী : মরীচিকা, মরশিখা, মরযাত্রা, শান্তি, ক্ষিপ্রা, অনুপূর্বা (সনেটগুচ্ছ)]

বিজ্ঞপ্তি

কবি হেমচন্দ্র বাগচী আজ বহুকাল যাবৎ মানসিক পীড়ায় অসুস্থ আছেন। তাঁর সাহায্যকল্পে কবিতাভবনের উদ্যোগে ও প্রতিভা বসুর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের "শেষ রক্ষা" নাটক নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে ১৩ই জুন ১৯৫৩ তারিখে অভিনীত হয়েছিলো। এই অভিনয়লব্ধ আড়াই শত টাকা কবিকে পাঠানো হয়েছে। এর দ্বারা তাঁর চিকিৎসা বা স্বাচ্ছন্দ্য যদি কথঞ্চিৎ অগ্রসর হয় তাহ'লে 'কবিতা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই তৃপ্তিকর হবে। আজকের দিনের পাঠকের হয়তো ঠিক স্মরণে নেই যে হেমচন্দ্র 'কল্লোল'-কালীন কবিদের অন্যতম, এবং, যতদিন তিনি সুস্থ ছিলেন, তাঁর রচনা 'কবিতা'য় নিয়মিত প্রকাশিত হ'তো।

সম্পাদকীয় বিজ্ঞপ্তি

'কবিতা'র বর্তমান সংখ্যা যখন ছাপা হচ্ছে, তখন জীবনানন্দ দাশের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলো। এর পরবর্তী পৌষ সংখ্যাটি আমরা সম্পূর্ণরূপে জীবনানন্দর স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবো, তাই এ-সংখ্যায় তাঁর বিষয়ে কোনো আলোচনা প্রকাশিত হ'লো না। তাঁর কাব্যের ও ব্যক্তিত্বের নানাবিধ আলোচনা নিয়ে আগামী সংখ্যাটি যাতে শীঘ্র প্রকাশিত হ'তে পারে, আমরা সে-জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করছি।

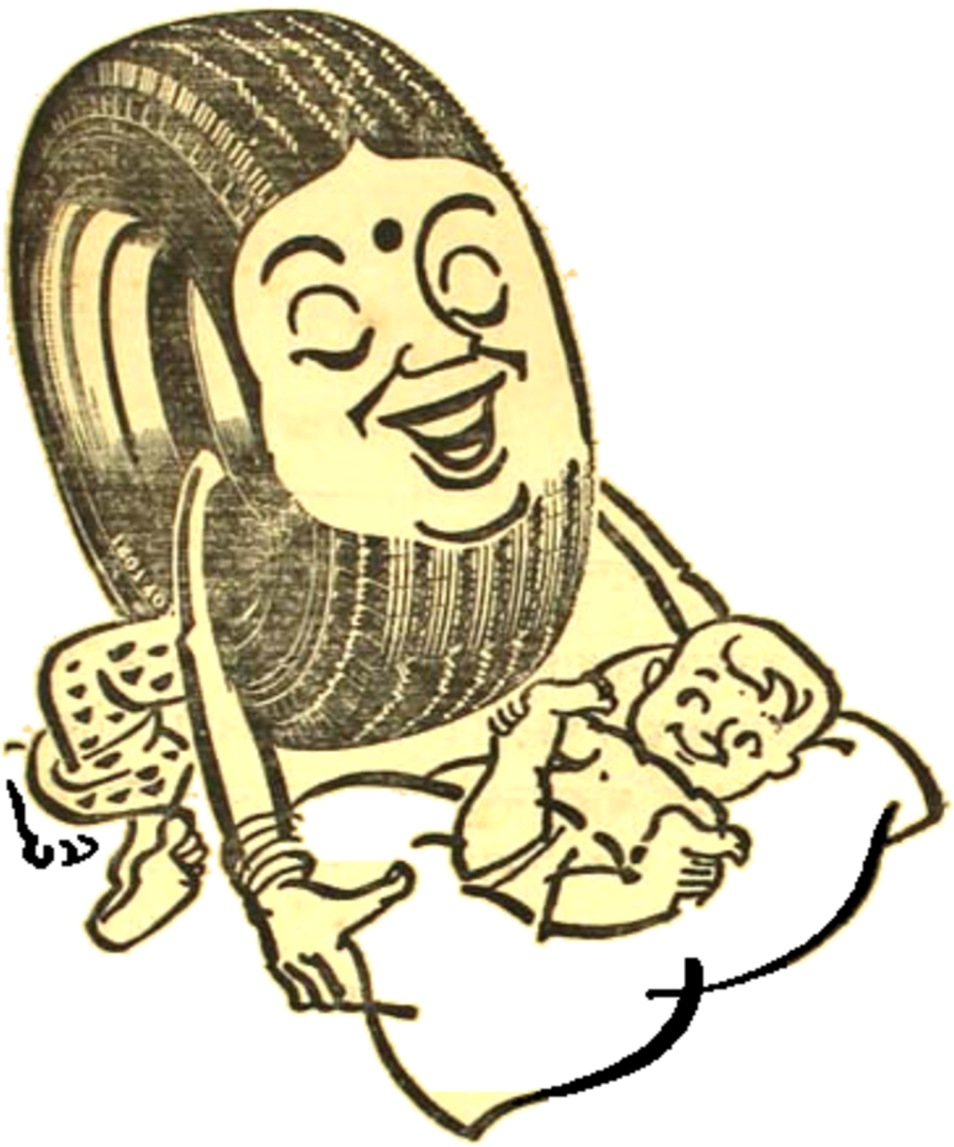

আরামে ঘুমানোর জন্য

ডানলপ

দীনবন্ধু দাস

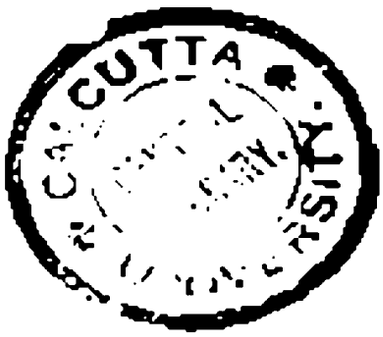

জীবনানন্দ-স্মৃতি-সংখ্যা

কবিতা

পৌষ ১৩৬১

উনত্রিশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা ৮০

জীবনানন্দ দাশ

বুদ্ধদেব বসু

চাকা, শ্রীষ্টকাল, ১৯২৭। হাতে-লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা ছাপার অক্ষরে রূপান্তরিত হ'লো। ঔৎসুক্যে চোখ ধাঁধে গেলো, বেরিয়ে এলো সমকালীন প্রজাপতি। কিন্তু অল্পমাত্র কবিতা হ'লেই তোমো কিছু উপেক্ষণীয় নয়; কারো হয়তো অল্প সময়েই কিছু করবার থাকে, সেটুকু ক'রে দিয়েই সে বিদায় নেয়।

'প্রগতি'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে রীতিমতো বিখ্যাত ছিলেন একমাত্র নজরুল ইসলাম, আর অচিন্ত্যকুমার—যাঁর 'বেদে', 'টুটা-ফুটা' সবেমাত্র বেরিয়েছে—তাঁকেও বলা যায় লব্ধ-সমাগত। এই দু-জন ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন আসন্ন, অভ্যাসন্ন, উপক্রমণিক; বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে তাঁদের অপরিচয়ের ব্যবধান তখনো ভেঙে যায়নি। আর এঁদের মধ্যে—সম্পাদক দু-জনকে বাদ দিয়ে—যাঁদের রচনা সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে ছাপা হ'তো, তাঁদের নাম জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।

বিষ্ণু দে প্রথম লেখা পাঠিয়েছিলেন 'স্কাল বিল্ব' বা ঐ রকম কোনো ছদ্মনামে, নিখুঁত ছন্দের কোনো কবিতা। তারপর অনামে ও বেনামে, গদ্যে ও পদ্যে, তাঁর অনেক লেখাই 'প্রগতি'র পাতা উজ্জ্বল করেছিলো। তাঁর সাহিত্যজীবনের সেটা প্রথমতম অধ্যায়; লোকে তাঁর অনামকেই বেনাম ব'লে ভুল করছে। অনেকেই বিশ্বাস করছে না 'বিষ্ণু দে'-এর মতো সংক্ষিপ্ত, সুশ্রাব্য নাম বাস্তব কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব।

কিছুকাল পূর্বে জীবনানন্দ দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত 'শ্রীলিখা' নামে একটি কবিতা 'কল্লোলে' আমরা লক্ষ্য করেছিলাম; কবিতাটিতে এমন একটি সুর ছিলো যার জন্য লেখকের নাম ভুলতে পারিনি। 'প্রগতি' যখন বেরোলো, আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই লেখককে অভ্যর্থনা জানালাম, তিনিও তার উত্তর দিলেন ঠিক, অকৃপণ প্রাচুর্যে। কী আনন্দ আমাদের, ওঁর কবিতা যখন একটির পর একটি পৌঁছতে লাগলো, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম—এক শান্ত, ধূসর, আলো-ছায়ার অদ্ভুত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শসহময়, অতি-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়চেতন জগৎ—যেখানে গহনের নিশ্বাসপবনের শব্দটুকুও শোনা যায়, মাছের পাখনার কোমলতম স্পন্দনে তরঙ্গের গভীর জল আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। এই চরিত্রবান নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হলাম আমরা।

'প্রগতি'র প্রথম বছরের যাঁরানো সেটটি আমার অনির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার থেকে অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছে, অন্য কোথাও তা সংগ্রহ করতেও পারলাম না। পত্রিকার সূত্রপাত থেকেই জীবনানন্দর লেখা সেখানে বেরিয়েছে এই রকম একটা ধারণা আছে আমার; কিন্তু প্রথম বছরে কোন-কোন লেখা বেরিয়েছিলো সেটা স্পষ্টভাবে মনে আনতে পারছি না। খুব সম্ভব তার মধ্যে ছিলো '১৩৩৩', 'পিপাসার গান' আর 'অনেক আকাশ'। সৌভাগ্যক্রমে, দ্বিতীয় আর অসম্পূর্ণ তৃতীয় বছরের সংখ্যাগুলি এখনো আমার হাতের কাছে আছে, আর তাতে—এখন পাতা উল্টিয়ে প্রায় অবাক হ'য়ে দেখছি—প্রথম লেখা দিয়েছিলো 'সহজ', 'পরস্পর', 'জীবন', 'স্বপ্নের হাতে', 'পুরোহিত' (পরবর্তী নাম 'নির্জন স্বাক্ষর'), 'অনেকটি লাইন', 'বোধ', 'আজ', 'অন্ধকারের গান'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সতেরোটি কবিতার মধ্যে 'পাখিরা', 'কল্লোলে', 'ক্যাম্পে', 'পরিচয়ে', 'তুফানের আগে' 'কবিতা'য় আর কোনো-কোনোটি 'মুসলমান'এ বেরিয়েছিলো, কিন্তু অধিকাংশেরই প্রথম প্রকাশ 'প্রগতি'তে, তাই ঐ প্রথমটিকে আমার নিজের জীবনের একটি অংশ ব'লে মনে হয় আমার। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করি যে 'আজ' নামক সুবৃহদ্বিস্তৃত দীর্ঘ কবিতাটি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নেই, পরবর্তী অন্য কোনো গ্রন্থেও গ্রথিত হয়নি।

'প্রগতি'তে, শুধু প্রকাশ করা নয়, নতুন সাহিত্য প্রচার করার দিকেও লক্ষ্য ছিলো আমাদের। তার জন্যে জনের মধ্যেই তাগিদ ছিলো, বাইরে থেকে উত্তেজনারও অভাব ছিলো না। দেশের মধ্যে উগ্র হ'য়ে উঠেছিলো সংঘবদ্ধ, প্রতিক্রিয়াদুষ্ট, অপরিমিত, অনমনীয় বিরুদ্ধতা। যাঁরা বুদ্ধিজীবী কালের তাঁরা কেউ সাহিত্যে। মহাজনি কারবারি, কেউ বা তাঁদের আশ্রিত, কেউ মহিলা, কেউ বড়ো ঘরের ছেলে, কেউ নামজাদা সম্পাদক অথবা লণ্ডনে-পাস-করা প্রোফেসর, আর কেউ বা ফারসি কবিতার আর এক লাইন বানিয়ান জানেন। তুলনায় আমরা, যারা নেহাৎই কলেজের ছাত্র কিংবা সবেমাত্র উত্তীর্ণ, যে-কোনোরকম সাংসারিক বিচারে আমরা কত দুর্বল তা না-বললেও চলে; কিন্তু যেহেতু সংসারের নিয়ম আর সাহিত্যের বিধান এক নয়, যেহেতু নিজুকের লক্ষ কথাকে কীটের অরে পরিণত ক'রে একটিমাত্র কবিতার পংক্তি তারার মতো ঝলমল করে, তাই আমরা হেরে যাইনি, হেরে যাইনি, স'রে যাইনি, দাঁড়িয়ে ছিলাম শত্রুপক্ষের সামনে, কিছু-কিছু প্রত্যুত্তরও দিয়েছিলাম। সেই দু-বছর বা আড়াই বছর, যে-ক'দিন 'প্রগতি' চলেছিলো, আমি আত্মরক্ষাতে লিপ্ত হয়েছিলাম, শুধুমাত্র সমর্থকভাবে নিজের কথাটা প্রকাশ না-ক'রে প্রতিপক্ষের জবাব দিতেও চেয়েছিলাম—সেই সব আক্রমণেরও উত্তর, যাতে আক্রোশের কথা বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে, আর ইতর রসিকতার অন্তরালে দেখা যাচ্ছে পান-খাওয়া লাল-লাল দাঁত, কালচে মোটা ঠোঁট, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসনের ঘূর্ণিত, লোলুপ, ব্যর্থকাম দৃষ্টি। এই ধরনের আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন জীবনানন্দ, তাতে আমার যেমন উত্তেজনা হ'তো নিজের বিষয়ে মন্তব্য প'ড়েও তেমন হ'তো না, যেহেতু তাঁর কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম, আর যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন সব অর্থে নিরীহ, কবিতা ছাড়া সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, তাই আমার মনে হ'তো তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য। 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্যে জীবনানন্দর প্রসঙ্গ, সব-সাময়িক অন্য-লেখকদের তুলনায়, কিছু বেশি পৌনঃপুনিক ব'লে মনে হয়; তার অনেকটা অংশই যে প্রতিবাদ সে-কথা আজ আমার খারাপ

যাগে। অবশ্য আমি অচিরেই বুঝেছিলাম যে প্রতিবাদ মানেই শক্তির অপব্যয়, আর পরবর্তী দীর্ঘকাল ধ'রে সেই অপব্যয় সযত্নে এড়িয়ে এসেছি, কিন্তু এখানে অনিন্দ্যসুন্দরের এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হ'লো, তা না-হ'লে সেই সময়কার সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যাবে না। আজ বন্ধুন ক'রে স্মরণ করা প্রয়োজন যে জীবনানন্দ, তাঁর কবিজীবনের সূত্রপাতে, অনুরাগের নিশ্বাস দ্বারা এমনভাবে নির্বাসিত হয়েছিলেন যে তারই জন্য কোনো-এক সময়ে তাঁর জীবিকার ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটেছিলো। এ-কথাটা এখন আর অপ্রকাশ্য নেই যে 'পরিচয়ে' প্রকাশের পরে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সম্বন্ধে 'অশ্লীলতা'র নির্বোধ এবং দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিলো যে কলকাতার কোনো-এক কলেজের শুচিবায়ুগ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত ক'রে দেন। অবশ্য প্রতিভার গতি কোনো বৈরিতার দ্বারাই রুদ্ধ হ'তে পারে না, এবং পৃথিবীর কোনো জন কীটস অথবা জীবনানন্দ কখনো নিশ্বাস দ্বারে মূর্ছা যান না—শুধু নিষ্ফলেরাই চিহ্নিত হ'য়ে থাকে ক্রূরতায়, ক্ষুদ্রতার উদাহরণস্বরূপ। মার্কিন লেখক হেনরি মিলার একখানা বই লিখেছেন, যার নাম 'Remember to Remember'। এই নামটি উল্লেখযোগ্য, কেননা আমাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে একটা অংশ হ'লো মনে রাখা। জীবনে যেখানে-যেখানে সুন্দরের স্পর্শ পেয়েছি সেটা যেমন স্মরণযোগ্য, তেমনি যেখানে কুৎসিতের পরাকাষ্ঠা দেখলাম সেটাকে যেন দুর্বলের মতো মার্জনীয় ব'লে মনে না করি। যেন মনে রাখি, মনে রাখতে ভুলে না যাই।

২

'প্রগতি'র পাতায় জীবনানন্দর কবিতা বিষয়ে যে-সব আলোচনা বেরিয়েছিলো তার কিছু-কিছু অংশ এখানে তুলে দেবার লোভ হচ্ছে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই উদ্ধৃতিগুলির লেখক আর বর্তমান প্রবন্ধকার ঐতিহাসিক অর্থে একই ব্যক্তি; এর রচনাভঙ্গি, আর লেখার মধ্যে ইংরেজি শব্দের অবিরল ব্যবহার দেখে আজ আমার কর্ণমূল আরক্ত হচ্ছে। তবু, সব দোষ সত্ত্বেও,

আপত্তি অন্ত কারণে যাবতীয় হ'তে পারে : প্রথমত, এতে বোঝা যাবে একজন প্রথম শ্রেণীর পাঠকের মনে জীবনানন্দের কবিতা কী-রকম ভাবে সাড়া তুলেছিলো ; দ্বিতীয়ত, এই ত্রিশ বছরে বাংলা কবিতা কত দূর অগ্রসর হয়েছে তা বোঝার পক্ষেও এগুলো কিছিৎ কাজে লাগতে পারে।

জীবনানন্দবাবু বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা আবিষ্কার করেছেন বলে' আমার মনে হয়। তিনি এ-পর্যন্ত মোটেই popularity অর্জন করতে পারেননি, যদিও তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধ হয় বিমুখ ;—অচিন্ত্যবাবুর মতো তাঁর এরি মধ্যে অসংখ্য imitator জোটে নি। তার কারণ বোধ হয় এই যে জীবনানন্দ বাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ ;...তাঁর কবিতা একটু ধীরে-সুস্থে পড়তে হয়, এবং আস্তে-আস্তে বুঝতে হয়।

জীবনানন্দ বাবুর কবিতায় যে-সুরটি আগাগোড়া বেজেছে, তা'কে ইংরেজ সমালোচকের ভাষায় 'renascence of wonder' বলা যায়।...তাঁর ছন্দ ও শব্দযোজনা, উপমা ইত্যাদিকে চট করে' ভালো কি মন্দ বলা যায় না—তবে "অদ্ভুত" স্বচ্ছন্দে বলা যায়।...তাঁর প্রধান বিশেষত্ব আমরা এই লক্ষ্য করি যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে' অতি সেকেলে শব্দ ব্যবহার করেই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তাঁর diction সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব বস্তু হয়ে পড়েছে—তা'র অনুকরণ করাও সহজ বলে মনে হয় না।...[তিনি] এমন সব কথা বলাচ্ছেন যা পূর্বে কেউ কবিতায় বসাতে আশা করে নি—যথা, "কেঁচে," "নটকান," "পেঁচিল", "খুন্তি" ইত্যাদি। এর ফলে তাঁর কবিতায় যে অপূর্ব তাজগা এনেছে সে-কথা আগেই বলেছি ; তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি আলাদা ভাষা তৈরী করে' নিতে পেরেছেন, এ জন্য তিনি গৌরবের অধিকারী। • • •

এ-কথা ঠিক যে তিনি [জীবনানন্দ] পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক। এক হিসেবে তাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis বলা যেতে পারে। প্রেমেন্দ্র বাবু বাস্তব জগতের সকল ক্ষুদ্রতা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ, বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা তাঁকে নিয়তই পীড়া দিচ্ছে।...জীবনানন্দবাবু এই সংসারের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আমাদের হাত ধরে' এক অপূর্ব রহস্যলোকে নিয়ে যান ;—সে মায়াপুরী হয়-তো আমরা কোনোদিন

মনে রেখে থাকবো।...[সেইজন্যেই] আমি বলেছিলাম যে ওঁর কবিতায় "renascence of wonder" ঘটেছে। • • •

[ওঁর] ছন্দ অপরূপ হ'লেও "বলাকা"র ছন্দের সঙ্গে এর পার্থক্য আগেই ধরা পড়ে ;—"বলাকা"র চঞ্চলতা, উদ্দাম জলস্রোতের মত তোড় এর নেই ;—এ যেন উপলাহত বহুর স্রোতস্বিনী—থেমে-থেমে, অজস্র ভ্যালও কথার বাঁধে ঠেকে-ঠেকে উদাস, অলস গতিতে ব'য়ে চলেছে। এর প্রচুর উৎসাহের আভা নেই, আছে একটি মধুর অবসাদের শ্লান্তি। এই সুর যেন বহুদূর থেকে আমাদের কানে ভেসে আসছে। • • •

জীবনানন্দবাবুর...বহু কবিতায়...পরমবিস্ময়কর কল্পচিত্র পাওয়া যায়, সেই ছবিগুলো সব ধূসর রঙে আঁকা, ওঁর কবিতায় ।০০০ আপাপোড়া subdued।...দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ক'টি লাইন নেয়া যাক—

আমার এ গান
তোমোধিন শুনিবে না তুমি এসে,—
আজ রাতে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—
শুধু তবু ঘাস আসে।
ডাকবার ভাষা
শুধু খুঁজি যা আমি,—
শুধু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে।
পৃথিবীর ঘাসে
মানুষের কাছে
শুধু যাই যাব।
তোমোধিন শুনিবে না তুমি তাহা,—আমি আমি—
আজ রাতে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে
শুধু তবু ঘাস আসে।

এখানে যেন কথা শেষ হ'য়েও শেষ হয় নি ;—সব কথা ফুরিয়ে গেলেও তা'র বিষণ্ণ সুরটি পাঠকের মনকে যেন haunt করতে থাকে। একটি বা কয়েকটি লাইন পুনরাবৃত্তি করায়...ফলে গোটা কবিতাটি যেন চট করে থেমে যায় না, মনকের পাখার মত গুঞ্জন করে ভেসে যায়।

('প্রগতি'—আশ্বিন, ১৩৫৪, সম্পাদকীয় মন্তব্য)

অনিল। • • • আজকালকার একটি কবির লেখা পড়ে' আমার আশা হচ্ছে, আর বেশি দেরি নেই, হাওয়া বদলে আসছে।

সুরেশ। কে তিনি?

অনিল। জীবনানন্দ দাশ।

সুরেশ। জীবানন্দ দাশ? কখনো নাম শুনি নি তো!

অনিল। জীবানন্দ নয়, জীবনানন্দ। নামটা অনেককেই ভুল উচ্চারণ করতে শুনি। ওঁর নাম না শোনবারই কথা! কিন্তু তিনি যে একজন খাঁটি কবি তা'র প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাকে ওঁর একটি লাইন বলছি—'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে।'·· আকাশের অন্তহীন নীলিমার দিগন্ত-বিস্তৃত প্রসারের ছবিকে একটি মাত্র লাইনে ওঁরা হয়েছে—একেই বলে magic line। আকাশ কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার জন্যই ছবিটি একেবারে স্পষ্ট, সজীব হ'য়ে উঠেছে; শব্দের মূল্য বোধের এমন পরিচয় খুব কম বাঙালী কবিই দিয়েছেন।

সুরেশ। (অবিশ্বাসের) লাইনটি ভালো বটে।

অনিল। এই কবি···উচ্চচর ভাষা অবলম্বন করে আমাদের নমস্যাহতাজন হয়েছেন। আজকালকার কবিদের মধ্যে ওঁর ভাষা সব চেয়ে স্বাভাবিক। সহজ, নিরলঙ্কার, ঘরোয়া ভাষার একটা। উৎকৃষ্ট উদাহরণ শুনবে? তুমি যদি অনুমতি করো, প্রবর্তি থেকে জীবনানন্দর একটি কবিতার খানিকটা পড়ে' শোনাই।

সুরেশ। শুনি?

অনিল। (পড়িল)।

তুমি এই ভাদ্রের বাতাস,
বাতাসের নিম্নু—ঢেউ,
তোমার নতুন ঢেউ
নাই আর।
অন্তকার—নিরাকার
আকাশে
তুমি আলো আনো
নতুনের ভাষা;
কবিরে পিপাসা
দেছ আজো।
ধৌয়া দেখে—বাহিত মনের বায়ে
তরিতেছ আলোর নতুন,

রাতের বাতাস তুমি—বাতাসের সিন্ধু—কেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।

এই passageটির একমাত্র weak point হচ্ছে কবির কথাটা। তা ছাড়া, একেবারে নিখুঁত। এতে melody না থাক, music আছে—একটা ক্লান্ত উদাস সুরের meandering। থেমে-থেমে পড়তে হয়—তবে দুটি কানে ধরা পড়বে। যেমন—'রাতের, বাতাস তুমি। বাতাসের, সিন্ধু, কেউ। তোমার, মতন কেউ। নাই আর?'

সুরেশ। তা তো বুঝলাম, কিন্তু 'ছেঁড়া দেহ'।

অনিল। ঠিকই—দেহ কথাটা এখানে গদ্যগন্ধ হয়নি।...শরীর কথাটাকে তো তিনিই [জীবনানন্দ] আগে তুলে' দিয়েছেন। তবে দেহ কথাটাও তো কেবলমাত্র অভিধানগত নয়।

সুরেশ। দেহ সম্বন্ধে আপত্তি করবার কিছুই ছিলো না, কিন্তু ছেঁড়া!

অনিল।...ছিন্ন না বললে মানে বোঝো না বুঝি?

সুরেশ।...ছেঁড়া শুনলেই হাসি পায়।

অনিল। অভ্যাসে। সয়ে' গেলেই এর সৌন্দর্য্য ধরা পড়বে। জানো, একদিনে আমাদের এ-কথাটা উপলব্ধি করা উচিত যে সংস্কৃত আর বাঙলা এক ভাষা নয়, সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার নাড়ির যোগ বহুকাল ছিঁড়ে গেছে। বাঙলা এখন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সাবালক ভাষা—তা'র ব্যাকরণ, তা'র বিধি-বিধান, তা'র spirit সংস্কৃত থেকে আলাদা।...অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয়, বাঙলা কবিতা এখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত কথাগুলোর প্রতিই পক্ষপাত দেখাচ্ছে, সংস্কৃত conventionগুলো এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের কবিতায় এখনো দুঃখীরা বাতায়ন-পাশে দাঁড়িয়ে কেশ আলুলিত ক'রে রেখে, মুহূর্মুহু মুখ দেখে, চরণ অলক্তক-রঞ্জিত করে, শুভ্র ও শীতল শয্যায় শোয়। আমাদের নায়িকাদের এখনো হস্তে লীলাকমলমঞ্জরী বাল-কুন্দানুবিদ্ধ ইত্যাদি, যদিও ও-সব ফ্যাশান কেশ থেকে বহুকাল উঠে গেছে। সংস্কৃতের দুয়ারে এই কাঙালপনা করে' আর কতকাল আমরা মাতৃভাষাকে ছোট করে' রাখবো? আমাদের কুল জীবনানন্দ মাপ বুঝতে পেরেছেন বলে' মনে হয়; ভাষাকে যথাসম্ভব খাঁটি বাঙলা করে' তোলবার চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। তিনি সাহস করে' লিখেছেন:

সেই অল-মেয়েলের ঘর
ঠাণ্ডা—শাদা—বরফের মূর্তির মতন।

ভনে তোমাকে—শুধু তোমাকে কেন? অনেকেরই—হাসি পাবে, বলবে—'ঠাণ্ডা—শাদা—এ আবার কী?' কিন্তু ঐ শব্দ দুটো মনে লিখতে পারি, মুখে বলতে পারি—আর কবিতাতেই লিখতে পারবো না? কেন কবিতায় আমাদের আঁধার বলবো না, বিছানাকে বিছানা?...যত কথা আমাদের মুখের ভাষার স্থান পেয়েছে...কাব্যসমাজ থেকে তাদের একঘরে করে' রেখে কেন আমরা আমাদের কবিতাকে এক বিপুল শব্দ-সম্ভার থেকে বঞ্চিত করবো? মৌখিক ভাষার ইডিয়মগুলো ব্যবহার করে' কবিতাকে স্বাভাবিক ও সহজ করে' তুলবো না কেন?...আমি তো বলি, অদূরকাল ভাষা, জীবনানন্দর কবিতার ভাষা purest বাঙলা, কারণ তা বাঙলা ছাড়া আর কিছু নয়।

('প্রগতি' - ভাদ্র, ১৩৫৬, 'বাঙলা কাব্যের ভবিষ্যৎ')

ইচ্ছে ক'রেই উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ করলাম, সেই সচেতন সাহিত্যিক আবহাওয়ার কিছু আভাস দেবার জন্য। আজকের দিনের পাঠক নিশ্চয়ই এ-কথা ভেবে অবাক হচ্ছেন যে কবিতায় 'ঠাণ্ডা' বা 'শাদা' কথাটার ব্যবহারের সমর্থনের জন্য এতগুলো বাক্যব্যয় করার প্রয়োজন হ'তে পারে, কিন্তু এ-কথা সত্য যে গম্ভীর ভাবের কবিতায় দেশজ ও বিদেশী শব্দের এমন স্বচ্ছন্দ, সংগত ও প্রচুর ব্যবহার জীবনানন্দর আগে অন্য কোনো বাঙালি কবি করেননি। মনে পড়ছে 'পাখিরা' কবিতা প্রথম পাঠেই আমাদের পক্ষে রোমাঞ্চকর হয়েছিলো 'হাইলাইটে'র জন্য, 'প্রথম ডিমে'র জন্য, 'জলরেখার মতন' ছোটো বুকের জন্য, আর সেখানে 'লক্ষ লক্ষ আইল ঘুরে সমুদ্রের মুখে' মৃত্যু ছিলো ব'লে। ওটা যে ঐতিহ্যিক চমক-লাগানো ব্যাপার নয়, সপ্রাণ এবং সচেতন নূতনত্ব, এতদিনে সেটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হ'য়ে গেছে। এমনকি, মৌখিক ভাষার প্রচলিত তৎসম শব্দেরও ব্যবহারজাত মালিন্য ঘুচিয়ে তাকে কাব্যের আসনে তিনি এনেছিলেন। 'তোমার শরীর—তাই

নিয়ে এসেছিলে একদিন', এই পংক্তিটি প'ড়ে আমি 'শরীর' কথাটাকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করেছিলাম। তার আগে নায়িকাদের কোনো 'শরীরে'র অস্তিত্ব আমরা তখনি, শুনেছি 'দেহ', 'দেহলতা', 'তনুলতা', 'দেহযষ্টী'। এই উদাহরণ আমাদেরও রচনায় সাহস যুগিয়ে দিয়েছিলো।

৩

কবে কোথায় জীবনানন্দকে প্রথম দেখেছিলাম মনে পড়ছে না। পাঁচ মিনিট দূরে থেকেও 'কল্লোলে'-আপিসে তিনি আসতেন না, কিংবা কখনো আসতেন; অন্তত আমি তাঁকে কখনো সেখানে দেখিনি। স্বাধীনতা রোডে তাঁর বোর্ডিঙের ভেতলা কিংবা চারতলায় অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে একবার আরোহণ করেছিলাম মনে পড়ে, আর একবার কলেজ স্ট্রীটের ফিরের মধ্যে আমরা কয়েকজন তাঁকে অনুসরণ করতে-করতে বৌবাজারের মোড়ের কাছে এসে প'ড়ে ফেলেছিলাম। কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় এলেন একবার, মেঘলা দিনে মাঠের পথে খুলনায় তাঁর সঙ্গে; পরে, তাঁর বিবাহের অনুষ্ঠানে, ঢাকার মাল্য সমাজে উপস্থিত আছি অজিত, আমি, অন্যান্য বন্ধুরা। কলকাতায় চ'লে আসার পর গ্রহেশ মিত্র রোডের একতলা ঠাণ্ডা ঘরে তাঁর সঙ্গে ব'সে আছি, শীতকাল, বিকেল হ'য়ে এলো। হঠাৎ বেয়ারা-বেঁধিল ন'ড়ে উঠলো, আমরা বাইরে ছোট্ট বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে বসলাম আবার। পরের দিন কাগজে পড়লাম উত্তর বিহারে ভূমিকম্পের খবর।

কিন্তু এই সবই বাপসা স্মৃতি, এদের মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতাও নেই। আসলে, জীবনানন্দর স্বভাবে একটি দুরধিক্রম্য দূরত্ব ছিলো—যে-অতিলৌকিক আবহাওয়া তাঁর কবিতায়, তা-ই যেন মানুষটিকেও ঘিরে থাকতো। সব সময়—তার ব্যবধান অতিক্রম করতে ব্যক্তিগত জীবনে আমি পারিনি, সমধর্মায়িক অন্য কোনো সাহিত্যিকও না। এই দূরত্ব তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন; দিন বা চার বছর আগে সন্ধ্যেবেলা লেকের দিকে তাঁকে বেড়াতে দেখতাম—আমি হয়তো পিছনে চলেছি, এগিয়ে গিয়ে কথা বললে তিনি

খুশিও হতেন, অপ্রস্তুতও হতেন, আলাপ জমতো না ; তাই আমার দেখতে পেলে আমি ইচ্ছে ক'রে পেরিয়েও গেছি কখনো-কখনো, তাঁর নির্জনতা ব্যাহত করিনি। কখনো এলে বেশিক্ষণ বসতেন না, আর চিঠিপত্রেও তাঁর সেই রকম স্বভাব সংকোচ। অথচ, সেই 'প্রগতি'র সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সাহিত্যিক বন্ধুতা ও সাযুজ্য ছিলো বিরামহীন ; দেখাশোনার যেটুকু হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি গভীর ক'রে তাঁকে পেয়েছি তাঁর রচনার মধ্যে—যার অনেকটা অংশের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রকাশের পূর্বেই ঘ'টে গেছে। এই সমস্ত পঁচিশ বছরের মধ্যে শিথিল হয়নি ; 'কবিতা' প্রকাশের অন্যতম পুলকাগ ছিলো আমার পক্ষে একসঙ্গে তিনটি-চারটি ক'রে পাঠানো তাঁর নতুন কবিতা পড়া ; আনন্দ পেয়েছি 'দূরের পাণ্ডুলিপি'র প্রুফ দেখে, 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় 'যমলতা সেন' প্রকাশে তাঁর সম্মতি পেয়ে, তাঁর বিষয়ে লিখে, কথা ব'লে, তাঁকে আবৃত্তি ক'রে। বাংলা কবিতার যতগুলো পংক্তি বা স্তবক আমার বিদ্যমান বিস্মরণশক্তি এখনো হারিয়ে ফেলেনি, কিংবা পরিবেশমার কড়ি বর্জন করেনি, যেগুলোকে আমি বহু বছর ধ'রে অনেকটা হকাকেবচের মতো মনে-মনে বহন ক'রে আসছি, তার মধ্যে জীবনানন্দর পংক্তির সংখ্যা অনেক। সেই সব কবিতা বেঁচে আছে আমার মনে, আর অনেক পাঠকেরও মনে—তারা কালেও বেঁচে থাকবে ; তবু আজ এই কথা ভেবেই দুঃখ করি যে আমার পক্ষে স্বপরিচিত সেই মানুষটিকে আর চোখে দেখবো না—কখনোই না।

৪

জীবনানন্দর কবিতা নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু-কিছু আলোচনা আমি করেছি, আজ আবার প'ড়ে আরো কিছু নতুন কথা আমার মনে হচ্ছে। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ইন্দ্রিয়বোধের আনুগত্যে তিনি অতুলনীয়, রূপদক্ষতাই তাঁর চরিত্রলক্ষণ—আর এ-সব কথা পাঠকমহলে যেরকম আলোচিত হ'য়ে গেছে এতদিনে। কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়, যারা যেন পরস্পরকে পরিপূরণ ক'রে চলেছে। একদিকে আমরা দেখতে

প্রায় যে-সব কবিতা বিশুদ্ধ বর্ণনার, অথবা মূর্তিচারণের, অনুভবময়, নস্টালজিয়ায় পরাক্রান্ত : যেমন 'মৃত্যুর আগে', 'অবসরের গান', 'হাওয়ার রাত', 'ঘাস', 'বনলতা সেন', 'বহু নির্জন রাত্রি'—পাঠক আরো অনেক তুলে নিতে পারবেন—আমি 'নির্জন স্বাক্ষর' বা '১৩৩৩' ধরনের চেহারার কবিতাকেও এরই অন্তর্গত করতে চাই। আর দ্বিতীয় আছে যে-সব কবিতা মরমরতী শহরের অথবা দেবতার পরাহর্ষে লেখা, যেখানে লেখক বর্ণনার দ্বারা কিছু বলতেও চেয়েছেন, যেখানে কবির আবেগ বাইরের জগতে প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছে, চিন্তার সঙ্গে গ্রথিত হ'য়ে আরো নিবিড়ভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ করবো 'বোধ', 'অ্যাম্পে', আর সেই লাল-কাটা ঘরের আশ্চর্য কবিতাটি, যার নাম দেয়া হয়েছিলো 'আট বছর আগের একদিন'। 'কয়েকটি লাইন'কে বলা যায় 'বোধে'র সহী-কবিতা—দুটি কবির স্বগতোক্তি—প্রথমটিতে কবি নিজের শক্তির বিষয়ে সচেতন হ'য়ে ঘোষণা করছেন তাঁর নূতনত্ব ('কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক যাদু,—আমি ব'য়ে আনি'), ব'লে দিচ্ছেন তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য কোনখানে ('উৎসবের কথা আমি কহি নাকো', পড়ি নাকো' দুর্ধপায় গান···শুনি শুধু সত্তার আহ্বান'), আর দ্বিতীয়টিতে জীবনের সঙ্গে কাব্যের যথে পীড়িত তিনি, তাঁর 'বোধ' আর-কিছু নয়, তাঁরই কবিপ্রতিভা, যার তাড়নায় 'সকল লোকের মাঝে ব'সে আমার নিজের মুহূর্তগুলো আমি একা হয়েছি আলাদা'। আবার, তাঁর আবেগচালিত বেদনাময় বর্ণনার কাব্যেও বিভিন্ন বিভাগ করা যায় : প্রথমত, সাদ্য বা বৈশ কবিতা, যা যে-কবিতার সকল সময়কেই সন্ধ্যার মতো মনে হয়, যেখানে আলো ম্লান, ছায়া ঘন, ফুরাণার পরবা ঝুলে আছে ('মাঠের গল্প', 'হায়, চিল', 'বনলতা সেন', 'দুটি বহুর পরে', 'সন্ধ্যমালা'), দ্বিতীয়ত, আলো যেখানে উজ্জ্বল আর প্রবল অবয়ব নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ('অবসরের গান', 'ঘাস', 'শিকার', 'সিন্ধু-সারস'), আর তৃতীয়ত, যে-সব কবিতায় একাধারে স্থান পেয়েছে আলো আর অন্ধকার, রোদ আর ছায়া, কান্তি আর অবগুণ্ঠন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিকে আমি ফেলতে চাই না, কেননা বাংলার পল্লীপ্রকৃতির এই চিত্রশালাটিতে 'হিজলের ছায়াঘেরা

আলো আর বুলবুলি'কে যদিও এবারে দেখা যায়, আর 'খাদের গুজবের মতো সমুদ্র সহজ' তোরবেলাটিকেও চিনতে পারি, তবু এর পক্ষপাত নৈশতার দিকেই, পড়তে-পড়তে আমাদের মন বারে-বারেই ছায়াচ্ছন্ন গাঢ়তার মধ্যে হ'য়ে আসে। আমি ভাবছিলাম 'হাওয়ার রাত' বা 'অন্ধকার'-এর মতো কবিতার কথা, যেখানে তারা-ভরা অন্ধকারের কথা বলতে-বলতে কবির মধ্যে 'মিসতস্রাবিত বনীথান রৌদ্রের আস্রাণে' ভ'রে যায়, যেখানে 'অন্ধকারের সায়াৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে' কবি হঠাৎ 'তোরের আলোর পূর্ব উল্লাসে' জেগে ওঠেন, দেখতে পান 'রক্তিম আকাশে সূর্য' আর 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী'। ভাবছিলাম 'মৃত নির্জন হাতে'র বিস্ময়কর গঠনের কথা—কবিতাটির আদ্যন্ত অন্ধকারে, তার পটভূমিকাই কালনের অন্ধকার, অথচ দেহের মাংসে 'রক্তাক্ত রৌদ্রের বিচ্ছুরিত বেদ' আর 'রক্তিম সেলাসে তরঙ্গিত মন' আমাদের মনে এমন একটি প্রবীণ সমৃদ্ধির অভিঘাত রেখে যায় যে মনেই হয় না পুরো কবিতাটিতে আলো ছাড়া, উজ্জ্বলতা ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গ আছে। যেমন 'হায়, চিলে' বুলবুলেলাকেই সন্ধ্যা নেমে আসে, তেমনি 'হাওয়ার হাতে' অন্ধকারটাই আলোর উল্লাসে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো—'মৃত্যুর আগে'র ছবিগুলোর মতো এ-সব ছবি অপ্রস্তুত নয়, তারা কবির ভাবনা-বেদনারই প্রতিফলন।

৫

আলোচনার আরো অনেক ক্ষেত্র আছে। দেখানো যেতে পারে, বিষ্ণুর শক্তি তাঁর হাতে কী-রকম আস্থার আর গভীর হ'য়ে উঠেছিলো 'সোনার সিঙ্গল মূর্তি' অথবা 'অজয়, অক্লান্ত অধ্যাপকে'র উদ্দেশে লেখা পংক্তিগুলিতে, কিংবা কেমন ক'রে আলোছায়ার দ্যুতমান জগৎ থেকে তিনি অন্তর্লোচর অভিঘাতদের মায়ালোকে প্রবেশ করছিলেন 'বিড়াল', 'মোক্ষ', 'সেই সব সেয়ানে'রা ধরনের কবিতায়। শেলি, কীটস, পূর্ব-ইএটস আর কোথাও-কোথাও হুইটম্যানকে তিনি কেমন ক'রে ব্যবহার করেছিলেন তা তুলনায় যায়া দেখানো যেতে পারে; সহজেই প্রমাণ করা যায় যে ইএটস-এর

'O corleen'-র তুলনায় ওঁর 'হায়, চিল' অনেক বেশি তৃপ্তিকর কবিতা, আর 'ওল্ড ট্রি এ মাইটেথেলে'-র কোনো-কোনো পংক্তি 'অবসরের গানে' বাংলার মাটিতে নতুন শস্য হ'য়ে ফ'লে উঠেছে। যদি কখনো কোনো পাঠক জীবনানন্দর অসংবদ্ধ, অ-মানবিক জগতে শ্রান্তি বোধ করেন, তাঁকে অনুরোধ করা যায় 'ক্যাম্পে' আর 'আট বছর আগের একদিন' পুনর্বার পড়তে—জীবনানন্দর সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই দুটি কবিতা সবচেয়ে প্রাণবন্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, এখানে তিনি মানুষের ঘুম আর জাগরণকে একই রকম 'সহজ'ভাবে মেনে নিয়ে তৃপ্ত হননি ('জানিবার কাল আছে—দরকার আছে ঘুমাবার।—এই সহজতা আমাদের'), নিজের কথা নিজে সহজ ক'রে উৎসবের কথা বলেছেন, ব্যর্থতার গানও গেয়েছেন। 'ক্যাম্পে' কবিতার মৃগয়ার গল্প অবলম্বন ক'রে 'প্রেমের তথাগত গভীর স্বপ্ন' ফুটেছেন তিনি, মানবিক প্রেমের, যৌন প্রেমের, যা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে 'কোথাও কস্তুরে কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে', যার ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী মাংসাশী শিকারিদেরও হৃদয়গুলো 'ধানের জ্যোৎস্নায় মৃত মৃগদের' মতোই পাংশু হ'য়ে প'ড়ে থাকে। আর, 'মৃত্যুকে ধ্বনিত ক'রে' 'জীবনের গভীর জল' তিনি প্রকাশ করেছেন 'আট বছর আগের একদিন'-এ। এই কবিতাটি এতই ছোটোনাগর যে এটিকে ওঁরে-ওঁরে খুলে দেখানে আলোচনার সহায়তা হ'তে পারে। এর আরম্ভ—'পোনা গেল লাসকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে'। ক্রমশ আমরা জানতে পারলাম যে কোনো-এক পুরুষ উৎসবে আত্মহত্যা করেছে—আর এই খবরটি শুনেই কবি অনুভব করলেন—মৃত্যুকে নয়, ওঁর চারদিকে চাঁদ-ডুবে-যাওয়া অন্ধকারে 'জীবনের গভীর নীল মত্ততা'কে :

> তবুও তো পৌষ আসে।
> ধলিত ধরির ঘ্রাণ আনে দুই মুহূর্তের তিল মাসে
> আমেজটি এড়াবের ইসারায়—অঘ্রানের চৈত অনুরাগে।
>
> চৈত গায় ধূসরাণী আঁধারের গাঢ় মিতবেগে
> চারিদিকে মশারির কবাটীর বিরহতা।
> মনা তার অবলার গজারের মেঘে থেকে জীবনের স্রোতে ভালবাসে

মনে পড়লো বাঁচার ইচ্ছায়, বাঁচার চেষ্টায় অন্যান্য উদাহরণ :

> মৃত ছেলে বলা থেকে কেন রৌদ্রে উড়ে যায় মাছি।
> সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত চীনের খেলা কত দেখিয়াছি।...
> মৃত শিশুর হাতে ক্রিকেটের বল শিহরণ
> জগতের সাথে লড়িয়াছে :—

কিন্তু এই প্রাকৃত প্রেরণা মানুষের পক্ষে তো সর্বস্ব নয় :

> চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রভাত খুঁজেছে খুশি অবসের তারে
> এক গাছা চুড়ি হাতে ফিরেছিলে তবু একা একা :
> যে-জীবন ক্রিকেট, ফোরেলেস—মানুষের সাথে তার হয় নাকি দেখা
> এই দেশে।

হয়তো গানের তালে প্রতিবাদ করেছিলো, কিন্তু ক'রে বাঁধা দিয়েছিলো জোনাকিরা, খুংখুংয়ে মন্ত পেঁড়া ইঁদুর ধরার প্রস্তাব এনে জীবনের 'তুচ্ছ গার্হস্থ্য সমাচার' জানিয়েছিলো—কিন্তু চেতনার সংকল্পে প্রকৃতি বাধা দিতে পারলো না।

এর পর অনিবার্য প্রশ্ন : কেন মরলো মেয়েটা? কোন দুঃখে? কিসের ব্যর্থতায়? না—কোনো দুঃখই ছিলো না; স্বামী ছিলো, সন্তান ছিলো, প্রেম ছিলো, দারিদ্র্যের গ্লানিও ছিলো না। কিন্তু—

> আমি—শুধু আমি
> নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—সব সমধামি :
> অর্থ নয়, কীর্তি নয়—মহত্ত্বতা নয়—
> আরো এক বিপুল বিস্ময়
> আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
> খেলা করে।
> আমাদের ক্লান্ত করে,
> ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;
> লালকাটা ঘরে
> সেই ক্লান্তি নাই।
> তাই...

যদি এই অতিরিক্ত জীবন-লাভিতেই কবিতার শেষ হ'তো, তাহ'লে এটি হ'তো পরাজয়ের কবিতা, আর সেইজন্য নরকীয়। কিন্তু ঠিক শেষের ক-লাইনেই আবার আমরা আমার ঘর শুনলাম—যেন একটি ঢেউ স'রে যেতে-যেতে ঝিনুক ফেলে দিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো—কবি ফিরিয়ে আনলেন অবাস্তবীর পাঁচাচাটাকে, যে আত্মহত্যায় বাধা দিতে পারেনি, কিন্তু জীবিতের কানে অবিরাম ব'লে যাচ্ছে তার প্রাণসত্তার আদিম আনন্দ। আর এই প্রগাঢ় পিতামহীর দৃষ্টান্তেই কবি উদ্বুদ্ধ হলেন—'আমরা দুজনে মিলে ঘুরে ঘুরে চ'লে যাব জীবনের প্রচুর আঁধার'—মৃত্যু পায় হ'য়ে বেঁচে উঠলো জীবনের অমরনি।

৬

তাঁর উপমা, বিশেষণ, ভাষাপ্রয়োগ নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হ'তে পারে। যেহেতু তিনি মুখ্যত ইন্দ্রিয়বোধের কবি, তাই উপমা তাঁর পক্ষে একটি প্রধান উপাদান, তাঁর হাতে বিশেষণও অনেক সময় উপমার মতো। কবিতা। 'শিকার' কবিতার বত্রিশটি পংক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে চোদ্দটি উপমা, 'মতো' শব্দের যেখানে যার ব্যবহার, 'চাওয়ার মতো' 'মতো'-র সংখ্যা আট। এতে যাঁরা আপত্তি করেন তাঁরা ভেবে দেখবেন চিত্র বস্তুর সঙ্গে তুলনা বা সাদৃশ্যকল্পে ছাড়া বর্ণনার কোনো উপায় আছে কিনা, যে-কোনো কবিতায় বহুখানি ছবি থাকে, আর কবি যদি জ্ঞানের ভাষায় কথা বলতে চান তাহ'লে তিনি কবি থাকেন আর কতটুকু। আরো দুটি কথা বিবেচ্য : জীবনানন্দ একটিও উপমা প্রয়োগ না-ক'রে 'আকাশলীনা' ('সুরঞ্জনা, এখানে যেয়ো নাকো তুমি') বা 'সমাকৃত' ('বরং নিজেই তুমি দেখ নাকো একটি কবিতা')-র মতো অজস্র কবিতা লিখেছেন ; আর, তাঁর অনেক উপমাই সরল বা আক্ষরিক নয়, তা থেকে নানা স্তরে নানান ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে, যেমন গানের পরে গানের অনুরণন। কাস্তের মতো চাঁদ, তরবারের ফলের মতো বুক, বল্লমের মুখির মতো তারা—এই সব উপমার উপর আমি জোর দেবো না, কেননা এদের নির্ভর শুধু চোখে-দেখা হাতে-ছোঁয়া সাদৃশ্যের উপর, তাঁর আগে অন্য কেউ ব্যবহার করেননি ব'লেই এরা স্মরণীয়। আমি উল্লেখ করবো আরো আগেকার লেখা একটি পংক্তি—

আঁখি যায় সোদুলির মতো সোনালি, রঙিন—

পড়ামাত্রই আমাদের মনে যে-নূতনত্বের চমক লাগে সেটা অতিক্রম ক'রে উঠে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে ঠিক লাল রঙের চোখটাকে বোঝানো হচ্ছে না, সন্ধ্যারাগের মদির আবেশের দিকেই এর লক্ষ্য, আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে প'ড়ে যায় সোদুলির সঙ্গে বিবাহ-লগ্নের সংযোগ। 'মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন'—এটা হ'লো চাক্ষুষ উপমা, কিন্তু সেই আগুনই যখন সূর্যের আলোয় 'রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো' হ'য়ে যায়, তখন শুধু ফ্যাকাশে চেহারাটাই আমরা চোখে দেখি না, মনের মধ্যেও নিরাশ্রয়ের বেদনা অনুভব করি। কী উপমায়, কী বিশেষণে, একটি ইন্দ্রিয়ে আঘাত দিয়ে অন্য ইন্দ্রিয় জাগিয়ে তোলেন তিনি—'ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো পানে' করতে হ'লে বর্ষা, গন্ধ আর আস্বাদকে পরস্পরের মধ্যে মিশিয়ে দিতে হয়; 'হলদেটে রৌদ্র' বললে রোদ যেন আতপ পেয়ে জড়ো হ'য়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, আবার সেই রোদকেই 'কচি লেবুপাতার মতো' নরম আর সবুজ বললে তাকে দেখা যায় তখনো-শিশির-শুকিয়ে-না-যাওয়া মাটির উপর ঘুমন্ত হ'য়ে শুয়ে থাকতে। এরই পাশে-পাশে 'পরদার গায়িকার রক্তাভ রৌদ্রের ঢেউ' আর সন্ধ্যাবেলায় 'আকাশে রক্তের সূর্যের নরম শরীর' চিন্তা করলে রোদ বস্তুটাকে আমরা যেন কোনো দার্শনিকের মতো প্রদক্ষিণ ক'রে-ক'রে দেখে নিতে পারি। তেমনি, রাত্রি কখনো 'বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে', কখনো 'জ্যোৎস্নার উঠানে ঘরের চালের ছায়াটুকুর মধ্যে শুভ্র ও নিভৃত', কখনো 'নক্ষত্রের ছত্রাকি আগুনে' উজ্জ্বল, আর কখনো দেখি সন্ধ্যার অন্ধকার 'ছোটো-ছোটো ঘরের মতো' পৃথিবীর মধ্যে ঢুকিয়ে পড়লো। যে-দুটো বস্তু স্বভাবতই খুব কাছাকাছি তাদের মধ্যে উপমাদ্বন্দ্ব অপ্রচলিত, কিন্তু জীবনানন্দ কখনো-কখনো তাদেরই একত্র ক'রে দুটোকেই আরো স্পষ্ট ক'রে ফোটাতে পেরেছেন ('কাঁচা বাতাবির মতো ঘাস', 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা'; আবার, যে-দুটো বস্তু অপরিমেয়রূপে অ-সদৃশ, তাদেরও একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে তাঁর বিরাট কল্পনাশক্তি, যার ফলে আমরা পেয়েছি 'চীনেবাদামের মতো বিস্তৃত আকাশ', 'পাখির নীড়ের মতো' বনলতা

সেনের চোখ, আর আকবরাটীর জানলার ধারে 'অদ্ভুত আঁধারে উটের গ্রীবার মতো কোনো এক' প্রবল নিস্তব্ধতা। এ-সব উপমা ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম ক'রে ভাবনার মধ্যে আন্দোলন তোলে, সাদৃশ্যের সূত্রগুলি ছড়িয়ে পড়ে অনুভূতির গহনালোকে। বৌবাজারের বৈদ্য মুটপাতে, যেখানে মুর্গিওলা, 'লোল নিগ্রো' আর 'হিমহাম কিরিকি বুকে'র হাতছেঁড়ির উপর ইহুদি গণিকার আধো-জাগা গানের গলা ক'রে পড়ছে, সেখানকার বাতাস নেহাৎই বৈজ্ঞানিক অর্থে শুকনো নয়, মৃতকালীন বিশৃঙ্খলার চাপে দেশের মধ্যে সমস্ত রস শুকিয়ে গিয়ে চিনেবাদামের খোলার মতো শূন্য আর ভঙ্গুর হ'য়ে উঠলো, এই রকম একটা আভাস এখানে পাওয়া যায়। কোনো মহিলার চোখের আকার নিশ্চয়ই পাখির বাসার মতো হয় না, কিন্তু ক্লান্ত প্রাণের পক্ষে তখনো কোনো চোখ আশ্রয়ের নীড় হ'তে পারে। যে-মানুষ আপন হাতে মরতে চলেছে তার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলো 'উটের গ্রীবার মতো' নিস্তব্ধতা, এই অপরিচিত, অপ্রত্যাশিত ছবিতে আমার আত্মঘাতের আবহাওয়াটা আরো ঘনঘনে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। হয়তো এখানে আরো কিছু ইঙ্গিত আছে, এই 'উট' যেহেতু মৃত্যুর দিকেই প্রসৃত হচ্ছে, তাই মনে হয় উপমাটি বাইবেলের সেই গল্প থেকে আহৃত, যেখানে উট এসে প্রথমে শুধু মাড়টুকু ঢোকার অনুমতি চাইলো, তারপর প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে সমস্ত ঘর জুড়ে গৃহস্বামীকেই বহিষ্কৃত ক'রে দিলো। অনেক বিশ্লেষণও এই রকমই মনস্তত্ত্বঘটিত : আত্মহত্যার উদ্যোগের সময় অন্ধকার 'প্রখর আঁধার', জীবনপ্রেমিক মনক-দের সমাকীর্ণ 'মুখচারী আঁধার', শিকারের পরে শিকারিদের 'নিয়পরাধ' ঘুম, 'প্রগাঢ় পিতামহী প্যাচা'র প্রীতিসম্ভাষণ 'ঘুমুন, গাঢ় সমাচার'।

'সমাচার' কথাটাও লক্ষণীয়। শুধু বিশেষণে নয়, বিশেষ্যপদেও, আর সাধারণভাবে ভাষাব্যবহারে তাঁর দুঃসাহসী আক্রমণ বারে-বারেই নতুন ছিনিয়ে এনেছে। বিদেশী শব্দ, পেঁয়ো শব্দ, কথ্য বুলি, অপ্রচলিত শব্দ, আর যে-সব শব্দকে আমাদীয়রূপে গণ্য ব'লে আমরা মেনেছি—এই সব ভাণ্ডারের উপর সমান অধিকার তাঁর কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ। ছন্দব্যবহারে বৈচিত্র্য নেই, আপাতরমণীয়তাও নেই, কিন্তু নেই ব'লে কোনো অভাববোধও নেই আমাদের;

না আছে, তার সংযোজন এত ব্যাপক যে তিনি আজকের বিশ্বেও অনায়াসে এবং অনাক্রমণীয়ভাবে 'ছিল-সেখিল' মিল দিতে পেরেছেন, যা অন্য কোনো কবির পক্ষে সম্ভবই হ'তো না। ওঁর কাব্যের পাঠক শুধু বিশেষণের প্রভাবে আবিষ্ট হবেন বার-বার, বিহ্বলিত হবেন পুনরুক্তির আঘাতে ('এইখানে সন্তোজিনী শুয়ে আছে,—আমি নামে শুয়ে আছে বিনা'; 'বাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সমুদ্র বাতাস অথবা সমুদ্র বৃষ্টি ঝরে'), মুগ্ধ হবেন যখন হঠাৎ এক-একটি অত্যন্ত চেনা আর গতধর্মী কথার প্রভাবে সমস্ত পংক্তি আলোময় হ'য়ে উঠবে।

তারি সেই মুখখানি দেখে নই—শুয়ে আছে নদীর এপারে
দিগন্তের দেহি যায়,—রূপ ক'রে পড়ে তার,—
চাঁদ এসে খই ক'রে দিয়ে যাবে তারে।

জীবনানন্দের অনুচ্চার্য একটি ক্রিয়াপদের জন্যই হেমন্ত ঋতুর এই ছবিটি এমন উজ্জ্বল হ'তে পারলো। তেমনি, বিকেলের আলোর স্বচ্ছ গভীরতায়, —শুধু বাইরের প্রকৃতি নয়, আমাদের হৃদয় মুহূর্ত ডুবে গেলো শুধু একটা 'মাইল' শব্দ আছে ব'লে—

অফুরন্ত অপূর্বিমল দিয়ি যদি আমো কেলে এত মাইল পাড়ি জমায়ো
হয়ে আছে।

দৃশ্যটিকে 'এত মাইলের' মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে ব'লেই এখানে অসীমের আভাস লাগলো।

উদাহরণ আর বাড়াতে চাই না, কিন্তু এটুকু না-বললে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হয় না যে ওঁর কাব্যে গদ্য ভাষা এমনভাবে নিবিষ্ট হয়েছিলো যে রীতিমতো বিপজ্জনক শব্দও ওঁর আবেশে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো কাজ ক'রে গেছে—

হয়তো কখন চাঁদ টুপ ক'রে ডুবে যাবে সে দিগন্তের জলে
শেষ ছিল, আশা ছিল, তবু সে বেলার
কোন দুঃখ?

বলা বাহুল্য, 'কৃত' বা 'ঠ্যাং'-এর মতো শব্দের ব্যবহার অন্য যে-কোনো কবির পক্ষে হাস্যকর হ'তো।

৭

এই অনন্যতা বিষয়ে তাঁর অনেক পাঠকই আজকের দিনে সচেতন, আর তিনি যে আমাদের 'নির্জনতম' কবি এই কথাটার অতাধিক পুনরুক্তিসত্ত্বেও এর যাথার্থ্যে আমি এখনো সন্দেহ করি না। 'আমার মতন কেউ নাই আর'—তাঁর এই স্বগতোক্তি প্রায় আক্ষরিক অর্থেই সত্য। যৌবনে, যখন মানুষের মন স্বচ্ছন্দেই সম্প্রদায় খোঁজে, আর কবির মন বিশ্বজীবনে যোগ দিতে চায়, সকলের সঙ্গে মিলতে চায় আর সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে, সেই নির্জনের স্বপ্নভঙ্গের অনুতাপেও তিনি বুঝেছেন যে তিনি স্বতন্ত্র, 'সকল লোকের চেয়ে আলাদা', বুঝেছেন যে তাঁর গান জীবনের 'উৎসবের' বা 'আর্থতার' নয়, অর্থাৎ বিক্ষোভের, আলোড়নের নয়—তাঁর গান সমর্পণের, আত্মসমর্পণের, প্রশান্তির। 'পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত' রোমান্টিক হ'লেও, তাই, তিনি ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকের উল্টো, আধুনিক কাব্যের বিচিত্র বিক্ষোভের মধ্যে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। বস্তুত, তাঁকে যেন বাংলা কাব্যের মধ্যে আকস্মিকরূপে উদ্ভূত ব'লে মনে হয়; সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের ক্ষণিক প্রভাবের কথা বাদ দিলে—তিনি যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত তাঁর পূর্বজ স্বদেশীয় সাহিত্যের কোনো অংশের দ্বারা কখনো সংক্রমিত হয়েছিলেন, বা কোনো পূর্বসূরীর সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ জন্মেছিলো, এমন কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই বললেই চলে। এ থেকে এমন কথাও মনে হ'তে পারে যে তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে একটি আশ্চর্য ঘটনার মতো উদ্ভূত; এবং বলা যেতে পারে যে তাঁর কাব্যরীতি—প্রমথ চৌধুরী বা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের মতো—একেবারেই তাঁর নিজস্ব ও ব্যক্তিগত, তাঁরই মধ্যে আবদ্ধ, অন্য লেখকের পক্ষে সেই রীতির অনুকরণ, অনুশীলন বা পরিবর্তন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই

যে চলতিকালের কাব্যরচনার ধারাকে তিনি গভীরভাবে স্পর্শ করেছেন, সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিদের উপর তাঁর প্রভাব কোথাও-কোথাও এমন সুস্পষ্টভাবে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে যে বাইরে থেকে হঠাৎ দেখে চেনাও যায় না। বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আসনটি ঠিক কোথায় সে-বিষয়ে এখনই মন্তব্য করা সঙ্গত নয়, তার কোনো প্রয়োজনও নেই এই মুহূর্তে। এই কাজের দায়িত্ব আমরা তুলে দিতে পারি আমাদের ভবিষ্যতের সেই সব নাবালকদের হাতে, যারা আজ প্রথম যার জীবনানন্দর স্বাতন্ত্র্যের আলো-অন্ধকারে অবগাহন করছে। আপাতত, আমাদের পক্ষে, এই কথাই চূড়ান্ত চিত্তে স্মরণীয় যে 'ঘুমের সঙ্কিত পশো'র 'অন্ধিসন্ধিতে' মনে দাঁড়িয়ে যিনি 'বেবলাক গাছে কিন্নরকণ্ঠ' শুনেছিলেন, তিনি এই উন্মোষ, বিমুগ্ধ যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ।

রবীন্দ্রোত্তর কোবিদ কবি

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

'ভরা পালে'র দিন থেকে সুরু করে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-সংকলনের কাল, সময়ের হিসেবে যেমন দীর্ঘ তেমনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পক্ষেও প্রশস্ত। জীবনানন্দ দাশ এই দীর্ঘবিস্তৃত কাব্য-অভিজ্ঞতা আহরণ ও পরিবেষণ করেছেন। এ-সময়টাতে শুধু এ-কাজে ব্রতী থাকা যে-চিত্তের প্রেরণায়, তাকে চিনতে পারাই সম্ভবত জীবনানন্দর বিশেষ চেতনার অবগাহন এবং অনুভবে তাঁর কাব্যাস্বাদ গ্রহণ।

লৌকিক অভিজ্ঞতা আর কবির অভিজ্ঞতা জ্ঞানের তারতম্যে আলাদা চেহারায় দেখা দেয়। জ্ঞানের স্বভাবই উৎক্রমণ ঘটানো। অজ্ঞানীর চাইতে জ্ঞানী বেশি উৎক্রান্ত, উৎসুক এবং মানসিক অবস্থায় উন্নত। এ একটা মোটা সত্য। কিন্তু জ্ঞানপাপীর দৃষ্টান্তও সমাজে বা সমাজের বৃহদায়তন ইতিহাসে প্রচুর আছে। মানসিক অবস্থাকে অনুন্নত রাখবার পাপ তাঁরা ক'রে থাকেন। পাপ মানে অবশ্য স্বভাব-বিরোধিতা। জ্ঞান আহরণ ক'রে প্রসারিত হবার কামনা মনে সুস্পষ্টভাবে বিরাজিত, সে-স্থলে মনের প্রসর্পণশীলতা রোধ করা স্বভাবের পথ রুদ্ধ ক'রে দাঁড়ানো, সুতরাং পাপ। সৎ কবি এ-পাপ থেকে নিবৃত্ত থাকেন। কবি জ্ঞানী। জীবনানন্দ দাশ জ্ঞানী কবি। তিনি বিজ্ঞানী নন, তাত্ত্বিক মতেও বিজ্ঞানী নন, পাশ্চাত্ত্যের দৃষ্টিতে ত নয়ই।

অতএব জীবনানন্দর অভিজ্ঞতা একটি অ-লৌকিক, স্বতন্ত্র বস্তু। তাঁর জীবন-বোধ, প্রেম-বোধ, ইতিহাস-বোধ, সমাজ-বোধ সবই স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত এক-একটি আলোক-মণ্ডল। কল্পনার আলোতে বোধগুলো উজ্জ্বলকায় হয়েছে সত্যি, কিন্তু সে-কল্পনা প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক বাস্তবতার মূল থেকে অলৌকিকতার পথে বিচরণশীল হয়নি। জীবনানন্দকে এজন্যেই ইতিহাস-চেতন কবি বলা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে যে মানব-চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে, আলোর চেতনা মনে বহন ক'রে, আলো-কেই সত্য ব'লে জেনে জীবন

যাপন ক'রে যাচ্ছে, জীবনানন্দর কাব্যে আমরা তারই অভিজ্ঞতার খবর পাই। প্রাকৃতিক পরিবেশ শুধু আকাশ বা শুধু পৃথিবী নয়। সেটি 'দূর ছায়াপথ', সেটি 'দূরন্ত নৈকত'। দূরন্ত নৈকতের কথা ইতিহাস-বিজ্ঞান থেকে নেওয়া আর 'দূর ছায়াপথে'র কিংবদন্তী ভারতীয় মনের প্রাক্-বিবিধ গতির কাছ থেকে পাওয়া। কিংবদন্তীর গতি যে-দূরত্ব কল্পলোক তৈরি করেছে কবির মনে 'কত লক্ষ যোজনের দিনে, তা-ই তাঁকে 'সাতটি তারায় তিমিরে' ধাবমান করিয়ে সেই তিমির হরণ করবার গতিবেগ দান করেছে। কল্পনার স্বাতন্ত্র্য যে-গতিতে চিহ্নিত হয়, জীবনানন্দ সে-গতি আয়ত্ত করেছিলেন।

তারপর, কল্পনার গতিবেগ আয়ত্ত করবার পর, কল্পনারই স্পর্শে বা ঘর্ষণে পথের সব-কিছু আলোকিত হয়ে যায়। ইতিহাসে, জীবন-বোধে, সমাজ-বোধে, নরনারীর সম্পর্কে আলো প্রবেশ করতে সুরু করে। ইতিহাসের এসিরিয়া-মিশর-বিদিশার অন্ধকারকে, সমসাময়িক 'অন্ধকার বন্ধুরার অন্ধকার'কে অথবা 'অনন্তর সেনে'র চারদিককার অন্ধকারকে অস্বীকার ক'রে কবি জীবনানন্দ তাঁর আলোকিত কল্পনা-বলয় নির্মাণ করেন নি। তবে, আমরা বিস্মিত হয়ে দেখতে পাই তাঁর উৎক্রমণ 'ডিমিরহনন' ক'রে চলেছে। 'মাটিও আকাশ সত্য' ব'লে অনুভব করছেন কবি তাঁর 'আবহমান' কবিতায়, কিন্তু 'সিন্ধুসারসে'র অনুভবে তিনি দেখতে পাচ্ছেন: 'রক্তের পথে পৃথিবীর ধূলির ভিতরে' 'কালী-ঝিলিমার মুখশ্রী মাছির মতো ভরে'। ইতিহাস নিখিলের মূল থেকে সুরু করে আবহমান অন্ধকার মুছিত, 'দূরন্ত নৈকত' তাই জীবনানন্দের দর্শনে সেখানে 'কোন এক অন্ধকার রক্ত নৈকতের বিন্দু' ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। ইতিহাস-চেতনা তাই 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতায় সমাপ্ত হয় কবির মৃত্যুর প্রাক্কালে। সেই 'মহাজিজ্ঞাসা' মনে মনে ক'রে তিনি তাঁর জীবনের শেষ কবিতা 'অবিনশ্বর' আলোর পাখা লিখে গেছেন।

উৎক্রান্ত চিত্তের মহাজিজ্ঞাসা রাষ্ট্রনীতি-সমাজনীতি-ব্যক্তিনীতির আবর্তে খুঁজে পায় না, জীবন-নীতির উপর প্রশ্ন-পাত করে। জীবন কি পার্থিব সূত্রে নিবদ্ধাধীন, না তার ঊর্ধ্ব আকাশ-গতি কিছু আছে, এই জিজ্ঞাসা জীবনীয়

হৃদয়ের হৃষীকেশ। যখন সেদিন মতো অনুভবে কবির বোধে যেহেতু অতি বেশি ঘুণ প্রতিফলন হয়, তখন

> দুষ্টি বাতাস ঘনঘন পাতা নাড়ছে—ঘুম ঘাসফড়িংরা এসে
> বলছে : 'আরো কতদিন খাঁচার ভেতরে পড়ার আছে
> আমরা এদিকে, কোথাও কিছু নেই :
> একটি তবু সূর্য আছে মাথার ঠিক ভেতরে
> যতো ঢাকে ঢেকেছে নীল আকাশ বয়েছে—('অবিনশ্বর')

এ-কঠোরোক্তিতে ইতিহাস ও কোবিদের মন অন্ধকার ও অবজ্ঞাধ্বনির দিকে আকর্ষিত হয়, কিন্তু কবি, যিনি জানেন জীবনানন্দের মতো কবিতা-দান করতে পেরেছেন তার মহা-চেতনা অন্ধকারের অকূল সীমার অন্তর্গত আলোর কথা অনুভব ক'রে ব'লে যাবে : 'হয়তো সত্য আলো'। আলোর প্রতীতিতে মুগ্ধ করেছিলেন জীবনানন্দ তাঁর কবি-জীবন, আলোর প্রতি নিটোল বিশ্বাস না থাকলেও, আলোর বৃত্ত থেকে তিনি বিচ্যুত হ'য়ে কবি-জীবন সমাপ্ত করেন নি বা জীবলীলা সমাপ্ত করেন নি।

কবির সমগ্র জীবনই কবিতাময়। বাস্তব জীবন সমাপ্ত হয় শুধু তাঁর মৃত্যুতে। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর আমরা সাহসের সঙ্গে অনুভব করতে পারি যে তিনি ঠিক পথ-পথ দিয়ে আমাদের প্রত্যহ দৈন্য ফুলুরিত করেন নি। মন-ভোলানো কবিতা লিখে যাদুকরালের ভূমি বিধান করার কৌশল তাঁর হাতে আসলকির মতো এসেছে, কিন্তু এতাবনক তিনি তুচ্ছ-জ্ঞানে বর্জন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতায় এ-রকমের কৃতিত্ব আর কেউ দেখাতে পারেননি এমন নয়। কারুণ আর্দ্রতার বা শক্তির কঠোরতার ধ্বনি-ব্যঞ্জনা ফুলতে অনেকেই কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু মনোভঙ্গির একাগ্র সাধক রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দ প্রথম। জীবনানন্দ আমাদের যুগের প্রথম কবি। তাঁকে নিয়েই ভাঙা-গড়া চলছে ইদানীং। যাঁরা দ্বিতীয়ের বা তৃতীয়ের ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল, তাঁরা নিশ্চয়ই আজ জীবনানন্দের 'অবিনশ্বর' কবিতার এই পঙ্‌ক্তিগুলি মনে-মনে আলোচনা করবেন :

কবিতা

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২

তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অসীম আশার কালো
অফুল সীমা আলোর মতো।—বহুতো সত্য আলো।

জিজ্ঞাসা এ-শতকের একটি প্রধান মানসিক অধিষ্ঠান (fixation)—যা মনোভঙ্গি। এ-ভঙ্গি অক্ষিত হতে সুরু করেছে কোবিদ-চিত্তে বহু শতাব্দী পূর্বে। এর যাত্রা-পথ মানবিক সভ্যতার আলোর প্রতিপথের মতোই অর্থবোধ্য। ইতিহাস-গত মানুষের জীবনের মতোই তা প্রাচীন। এই প্রাচীনতার ঐতিহ্যবাহী ছিলেন জীবনানন্দ, যাঁর কথা মানবিক প্রেমের মতোই জীবনের অতি-গভীরে প্রোথিত। প্রেম আর প্রয়াণে এক পর্যায়ে বিগত ক'রে রেখে গেছেন এ-যুগের বাঙালি কোবিদ-কবি জীবনানন্দ দাশ।

আমাদের কবি

অশোক মিত্র

অন্তর্জিত মফস্বলের মানুষ, কলকোলাহলমুখর নগরজীবনের সঙ্গে তাঁর কোনোদিন অন্তর ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী বাংলাদেশের সে মফস্বলশ্রীও আর কোথায় নয়। দেশভাগের কথা ছেড়ে দিলেও, আধো-শহর আধো-গ্রাম যে-চলবতী ধরিত্রীকে, তা হারিয়ে গেছে কোথায়। সেই নারকেল-সুপুরির সারি, শুকনি-ছাওয়া মড়কের পাশে খাল, খালের ওপারে নিবিড় ঘরে ঘিরে আসা পল্লীশ্রী; খোড়ো ঘর, ঘাস, খান, শিরীষ, আম, জাম, নিম, কামরাঙা। কোঠাবাড়ির সিঙ্গনে স্তব্ধতা, টলমল পুকুর, ঘাস, মাঠ, শালুক, গুগলি। সুপুরির দীর্ঘ ইশারা বেয়ে চড়াই; পেঁচা, বাদুড় আর ঝিঁঝি, বিশাল আকাশ জুড়ে অনন্ত নক্ষত্র। অপেক্ষাকৃত ধনস্তর বসতি ছাড়িয়ে গেলেই হয়তো ধানসিড়ি নদীর জল, সন্ধ-কাশ-হোগলার বন, তারই পাশে বিচ্ছিন্ন ঘরের বোঝা মুখে নিয়ে প্রান্তরের নীরবতা। আরো একটু এগিয়ে গেলে এমনকি শস্যাবনের ভিতরেই হারিয়ে যাওয়া যাবে বোধহয়: কে জানে, হীরা-তরা চোখ নিয়ে দু'একটা হরিণই বেলা ক'রে বেড়াচ্ছে।

এই পরিবেশে জীবনানন্দ নিজের মনে কবিতা লিখে গিয়েছিলেন বিশ-তিরিশের বছরগুলো জুড়ে। শান্তির কবিতা, স্নিগ্ধতার কবিতা: গোধূলি, ঘোড়া, হরিণ, ঘাস, কীটপতঙ্গ, পাখিপাখালির পরিমণ্ডলে যে-শান্তি, সেই একমুখ শান্তির কবিতা। 'হাঁসের নীড়ের থেকে বড় পাখির নীড়ের থেকে বড় ছড়াতেছে; মমিয়ার ঘরে ধান ভিত আর সিপিটের জল' এরকম অথচ উপলব্ধির কবিতা। উদ্ভিদজীবনের, প্রাণীজীবনের, গৃহস্থজীবনের অবাধ্যাস নিয়মকলায় যে কোমল পাকপূর্ণতা আছে, তার কবিতা। অথচ জীবনের আরো গভীরে যে-আছে, প্রেম অর্থ কীর্তি সফলতা সব-কিছুর পরেও যে বিপন্ন বিস্ময়ের আলোড়ন, সেই বিক্ষোভের কাব্যও।

সত্যিই আমাদের পৃথিবীর ছিলেন না কোনোদিন। মানুষের সঙ্গে

প্রকৃতির, সভ্যতার সঙ্গে মানুষের যে-সংঘর্ষে ক্রমেই হ'টে যাচ্ছে প্রকৃতি, ফুরিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বৈশিষ্ট্যশক্তি, সেই যুগে বুদ্ধদেব-হরিণ-শঙ্খচিলের মতো তিনিও অহরহ বিপন্ন হচ্ছিলেন। যে-পৃথিবী 'প্রবাহ প্রবহমাণ মরণা', তার অসীম আরতি এড়িয়ে 'অন্ধকারের সাম্রাজ্যসারে' ডিমে হাওয়ার স্বপ্ন আকৃতিতে অন্তএব কোনো অসুবিধা ছিল না। তবু এ উদ্ভিদ্‌জগৎ নিয়ে প্রগাঢ় সংবেদনশীল কাব্য অবশ্য পৃথিবীর সাহিত্যে আজ পর্যন্ত অজস্র রচিত হয়েছে, কিন্তু জীবনবিমুখ অসুস্থতা ঘুচে গেছিল এই কারণে যে তাঁর কাছে নিছক সংবেদনার নয়, পরম অন্তর্বেদনার। 'কোনো নিষ্ক্রিয় ঘাসেদের শরীরের সুষুপ্ত অন্ধকার' থেকে নেমে অন্তর্লীন হওয়ার যে-আনন্দ, একটি কচি ঘাসের চেতনার সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে না-পারলে সেই অনুভূতির ঐশ্বর্য সাধ্যি প্রকাশ অসম্ভব ব'লে মনে হয়। বিষয়কে নিজের অস্তিসত্তা থেকে জীবনানন্দ কখনো আলাদা ক'রে দেখেননি; বিষয়কে আশ্রয় ক'রে একটি সম্পূর্ণ চেতনা কল্পনা করেছেন, সেই চেতনাকে সম্মানের সঙ্গে পরিচর্যা করেছেন, সর্বশেষে মানবিক হৃদয়ের অনুভূতিকাণ্ডে সে চেতনার আশ্চর্যতম দ্যুতিটি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। ('সেই সব সেয়ালেরা' কবিতাটি তাঁর কল্পনার এই অদ্ভুত প্রক্রিয়ার পরাকাষ্ঠার নিদর্শন হয়ে থাকবে।)

জীবন, পৃথিবী, প্রকৃতি, সব মিলিয়ে সব জড়িয়ে সব-কিছু অহিফেন ক'রে যে-শান্তি, যে-প্রাপ্তি: এ-সমস্ত বোধবিশ্বাসের প্রসঙ্গ নিয়ে জীবনানন্দ বাংলা দেশের মফস্বলে কাব্যচাষ ক'রে গিয়েছিলেন। অনুভবের গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে বাংলা সাহিত্যে তাঁর কাব্যের তুলনাই নেই। অথচ এ-স্বীকৃতি পাবার জন্য তাঁকে দীর্ঘ দিন ধ'রে দুঃসহ্যতার সঙ্গে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়েছে। 'প্রগতি' 'কল্লোলে'র উদ্দাম অধ্যায়ে জীবনানন্দের দিকে তাকাবার মতো অবসর কারো ছিল না। অনেক ব্যক্তিস্বাধীন বিভিন্ন পুরুষেরা তখন অঙ্কন মুখর ক'রেছিলেন: বস্তিবাসের নির্জন আকাশ নিয়ে হিজিবিজি কল্পনাকাকলি তাই একপাশে চুপচাপ প'ড়ে থেকেছে। আরো বছর-দশেক বাদে 'কবিতা' পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে যে আধুনিক কাব্য-আন্দোলন শুরু হ'লো, তারও প্রধান বোদ্ধা থেকে তিনি বাদ প'ড়ে গেলেন।

কারণটা স্পষ্ট। এ-কথা বললে এখন বোধহয় অত্যে কোনো বিতর্ক হবে না যে নিতান্তই বিদেশী সাহিত্যের পরিমণ্ডল থেকে বাংলা কাব্যের সেই অধ্যায়ের মূল প্রেরণা এসেছিল। 'মনসীন' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় ডাওসন তখন বলি। তত্ত্ব এবং তথ্য, ভূয়োদর্শন এবং পাণ্ডিত্যের ভারাক্রান্ত না-হ'লে সে-রচনা সার্থক নয়, এ-রকম একটা ভুয়োদর্শী ধারণাকে কাল গেছে সেটা। আবেগ-প্রধান, বিষণ্ণ প্রেরণাধর্মী কবিতার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সাফ ক'রে সহজ কথাটা বলবার মতো বাগবিন্যাস্তা আর নয়—ইত্যাকার নানা অভিমত সেই দশকের কাব্য-সমালোচনাকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল। এরূপ দৃঢ়চক্র প্রতিকূলতার মধ্যে জীবনানন্দের কাব্যের কোনো ব্যাপক সমাদর হওয়া সম্ভব ছিল না। 'মাঝে-মাঝে ভালো উপমা দিয়ে থাকেন, কিন্তু ওসব ক'রে আর কী হবে।' ধাঁচা ঠোঁটে এ-ধরনের অক্ষম উক্তি ক'রেই অনেক বিজ্ঞ সমালোচক নিজেদের কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন ব'লে ভেবে নিয়েছিলেন। বাণিশে নাকা মেরে যাঁদের ঘুমোবার, তাঁরা ঘুমিয়েই ছিলেন: একমাত্র সমালীয় ব্যতিক্রম বুদ্ধদেব বসু।

এই ঔদাসিক কাব্যমর্মের অসারতা প্রমাণ হ'তে-হ'তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় শেষ হয়ে এল। তখনো যেহেতু কালজয়ী, সেই 'ঝরা পালক'-পর্বের খুব অল্পসংখ্যক কবিতাই সময়ের উচ্চাবচতা ডিঙিয়ে এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে। অন্য পক্ষে, প্রতীক্ষার দিন গোধূলিলগ্নে, তাঁর প্রাপ্যের সামান্য কিছু অন্তত জীবনানন্দ পেতে লাগলেন চল্লিশের দশকের উপান্তে। যে-তরুণদের দল প্রায় দশ-বারো বছর ধ'রেই তাঁর কাব্যের সঙ্গে সংযোগনে অভিসারব্রতী ছিল, সমকালীন প্রয়াসের বিস্রাব বিতর্কতায় ঘ্যাহত-বিক্ষত তারা, পূর্বসূরীদের ধিক্কারকে পাশে ফেলে রেখে জীবনানন্দকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে বরণ ক'রে নিলো তারা। জীবনানন্দ-চেতনা তাই বলতে গেলে মাত্র বিগত কয়েক বছরের ফল। কবিতার যেন নাকি যাংলা, কিন্তু প্রায় কুড়ি বছর ধ'রে কবিপ্রতিভার প্রতি যে-অসম্মান জীবনানন্দের ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়েছে, আমাদের সাংস্কৃতিক ধারার ইতিহাসে তা কলঙ্কের এক চরম চিহ্ন হ'য়ে থাকবে।

২

আষাঢ়ের বেদনা আমাদের কাছে এতটা দুর্বিষহ লাগছে এই কারণেই: যথার্থই অন্যরকম ক'রে এসেছি জীবনানন্দে একমাত্র আমাদেরই অবশ্য অধিকার। আমরা এখন যারা তিরিশের এদিকে ওদিকে, জীবনানন্দ-ভিজোর বৈশোর কেটেছে আমাদের সকলের। বৈয়াকরণেরা বিমুখ: তাঁকে আমরাই তো আবিষ্কার করেছিলাম আমাদের উপভোগের নিবিড়তা দিয়ে। সেই আবিষ্কারের বিস্ময়ের কোনো তুলনা নেই: যেন সদ্য-ফোটা ইন্দ্রিয়ের যৌথ হৃদয়বত্তিতায় নতুন একটি কুসুমকলের সঙ্গে পরিচয় ঘ'টে গেলো। আমাদেরই পৃথিবী, প্রত্যহের স্পর্শ যার সত্তের প্রত্যেকটি বিন্দুতে উপস্থিত, অথচ নতুন ক'রে তাকে চিনতে শিখলাম। চেতনাতে কোনো মোহিনী মায়ার জাদু এসে লাগলো, স্নায়ুতে শিরায় তন্ত্রীতে আকুল কোনো বিপ্লব। অত্যন্ত পরিচিত রূপ বদলে গেলো, রূপকথা হয়ে ফিরে এলো; গন্ধে এলো শিহরিত বিকাশ; স্পর্শে পৃথক এক হেমন্তর্ষ। জীবনকে, মৃত্যুকে, কান্নাকে, কাব্যকে হৃদয়ের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে শিখলাম: ঘাস আর শিশিরের জলের সঙ্গে প্রবীভূত হ'য়ে মিশে গেলাম: কীটপতঙ্গ পশুপাখির হৃদয়রহস্যের গহনে আমরাও স্বয়ংসিদ্ধতা হ'য়ে প্রবেশ ক'রে গেলাম যেন। চাঁদের ঘুমের গন্ধ-মাখা তরল দুঃখেরা যে নির্জন মাঠের চোখে জল হয়ে ঝ'রে যায় তা আর আমাদের কাছে কল্পকল্পিত তত্ত্ব হ'য়ে রইলো না, বিশ্বাসেরও আরো অনেক গভীরে, সেই অনুভব আমাদের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হ'লো। বৈশোরের সিঁড়িতে পা দিয়েছি আমরা, জীবনানন্দের কাব্যে এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য আবিষ্কার ক'রে উল্লসিত, চকিত, অভিভূত হয়ে গেলাম। সে এক অদ্ভুত মহত্তা-মাখানো অধিকারবোধ, আজ পর্যন্ত তা অব্যাহত: সে-সাম্রাজ্য আমরাই প্রথম আবিষ্কার করেছিলাম, সে-সাম্রাজ্য সুতরাং আমাদের। পৌষের এই নিদারুণ মুহূর্তে শীতিদেও এখনো সেই গর্ব।

৩

কিন্তু গর্ব ক'রেই বা কী হবে, আমাদের সম্পূর্ণ মানুষের কতটুকুই বা

আমরা পালন করেছি। তাঁর কাব্য নিয়ে মাতামাতি করেছি প্রচুর, অথচ ব্যক্তিহিসেবে তাঁকে প্রায় ভুলেই থেকেছি। বিগত দশ-বারো বছর নানা কলহুমার মধ্যে তাঁর কলকাতায় কেটেছে। বিভিন্ন অতিব্যস্ত সাহিত্যিক-গোষ্ঠী কোনোদিনই তাঁকে গ্রহণ করেনি: লোকমত থেকে দূরে, জীবনানন্দ চুপি-চুপি পালিয়ে বেড়াতেন কলকাতায়। অল্পসংখ্যের মধ্যে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা অল্প হওয়া সত্ত্বেও কাউকেই তাঁর কাছে যেমন যাওয়া-আসা করতে দেখা যেতো না। অথচ, স্বভাবগত প্রাথমিক জড়তাটি কাটিয়ে উঠলে, লোক-সমাগমে জীবনানন্দ আনন্দ পেতেন, ভরসা পেতেন। এই দুর্ভাগ্য দেশে, কবিধর্মের সঙ্গে অধিক সঙ্গতিতায় যেখানে নিশ্চিত আড়ামারি, অনুরাগী পাঠকদের মুগ্ধতাবোধের প্রত্যক্ষ, আন্তরিক অধ্যবসায়ও কবির তৃপ্তির পক্ষে অনেকখানি। অতটুকু অর্ঘ্যও তাঁকে দেয়া হয়নি।

আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে গত চার-পাঁচ বছরে তাঁর একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তাসম্বন্ধ গ'ড়ে উঠছিলো। চন্দ্রর পৃথিবীর কলরোলের ক্লান্তিকে পিছনে ফেলে রেখে নিমগাছের আকর্ষ ছায়া-ঢাকা উঠোনসম্পন্ন তাঁর বাড়িতে মাঝে-মাঝে গিয়ে হাজির হয়েছি। বারান্দার মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসেছি, নিমগাছের ডালের ফাঁক দিয়ে হয়তো জ্যোৎস্না এসে পড়তো—কী-এক আছন্নতায় পৃথিবীর সমস্ত শব্দ ডুবে যেতো—অনেক সময় প্রাণখোলা গল্প হ'তো তাঁর সঙ্গে। পর্যাপ্ত খুশির একটা আমেজ ছড়িয়ে পড়তো চারদিকে। কোনো কথার প্রসঙ্গে রহস্যের ইঙ্গিত দিয়ে হঠাৎ প্রাণখোলা হেসে উঠতেন তিনি, কৌতুকে চোখ দুটি নৃত্য ক'রে উঠতো। যতবারই গেছি কৃতজ্ঞ অন্তরে ফিরে এসেছি: প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে, যেন পৃথিবীর নিষ্পাপ বিস্ময়ের সৌরভ থেকে আনন্দ আহরণ ক'রে এলাম।

অথচ, কতদিন আক্ষেপ হয় এখন, খুব বেশিদিনও যাইনি। বহুবিধ নাগরিক উত্তেজনায় ব্যস্ত আমরা, কবিদর্শন তো এর মধ্যে বিরলতম ব্যাপার: বিবেকের কাছে আজীবন এখন জবাবদিহি দিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া আরো মনে হয়, তাঁর আগন্তুক দুঃসংবিধানের জন্য আমাদের কিছু দায়িত্ব নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সে-দায়িত্ব মেটাবারও তেমন-কোনো অন্তিম চেষ্টা আমরা করিনি।

'সূর্যের আলোয় তার রং ফুলুরির মতো নেই আর। ধরে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো' এ রকম একটি উপমাও যিনি কল্পনা করতে পেরেছেন, তাঁর আসন মহত্তম কবির পর্যায়ে : আন্তরিকতার উৎসাহে এ রকমের কথা বহুবার টেচিয়ে ব'লে বেড়িয়েছি। এই মতের সপক্ষে অনেক-কিছু বলবার ছিল, আছে—হয়তো মনে-মনে তাবাও ছিল সে-সব কথা—কিন্তু আমাদের উৎসাহ, স্বীকার করতেই হয়, আজ পর্যন্ত তেমন স্থায়ী হয়ে বাঁধেনি। আমাদের আন্দোলনে অধিকতর ঋজুতা আর দার্ঢ্য থাকলে হয়তো বা মৃত্যুর আগে জীবদ্দশাতেই তাঁর প্রাপ্য সম্মানের একটি বৃহৎ অংশই কৃতজ্ঞ নম্রতার সঙ্গে সাজিয়ে নিবেদন করতে পারতাম।

জীবিকানির্বাহের তাড়নায় প্রবাসে প'ড়ে থাকবো। দু'বছর-তিন-বছর বাদে অল্প কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় আসবো, বেণ্টিঙ্ক পার্কের কোণে বাস থেকে নামবো, ট্রাম-লাইনের দিকে চোখ পড়ামাত্র হৃদয় ঝংকৃত হয়ে উঠবে হৃদয় : আকাশে ঝিকিমিকি শরতের রোদ্দুর, নিজের বিবেকের কাছে আরেকবার মাথা হেঁট করে।

যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার

অমলেন্দু বসু

সময় আসে, যখন সমালোচক কণ্ঠস্বরহীন, শিল্পবিচার ছত্রভঙ্গ। যে-কবির অধিকাংশ সৃষ্টির ফুল দীর্ঘকাল অক্ষরে ফুটেছে, তাঁর মৃত্যুপরবর্তী পর্বে সে-সুষমা আবার নতুন ক'রে আস্বাদ্য হতে থাকে। ঠিক এ সময়টিতে স্থূল-বিশ্লেষণ ক্ষমতাহীন, বিশেষত যদি কবির সঙ্গে দূর পাঠকের ব্যক্তিসম্পর্ক থেকে থাকে।

সাধারণ বিচারে মৃত্যু শোকোদ্দীপক ঘটনা। তবুও, তার নিষ্ঠুর আকস্মিকতা সত্ত্বেও, জীবনানন্দের মৃত্যু, তাঁরই নিজের, হয়তো শোকাবহ নয়। শুরু থেকে শেষ অবধি তাঁর কাব্যে মৃত্যুর অনন্ত ভাবনা অপূর্ব গীতরূপ পেয়েছে, কখনো অপার বিষণ্ণতায়, কখনো বেদনার উল্লাসে, কখনো পুনর্জন্ম-প্রত্যাশার কলরোলে। 'যে ভালোবাসা যায় বোঝা হ'ল—সেতুই যে মৃত্যু ভালোবেসে।' সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত, বহুবার প্রিয়-নামে-ডাকা মৃত্যু লৌকিক নিরিখে শোকাবহ, কিন্তু এ-মৃত্যু কি জীবনানন্দের অনন্ত বিস্তৃত কবিসত্তার অতি সহজ পূর্ণতাপ্রাপ্তি নয়?

মৃত্যুর ভাবনা জীবনানন্দে নিত্যবর্তিত। "যখনই তাকাই" অবধি রচনাবলীর প্রতি কবিতায় মৃত্যুর কোনো-না-কোনো উল্লেখ, স্পষ্ট উচ্চারণে অথবা তির্যক প্রতীকে উপস্থিত। কবির জীবনোপলব্ধির মাঝিমনে মৃত্যুর অন্যান্য ভাবনা, অন্য সব ভাবনা ঘুরে ফিরে এই কেন্দ্রের সন্ধানে সমাবিষ্ট।

> যখন কবিতা যায় বেদনার ঘরে
> হৃদয়ে পাতার মত আঘাতের পরে শুকাউড়ি
> তখন ঘুমেরে বুঝি মৃত্যুরে যায় ছোঁয়া
> কাঁদন গেছে থেমে যায়। ক'রে গেছে যারা যাহিনিন পড়িতেছে ঝ'রে
> ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন
> পৃথিবীর সব রঙ্গি সব ঈর্ষা ঘুরে গেলে পর
> একবার যখন যে ফেরে যায় হ'য়ে যায়

বয়সের পরপারে যত অভিজ্ঞতায়

গভীর সমুদ্র যার মনের কড়িং
আজ ফেলে আসে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অভিজ্ঞতার ঘাস

এমন কি "সাতটি তারার তিমিরে", যেখানে ইতিহাসচেতনার শিল্পীচিত্ত প্রবুদ্ধ, যেখানে "নব নব মৃত্যুপথ রক্তপথ তীর্তিপথ ধরে ধ'রে" মানুষ চেতনার দিনে অনন্ত-অন্বেষণের গান গায়, সেখানেও মৃত্যুর উপমায় পুনঃপৌনিক আবির্ভাব।

বিপুল আকাশে ঐ আমার হৃদয়
মৃত এক নারীসের মত

যেমন কবির মনে অন্ধকার ঈশ্বর আবার মৃত্যু

পাঁচ কুড়ি কবিদের পিঠোপিঠি মাথা পেতে মেঘেরে আলোরে

এই তো জীবন :
মানুষের অন্তর্গত পরোপকারের

মানবের মরণের পরে তার মণির মন্ত্রের

দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক
তেমনি আসত মরে মৃত মরে অন্ধ হয়

এই মৌল মৃত্যুমুখী ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে এমন কি কবির বহু-ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলিতেও : ঝরিয়া গেছে ; মুছিয়া গেছে ; থাকিবে না ; কেঁপে ; মিঁশে ; হাওয়া হ'য়ে ; ফুত হ'য়ে ; (গান কোন্ দিকে) ভেসে যায় ; উড়ে যায় ; রহিবে না। এ কয়টি ক্রিয়াপদ মৃত্যি ছন্দের একটি মাত্র পাতায় পাচ্ছি। আরো মৃত্যি ছন্দের মধ্যে নেতিসূচক শব্দ অজস্রগুলি : আসেনি ; বোনে নাহি ; নিরালা ; যায় নাকি' ; নির্জন ; নিঃসাড় ; থামিতে হয় ; নিস্তব্ধ ; নিমীলিত ; স্বাধীনতা। আর এই মৃত্যুমুখ অন্তর্ভূতিতে স্বর্গলোকবাসিনী যোবিনী ("পত্নী নয়,—মানুষও সে হয়নি এখনো") বলতে পারে "ফুলগুলো বাসি নয়,—আমি শুধু বাসি"। আর তাই ছুতোয় শান্তি-দেওয়া নারীর "ঘুচে গেছে

জীবনের সব দেনাকে ", আর "যশের কাঙালি এসে ধ'রে যায়, কবিতা সব চেয়ে ভালো"।

> যেদিন পৌষের রাতে সোনালি ধানির ঘাস ছেড়ে
> একটি শিকারে ব'সে হিমোমার ওরে।
> অন্ধকারে চোখ দিয়ে দেখে যাব
> মানুষের আঁতাতীতা আভাসের মতো।
> কবিতা, তবে তুমি আসিবে বলে তো।

এই নিবিড় মৃত্যুচেতনা, কবিতা-স্পৃহা, পরিতাপীর্ণ চিত্তের অনুপস্থিতা নয়, কেননা জীবনানন্দের পিছুটানের নিশ্চেতন কবিতাকে বড় আস্কারা করেছে, উল্লাস করতাকেও তেমনই আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

> হে কবিতা,—বিশ্বাসের মত তুমি সুন্দর—জীবন!
> বেদের ঘোড়ার পরে আকাশের নিস্তব্ধীর মত।—
> নিকুষ সাপের মত লক্ষ ঢেউয়ে তোল আলোড়ন;
> চরাচর হয়—পরিবেশে তুমি তবের আয়ত।

আসলে জীবনানন্দের মৌল জীবনোপলব্ধি সামান্য লৌকিক বিচার থেকে আলাদা। সব কিছুকেই পৃথক্‌রূপে স্বতন্ত্র সত্তায় চিহ্নিত করা সামান্য যুক্তিবাদী বিচারের স্বভাব। কবিতা ও বেশ, প্রেম ও অপ্রেম, জীবন ও মৃত্যু, আলো আর অন্ধকার, এদের মধ্যে নিঃসংশয় সীমানা, অলঙ্ঘ্য ব্যবধান, এমন কি পরস্পর-বিরোধী বৈপরীত্য বর্তমান ব'লেই আমরা জেনে থাকি। কিন্তু যে সীমানা বুদ্ধির কাছে সুস্পষ্ট, হৃদয়ের সহজ অনুভূতিতে তা অবলুপ্ত হ'তে পারে। আলো-অন্ধকার দিয়ে যেনা সে-অনুভূতি "দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে" "ঘুসর অতীত দেশে গিয়া" "হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ঢেউ খুঁজে তৃপ্তি পায়"। জীবন মৃত্যুর ব্যবধান-লোপী মনোভাব দার্শনিক মতের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়; এই দার্শনিক মত যদিও আলৌ সুপ্রচারিত নয়, তবু জীবনানন্দের মনোভাব যুক্তি-বিতর্কের ভিন্ন বলে মনে হয় না, অন্তত "বনলতা সেন" অবধি কাব্যগ্রন্থে নয়। এ-মনোভাবে জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান প্রায় নয়, বরং জীবনে মৃত্যু, মৃত্যুতেই

জীবন, গতি ও নিষ্কলঙ্কতা অভিন্ন, গোধূলি ও ফুরাবার দিনের ও রাত্রির আলো মিলিয়ে একাকার। এই অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা কাব্যে অভিনব। অতীন্দ্রনাথের মানসক্ষেত্রে গোধূলির আবহাওয়া হয়তো উজ্জ্বল পরী। পেয়েছে, কিন্তু প্রেতলোক কখনোই মনুষ্যলোকে রূপান্তরিত হয় নি। ইংরেজ কবিদের মধ্যে কীটস ও কোলরিজে এই একান্তমুখী সম্ভব ছিল, ওয়ার্ডস্বার্থ কি শা মেরাদের ও ইয়েটসে এই ধারাবাহী দৃষ্টির আবির্ভাব পুনরাবৃত্ত, কোনো-কোনো ফরাসী কবিও আলো-আঁধারি জগতে বাস করেছেন। জীবনানন্দ ইংরেজি সাহিত্যের সীমান পাঠক ছিলেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিদেশী প্রভাবে গ'ড়ে বা বেড়ে উঠেছিল এমন মনে করার বিন্দুমাত্র কারণ দেখি না, কেননা তাঁর মায়াবী দৃষ্টিভঙ্গি, জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ একান্তমুখী তাঁর নিজস্ব কল্পনার উদ্ভূত আর বহু-পরিচিত পরিবেশের ফলে পুষ্ট। মনে হয় এই একান্তমুখী ধারাটি কবির পক্ষে সহজ হওয়া উচিত, কেননা বাংলাদেশের কোনো-কোনো অঞ্চলের নিসর্গ-পরিবেশ এ-দৃষ্টির পক্ষে সহজেই অনুকূল, আর কবিমাত্রেই নিসর্গ-পরিবেশ দ্বারা কমবেশি অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, বিশেষত বাঙালি কবি। কিন্তু খুব কম কবিই জীবনানন্দের মতো এত সহজ সহানুভূতিতে নিসর্গ পরিবেশের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন, দুই নদীর সংগমের মতো সহজে, জলধারা মিলনের অনির্বচনীয় সীমারেখায়; দশ কয়টি চরিত্রের ভিতর নিসর্গ-পরিবেশের অসংখ্য বিচিত্র প্রভাব তিনি গ্রহণ করেছেন নিজস্ব, তাই তাঁর কাব্যে শব্দ, স্পর্শ, দৃষ্টি, ঘ্রাণ, এমন কি স্বাদেরও যাচনিক রূপ নিরন্তর প্রকাশিত। জীবনানন্দের এই নিবিড় সামন্ত নিসর্গ-সহানুভূতি, আর তাঁর তুরীয় অনুভূতিময়—যাকে তিনি বলেছেন "বোধ"—তাঁর দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যুকে একীকৃত করেছে, সে-একীকরণের ফলে জীবন ও মৃত্যু উভয়েরই ঐশ্বর্য হয়েছে সহজ ও সরল। যে-মৃত্যু লৌকিক ধারণায় অবসান ও সর্বনাশ, সে-মৃত্যু এই আনন্দিক ধারণায় জীবনেরই অভিন্ন রূপ, এমনকি জীবনের পরাকাষ্ঠা।

এই বিরল মানসের অধিকারী ছিলেন ব'লেই জীবনানন্দ বিশেষ অর্থে নির্জন, নিঃসঙ্গ কবি।

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার বিচের খুঁজি ধোরে
আমি এত রয়েছি আলাদা।
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা।
আমার পথেই শুধু বাধা।

• • •

তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি?—তাদেরো মন
আমার মনের মত না কি?
—শুধু কেন এমন একাকী?
শুধু আমি এমন একাকী।

• • •

আমার ভিতরে
কত ঋতু—প্রেম ঋতু—তোমো এত বোধ হয় করে।
আমি সব দেহকারে ছেড়ে
আমার আলোর কাছে চ'লে আসি,
বসি আমি এই হৃদয়েরে:
সে কে- জনের মত ঘুরে' ঘুরে এসে কথা কয়

কবি জীবনানন্দ বাস্তবিকই "আলাদা"। তাঁর নিজস্বতার বিশেষ ক্ষেত্র "ফ্যান্টাসি"তে, প্রকল্পনায়. সে-প্রকল্পনা স্বচ্ছন্দ তুলীর যুক্তি-না-মানা বেপথুমান পথে চলেছে সব পর্যায়ের কাব্যে, প্রথম বিকাশের তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়ানুগত কাব্যে যেমনি, তেমনি শেষ বিকাশের তত্ত্ব-সন্ধানী মনীষিতা-প্রকাশী কাব্যে। মুক্ত থেকে শেষ অবধি জীবনানন্দের রচনা একই কাব্যোত্রীর জন্যনির্দিষ্ট। বিষয়বস্তু তাঁর কাব্যে শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকেনি—থাকবেই বা কেন?—কিন্তু সর্বত্র কবিদৃষ্টির নিঃসঙ্গতা সমানে পরিস্ফুট, আর সেই নিঃসঙ্গতার মূলে একই অনন্ত পারলৌকিক সংবেদনা উপস্থিত। যে-মৃত্যুর অবিরাম তমস্তলে জীবনানন্দের কাব্যে, সে-মৃত্যু জীবনেরই রূপান্তর। আলো-আঁধারি কুয়াশার দৃষ্টিতে যেখা জীবন, তবুও জীবন—স্বপ্নভাবে, ব্যাপকভাবে, কৌতূহলী-দৃষ্টিতে যেখা মৃত্যুর ও অস্তিত্ব জীবন। জীবনমৃত্যুর এই সঙ্গমে, তাদনার মুহেলিময় পরিমণ্ডলে, জীবনানন্দের নিজশক্তির আশ্চর্য অবৈকল্য।

জীবনানন্দ দাশের আন্তিকতা

অরুণকুমার সরকার

কাব্যরসাস্বাদনে কবির বক্তব্যের আলোচনা কতদূর সহায়তা করে সে-বিষয়ে আমার যোরতর সন্দেহ আছে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আমি অনুভব করেছি যে প্রত্যেক মহৎ কবি বিশেষ একটি সত্য, 'বাণী' কথাটার আপত্তি না থাকলে, তা-ই, সাধ্যমতো উদ্ঘাটন করেন। সুতরাং জীবনানন্দ দাশ যে-রসসৌন্দর্য রচনা ক'রে গেছেন তার আস্বাদন আপাতত পাঠকের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপরে ছেড়ে দিয়ে আমি যদি শুধু তাঁর অভিমতের পরিমাপে অগ্রসর হই তা হয়তো নেহাৎ অনর্থক হবে না। বিগত ১৩-১৪ বছর ধ'রে তিনি যে-সব কবিতা লিখেছিলেন, খুব অল্প লোকই বোধ হয় সেদিকে নজর দিয়েছেন। তাই সাধারণ পাঠকের কাছে যেমনো তিনি নির্জনতার কবি, প্রকৃতির কবি তাঁর খ্যাতি এবং অখ্যাতি সংসারবিমুখ পলাতক কবি হিসেবেই। এই ধারণা কিন্তু, আমার বিবেচনায়, পূর্ণসত্য নয়। শেষদিকের রচনায় জীবনানন্দের চিন্তা ভিন্নমুখী এবং স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছিল। মনোময় জগৎ ছেড়ে কিছুদিন তিনি কর্মময় জগতে ভ্রমণ করেছিলেন এবং পুনরায় নবতর উৎসাহে মনোময় জগতেই ফিরে গিয়েছিলেন। এই স্বল্পকালের ভ্রমণকাহিনী নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এখানে জিজ্ঞাসা আছে, সংঘর্ষ এবং হতাশার ইঙ্গিতও আছে, প্রাথমিক বোধে সীমাবদ্ধ মেনে-নেওয়ার নিষ্ক্রিয়তা ছাড়িয়ে চোখে-দেখার জগৎটাও এখানে বিস্তৃত এবং অর্থপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, যাঁর মন মূলত বহির্মুখী, ধারণা-তৈরির খেলায়, অর্থাৎ, চিন্তা নিয়ে চিন্তা করায়, তিনি হয়ত শুদ্ধতা রক্ষা পান না; ছবি-আঁকাতেই তাঁর আনন্দ, অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারলেই তাঁর নিষ্কৃতি। শেষের দিকের রচনায়, কিন্তু, জীবনানন্দ সমাজচিন্তায় ভাবিত এবং চিন্তাবস্তুকে আবেগগ্রাহ্য ক'রে তোলায় সচেষ্ট হয়েছিলেন।

'পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নেই'—এই কথা ব'লে সমস্ত সাংসারিক উৎসাহ

এবং উত্তরের দিকে পাশ ফিরে 'ফেলে যেতে মুমূর্ষুর সাথ' যিনি জাপন করেছিলেন, বলা বাহুল্য, সেই কবির মনোবিপ্লব রাতারাতি সংঘটিত হয়নি। লোকালয়ের সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে, বিগত মহাযুদ্ধের বিষুব আবর্তে, জীবনানন্দ দাশ প্রথম-প্রথম খুবই অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন। সন্ধিকালের কবিতাগুলি, তাই, কখনো পরিহাস-তরল, কখনো বা সামাজিক বৈপরীত্য এবং অসংলগ্নতার বোধে জটিল। কিন্তু এ-অবস্থাটা স্বল্পকালস্থায়ী হয়েছিল। কেননা, অপরাপর কবির মতো জীবনানন্দের কাছে বিগত মহাযুদ্ধ পরিবেশের সমস্যা হ'য়ে দেখা দেয়নি, দেখা দিয়েছে 'মধ্যম পথে' কণ্ঠগতি হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকার যন্ত্রণায়, 'একটি পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেছে' এবং তার জায়গায় 'আর একটি পৃথিবীর দাবী' স্থির করার কর্তব্য হিসেবে, সর্বোপরি, বেদনার্ত বাংলাদেশের হ'য়ে এবং সবকিছু ছাড়িয়ে মানুষের সৌন্দর্যচেতনার চিরোজ্জীবনমন্ত্রে :

বাংলার লক্ষ গ্রাম বিশ্বাসের আলোহীনতায় স্তিমিত স্থিতির
মুখ অন্ধে ঢ'লে গেলে কেবল মুকেশী অন্ধতায়
খোলা রেখে দিবে আলো—কিন্তু তার মানে ?
আলোহীন হ'য়ে গেছে মানে—কিন্তু তার অর্থ ?
হাত নেই—কোথাও মানুষ নেই ; বাংলার লক্ষ গ্রামের কবিদের
অন্তঃপুরে, শহরের ঘরে ঘরে কুয়াশা পটলচেরা চোখের মানুষী
হাতে গেয়েছিল গান ; ফিরে যেতে নয়।

এখানে 'বনলতা সেনে'র ঘোর কেটে গেছে। ছাড়ে এঁকে, গতানু শোচনায় অবগাহন ক'রে মাঝপথে বিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকার আর ক্লান্তি নেই। যে-পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেছে, যাক ; নূতন পৃথিবী-নির্মাণ কি একেবারেই অসম্ভব ? জীবনানন্দ 'গ্রন্থকে বিশ্বাস ক'রে' পড়লেন, কিন্তু সেখানে কোনো আলোক পেলেন না ; 'বিবর্ণ জ্ঞানের ভাষ্য কাগজের ভাঁজের পাতে আছে।' প্রকৃতির কাছে আশ্রয় খুঁজলেন, সেখানে দেখলেন—হিংসা :

প্রকৃতির পাখাদের পাখনায় মানুষের
ঘৃণার অন্ধ বেগ আলোর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রবল অন্ধ বিদ্বেষ প্রাণীর রক্তে লাল
হয়ে আছে যজ্ঞ যাগ হরিণের শিশু আলো পায়...

নূতন পৃথিবী-নির্মাণে, অতএব, জীবনানন্দ মুহূর্তের প্রেম বা প্রকৃতি কেউই সাহায্য করবে না : 'তের দিন প্রকৃতি ও মানুষের নিকট থেকে সহস্তর ক্রোশ দূরে ছায়ার সাথে চালাকি করেছে।'

আলোকের আশায় জীবনানন্দ মানুষের কর্মযজ্ঞে প্রবেশ করলেন, তাকালেন শিল্পীদের দিকে। কুণ্ঠাচিত্তে দেখলেন, 'কোনো আমলকী নেই আজ আর শিল্পীর নির্জন করতলে।' আরো বৃহত্তর পরিবেশে 'ভোট দিয়ে জন-মতামতে মিলে' গিয়েও মুহূর্তেন 'কোথাও প্রীতি নেই।' চলা না ক'রে অতঃপর তিনি সমাজকর্মীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, সেখানেও উৎসাহ পাওয়া গেল না। তাঁরা সব 'স্টালিন, নেহেরু, মুক, অথবা বাদের বোকা বলে' ডেকেছে ; 'সকল সৈন্যের হয়ে কলরব পাঠালীর ফেলে' ; বৃদ্ধদেব পায়রার মতো মনে হল তাঁদের :

...যাঠে মহাকাশে
কথা বলে জীবনের বিষ ভাঙা ঢেকে ফেলে দিতে চায় ঘাস :
বজ্রাহত তরুর বিষ ভয়োবিক মিশিল কালিজে
কাটাগাছের বেশ অবসর নিয়েছেন।

তবে কি বিপ্লবেই মুক্তি এসে আসান হবে ? জীবনানন্দ স্বীকার করেন :

একাকার হয়ে যিয়ে কাল
সহসা মিলিছে উঠে বজ্রের মতন অনল
অন্ত কোনো সামিতিক রেখা হতে পারে

কিন্তু তাতেও, তাঁর মতে, সমস্যার সমাধান হবে না। কেননা বিপ্লব মানে 'মূর্খ আর কপটীর ভয়াবহ সংঘর্ষ' ; বর্তমান সমাজের ভৌতাবি আর ভাবী সমাজ-পরিকল্পনার মনোভিরাম হৃদয়হীনতার ঘাতিক সংঘর্ষ ; ফলে যে-সমাজ সৃষ্ট হবে তাও তো আজকের মানুষকে কোনো বিশ্বস্ত আশ্রয় দিতে পারে না।

অতএব, জীবনানন্দ অনুধাবন করলেন, নিজের মন ছাড়া কারুর উপরেই নির্ভর করা চলে না : 'পৃথিবীতে নেই কোনো বিশ্বস্ত চাকরি।' আর, যেহেতু জীবনকে অস্বীকার ক'রে জীবিত থাকা অসম্ভব, ঈশ্বরসাধনাও কোনো কাজের

কথা নয়। মৃত্যুহীন হৃদয় আর প্রবহমান ইতিহাসের কাছ থেকে, যারা তাঁর চেতনার শুরু থেকেই অন্তর্লোকে উপস্থিত, জীবনানন্দ বেঁচে থাকার নির্মোহ মৃত্যুঞ্জয় প্রেরণা পেলেন। পুনরায় বললেন

…জীবনকে সকলের চেয়ে ভালো ক'রে
পেতে হ'লে এই অবসন্ন হাত পৃথিবীর সত্তা
আমার, অনন্ত হ'য়ে মিশে যাওয়া চাই।
এতদিন বেঁচে ছিলো যারা।

এই নূতন ক'রে পাওয়া পুরোনো উপলব্ধি নানাভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন। যেমন, 'আরেকটি পৃথিবীর মাটী ছিন্ন ক'রে নিতে হ'লে লাগে সকলের আকাশের মতন বয়স।' জীবনানন্দ যা বলতে চান তা হচ্ছে এই যে বেঁচে থাকতে হ'লে দরকার সচিকুরা আর প্রত্যয়; যে-অভিজ্ঞতা নিয়ে হৃদয় তার মাঠ আর মনের মধ্যে হাজার হাজার সাম্রাজ্যের উত্থান পতনকে অতিক্রান্ত ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই সমর্পণিষ্ঠা। জীবনানন্দের কাছে, এখানে উল্লেখ করা দরকার, হৃদয় সর্বদাই মাটি-আকাশের সংযোগ।

কোথাও পাখির কথা নেই আর, উদ্ভীয়মান নেই।
কেমন নিস্তব্ধ হবে; জন্ম নেবে।
দূর উল্কার সাথে এসেছিলো যেন;
সূর্যাস্তের সাথে চ'লে গেছে।
সূর্য উঠবে জেগে ফিরে ব'সে ঘুমাবে হয়তো।

হৃদয়ের দৃষ্টান্ত সমস্তাকে এড়িয়ে যাবার প্রস্তাবনা নয়, বিস্তীর্ণ মানুষের কানে স্থির এবং সৃষ্টিশীল ক'রে তোলার ইঙ্গিত। ইতিহাসেও জীবনানন্দ অনুরূপ সত্যের সন্ধান পেলেন; 'নব-নব মৃত্যুসহ রক্তসহ ভীতিসহ জয় ক'রে…আছে আছে আছে—এই খোনির ভিতরে চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, প্রীতি, মানুষের বিষণ্ণ হৃদয়…।'

যা ঘটে গেছে তার সঙ্গে যা ঘটছে এবং ঘটবে তার যোগসূত্র খুঁজে না পেলে ইতিহাসবোধ নেহাৎ ফুরফুরে অনুভূতির জন্ম দেয়। এই প্রত্যয়,

অবশেষে, জীবনানন্দকে বিশ্লেষণে সাহায্য করল। লোকহিংসা-রক্তক্ষয়ী সমাজের দিকে তাকিয়ে তিনি এক সহযাত্রী উপলব্ধি করলেন যে আধুনিক মানুষের ব্যবহার যন্ত্রের মতোই নির্মুক্ত এবং যন্ত্রের মতোই প্রাণহীন। কথায় এবং কর্মে সত্যকার আন্তরিকতা না থাকায় তাদের উচ্চারিত প্রত্যয়গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসার শব্দাড়ম্বর মাত্র। আজকাল ধর্মবিজ্ঞান-নীতিশাস্ত্রের অন্তর্গত অনেক গুরুভার শব্দ এবং একাধিক বিমূর্ত সিদ্ধান্ত আমাদের দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনাকে অলংকৃত করে। আমরা অনেক কিছু জানি, মানি এবং বুঝি। জ্ঞানের রাজ্যে আপাতদৃষ্টে আমরা অনেক দূর অগ্রসর। এ-কথা স্বীকার্য, জীবনানন্দ বলেন, অতিরিক্ত বুদ্ধি আমাদের উপকরণ বর্ধিত করেছে, আমাদের মার্জিত করেছে, চতুরালি শিখিয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের সময়, ব্যবহারিক জীবনে, দুর্দিনে-দুর্যোগে, তার নির্দেশ কি আমরা গ্রাহ্য করেছি? করিনি; ফলে, জ্ঞান আজ শুধুই খবর-জানা, জ্ঞান আর কল্যাণকর্মের নির্দেশক নয়। তাই যদি হ'ত, তাহলে পৃথিবীর সাম্প্রতিক হিংসাদ্বেষ রক্তকোলাহলের অবসানে আমরাই স্বচক্ষে দেখে যেতে পারতাম। কেননা, চারদিকের দেশহীন বিরোধবিসংবাদ সত্ত্বেও আমাদের প্রত্যেকের মনে সুপ্তভাবে বাঁচবার সাধ এবং সংকল্প রয়েছে:

> ইতিহাস অবশ্যে। কাদাজল এখনো কালের ভিলায়;
> তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে; মানুষের মন
> জানে জীবনের মানে: সবচেয়ে ভালো ক'রে জীবন যাপন।
> কিন্তু সেই শুরু হয়ে কেন ঘুরে আসে।
> চারিদিকে বিভ্রান্তি অন্ধ ভিড়—অলীক প্রলাপ।
> সময়ও শেষ হ'লে পুরোনো মন মরবার,
> মুছে গেছ হ'য়ে গেলে বন্ধুর মুখের মাংসরেখা;
> মানুষের লালসার শেষ নেই।
> উত্তেজনা ছাড়া কোনো প্রিয় বস্তু নয়
> অন্যের সংগম ছাড়া সুখ
> অন্যের দুঃখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
> নেই।

মানুষ যদি সত্য-সত্যই জীবনকে ভালোবাসে, সৎ সুন্দর সংবাদিক জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষী হয়, তবে কেন এই পৌনঃপুনিক মন্বন্তর, এই অহীন উদ্বেজনা, হিংসার নরমেধ? জীবনানন্দ এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁর মতে আজকের মানুষ শুধু ধনিষ্ঠ সবই শিখেছে, শস্যের অন্তঃসার কি তাকে তার অন্তর্ভূতিতে সঞ্চারিত হয়নি। কর্মের তাৎক্ষণিক প্রেরণা আবেগ। আধুনিক মানুষের হিংসাকর্মের পিছনে যে-আবেগ তাদের আসনে হয়েছে, প্রায়শই তা ক্রুর, বুদ্ধিরহিত। পক্ষান্তরে, আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানলব্ধ বুদ্ধি আবেগের ছায়া পরিবেষ্টিত তথা সক্রিয় হ'য়ে শুভবুদ্ধিতে রূপান্তরিত হচ্ছে না। প্রেমের অভাবে আমাদের জ্ঞান অর্থহীন এবং জ্ঞানের অভাবে আমাদের প্রেম কার্যকরী না হওয়াতেই সাধের সঙ্গে সাধনার এতো বিরোধ, বাচনের সঙ্গে ব্যবহারের :

> আমরা এ-পৃথিবীর মহাধিকার
> কবে আজ ধারা ক্ষুদ্র সংকল্প চিন্তার
> হয়েছি বন্দী কারিগরীর ধূলো দিয়েছে এবং
> নষ্ট করেছি যারা পর তারা অনুদার যাচনের রীতি।
> মানুষের কাছে শুধু অনুভূতিহীন থেকে আলো
> না পেলে বিদ্বেষ হিংসা। বিশ্লেষণ। এলোমেলো বিনাশের পথের কঙ্কাল।
> প্রাণের নিকট থেকে দূরে যাবে।
> অনেক বিজ্ঞান মনে উচ্চাধিকারে শেষে শুধু
> আমাদের এই পতঙ্গের
> বিজ্ঞানে যে সংকলির জিজ্ঞাসার ভিড় শুধু—বেড়ে যায় শুধু :
> তবুও তোমার তার প্রাণ নেই বলে মর্মর
> প্রাণ নেই আজ এই পৃথিবীতে। প্রাণের নিবনে প্রেম নেই।

এ-যুগের সমাজসংকট জীবনানন্দ দাশের কাছে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ব'লে মনে হয়নি, আধুনিক মানুষের মানসিক ভারসাম্যহীনতাই তাঁর কাছে সবচেয়ে ভয়াবহ এবং শোচনীয় ব'লে মনে হয়েছে। 'হৃদয়কে না জাগালে', মানুষের অন্তর্লোকের 'মানব'কে 'ভোর, পাখি অথবা বসন্তকালের সৌরভ সবকে পুনরায় অবহিত করতে না পারলে, কিছুতেই আর

মুক্তি নেই—এই বাণীই তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন ; এবং তাঁর চাইতেও বেশি কিছু, সৌন্দর্য কাকে বলে তার অতুলনীয় নমুনা দিয়ে। সেই সৌন্দর্য শুধু চোখেরই নয়, মনেরও।

বস্তুত, জীবনানন্দ দাশের সামগ্রিক কাব্যসাধনা প্রেম ও জ্ঞানের সমন্বয়-প্রয়াস। জ্ঞান এবং প্রেম, ইতিহাস এবং নারী, স্মৃতি এবং সাধ—তাঁর কাব্যে একান্ত, অবিচ্ছেদ্য এবং সমার্থবাচক। প্রেমই, তাঁর মতে, মহৎ মনুষ্যকর্মের উদ্দীপক, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়তা। এই বোধ যেহেতু জ্ঞানের সঙ্গে অদ্বয়, তাই, যৌন একাগ্রতার চাইতে বিস্তারিত, জীবনানন্দ-কথিত নারীরা কদাচিৎ রক্তমাংসের, এই বোধ মনে হয় জীবন-ও-জগৎ-লীন হ'য়ে থাকার অনুভূতি, মাটির সঙ্গে আকাশের সঙ্গে একাত্ম অভিভূত হ'য়ে থাকার বিমিশ্র মরমী আনন্দ। যে-অন্ধকারের দিকে জীবনানন্দের কবিতা আমাদের টেনে নিয়ে যায়, সেটা আমার কাছে তাঁর কবিতার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ, তাও এই প্রেম-প্রজ্ঞার মিশ্রিত-বোধ। 'নিঃস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রির মাঠের মতো', 'নিবিড় ঘাসমাতার শরীরের সুঘ্রাণ অন্ধকার', 'অন্ধকারের চকচকে বিরাট সফরি যেমন উল্লাসে', 'একান্তের অন্ধকারে অন্তর্হিত', 'মহাসুন্দর ঘাসে অন্ধকার', 'স্নিগ্ধ আঁধার', 'অন্ধকার সমাস্তরে ডুবে যাওয়া—কিন্তু মরণের ঘুম নয়', 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা', 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'—ইত্যাদি পংক্তির ইঙ্গিত, জীবনানন্দের ভাষাতেই বলতে গেলে, 'বাইরের জীবন থেকে সত্যিকারের জীবনে পালিয়ে যাওয়া', যে-জীবন অন্তর্লোকের অনুভূতিময়, 'উজান সময়স্রোতে' ভেসে থাকার চেতনার সৎ, সাধু এবং সুন্দর। এই জীবনের স্বাদ না পেলে মহৎ মানুষ এবং সমাজ সৃষ্টি অসম্ভব।

আর, জীবনানন্দের কাছে জ্ঞান মানে পূর্বাপর সমগ্র মানবজাতির কর্মসাধনার আবহমান ; স্থূল এবং নয়, বরং ধূসর পাণ্ডুলিপি ; কখনো বা কতিপয় মেধাবী মনীষীর মুখাবয়ব। এটা ঠিক সুস্পষ্ট ইতিহাসচেতনা নয়, কেননা ইতিবৃত্তের প্রতি তাঁর কোনো হিসেবী উৎসাহ নেই, কিন্তু সেটা ইতিহাসের অন্তসার, একটা অন্তরস্রোতের শাশ্বত যাত্রীর বেদনা, একটা যোনিচক্রস্মৃতির

প্রকাশ, উত্তরাধিকার বোধ—জীবনানন্দের কাব্যে তা প্রথমাবধি উপস্থিত। মৃত্যে মর, আক্রমণে নয়, আমার ভালোবাসাকে 'সকলের ভালো ক'রে জীবনযাপন' সম্ভব। স্বভাবতই দুর্যোগের দিনে জীবনানন্দ আমাদের প্রেমিক হ'তে উপদেশ দিয়েছেন, বিশ্বাস রাখতে বলেছেন 'জীবনের মৃত্তিহীন প্রগতিশীলতা'য় :

আমাদের আশা ভালোবাসা যারা চারপাশে সুখের মতি
চিন্তা বুদ্ধি চালনার পুতুলি রয়েছি হাতালো ইস্পাত
খানিকটা আলো উল্লাসতা পাতি চায়।

জলের মরণশীল অন্ধকার ওমে
উল্লাসের চেতনাকে সর্বদাই উত্তরের দিকে রেখে
মনুষ্যত্বে সবচেয়ে পাস হ'তে হ'লে
আমরা অস্তিত্বে মূল্য পেতে চাই—প্রেমে।
পৃথিবীর ভয়াই যাদের তারা লোকসান
লোভ পড়া উদ্ভিদ কুষ্ঠ ঘুণ ঘলিত আমিষ গন্ধ ফেলে
সবচেয়ে মনুষ্যত্বে যারা-যায় মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে হ'লে।

এত বড়ো প্রেমিক, আস্তিক এবং সত্যবাদী কবি আমাদের দেশে অল্পই জন্মেছেন।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা

সরোজ গুহ

'শ্রেষ্ঠ কবিতা' ছাপা হ'ল যে মাসে, অক্টোবরে জীবনানন্দ চ'লে গেলেন। তাঁর কবিতা গোড়া থেকেই অভিনব ছিল, এবং বিস্ময়করভাবে পরিবর্তনকামী। আমাদের মতো যাঁদের বয়স আজ তিরিশ ছুঁয়েছে, কি ছোঁবে, তাদের মনে গত দশ বারো বছর ধ'রে সব চাইতে বেশি গুরুত্ব ক'রে দিয়েছে তাঁরই লেখা নানা পংক্তি, উপমা আর অপ্রত্যাশিতভাবে বিন্যস্ত সব কথা। শুধু যে পড়া পেয়েছি তা নয়। পড়াও পেয়েছি, আবার নিজেদিবিশেষ কবিতাবোধ প্রকাশ করতে গিয়ে কতো সময় অবাক হ'য়ে দেখেছি জীবনানন্দেরই কোনো-না-কোনো লাইন বেরিয়ে এসেছে মুখ থেকে। আধুনিক কাব্যের ধরণায় এক দুর্ভেদ্য জটিলতার আভাস অথচ আশা নিয়ে বাড়াতেন আমরা অভ্যস্ত। সে-জটিলতার চক্রান্তকে একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন জীবনানন্দ—অর্থাৎ, দশ বারো বছর আগে পর্যন্ত যেসব কবিতার প্রেমে পড়েছিলাম আমরা। সরল, অথচ তরল নয়; ভাবালুতার লেশমাত্র নেই কোথাও—যে-কারণে বহুল অনুকৃতি সত্ত্বেও জীবনানন্দে প্রীত কানে-সুরের সংখ্যা বস্তুতই কম। সেই আমরাও অনেকে থমকে গিয়েছিলাম তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতায় এসে। থমকে হয়তো তিনিও গিয়েছিলেন। দুর্বোধ্যতার অভিযোগ করলে তাঁর চোখে-মুখে সেই বিখ্যাত জীবনানন্দীয় কৌতুকের চাপা হাসি দেখা দিতো—যে-হাসি কোনোদিন ভোলবার নয়। দুর্বোধ্য লাগতো, কিন্তু হাল ছাড়তুম না। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আর 'বনলতা সেন'—'এক পয়সায় একটি' সিরিজের আদি সংস্করণে খাকি রঙের ছোট্ট, চটি বইটি—যিনি কিনে নিয়েছেন আমাদের—তিনি আমাদেরও জানাতেন যে অন্য কোনো প্রবেশ্য পাঠকের জন্য রচনাতীত দুরূহের গভীরতর কাব্য রচনা করছেন ব'লে স্বীকার করতে ইচ্ছে করত না। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র তাই একসঙ্গে এত রচনার সংকলন পেয়ে উৎফুল্ল হয়েছিলাম। আশা করেছিলাম যে পূর্বাপর কবিতার মধ্যে

নিজেকে বিবিধ করতে পারলে তাঁর শেষ লেখার সঙ্গে আগেকার লেখার কিছু সাদৃশ্য নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। আমার সে-আশা বিফল হয়নি। শেষ পর্বের অন্তত কিছু কবিতার মধ্যে নিজেকে আমি প্রবেশ করাতে পেরেছি। তাঁর শেষতম কবিতাবলীর পাণ্ডুলিপিটিও সম্প্রতি আমার দেখবার সুযোগ হয়েছে—যে-সব কবিতাকে সংশোধন—তাঁর ভাষায় 'পরিশোধন'—করবার সময় আর তিনি পাননি। যদিও এ-সব রচনা আমাকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আর 'বনলতা সেন'-এর সম-পরিমাণে আকৃষ্ট করেনা,—তাহ'লেও বলতে পারি কান-মনকে অভ্যেস করিয়ে নিতে পারলে এ-কবিতাগুলিও আগের মতোই মধুর হ'য়ে উঠবে। এবং বার-বার সে-সব কবিতা পাঠ করার পর আমার বিশ্বাস হয়েছে যে কাব্যের একটি মহত্তর পর্ব বিবর্তিত হ'য়ে উঠতে-উঠতে অসময়ে থেমে গেল। জীবনানন্দ চ'লে গেলেন। অন্তপর্বের রচনাবলী অবশ্য অনেকের কাছেই এখনো

> যখানে কবির মতো— তবু [ত . সন্ধ্যায় ফেরে ডানাওয়ালা পেঁচা
> বেরিয়ে সে নিশ্চয়তাকে কিছু ঘুটেছে চাঁদে চাঁদে—

তাহ'লেও, মনে হয়, আদিপর্বের নিবিড় নির্জন নিসর্গনিকেতনে বহুকাল কাটানোর পর, মানবত্রাণের এই তৃতীয় অঙ্কে দিনের আলোর সমাজসংসারে যদি তিনি প্রবেশ না করতেন, এ-যুগের বেদনায়, ক্লান্তি, জিজ্ঞাসায় অন্ধকারে তাঁকে যদি পথ হাৎড়াতে না দেখতাম তাহ'লেই বরং নিরাশ হতাম আমরা। অভিযোগ থেকেই যেতো।

এ-যুগের পক্ষে অত্যাবশ্যক এক সৎ-কবির জীবন তিনি যাপন ক'রে গেলেন। আমাদের জ্যেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অনেকেই প্রাবন্ধিকও। গল্পে উপন্যাসেও তাঁদের কারো কারো প্রতিভা সমান উৎসাহী। জীবনানন্দ শুধুই কবিতা লিখেছেন, কবিতা ছাড়া আর কিছুই লেখেননি। তাঁর যে দু-চারটি প্রবন্ধ সাময়িকপত্রের পাতায় প্রক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে সে-ও একরকম কবিতাই, তাঁর কবিতারই মতো বিশেষ একধরনের গদ্যে লেখা। এবং কবিতা লিখতে ব'সে উদ্যমতম কবিও ক'রে যেতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁর গদ্য-

কবিতার কথা মনে রেখেই এ-কথা বলছি। আসিতেছে, কাটাছেঁড়া, ভাঙিবার, কহ, করিবে,—এ-ধরনের ক্রিয়াপদগুলির অনর্গল ব্যবহার তাঁর কবিতায় দোষ না হ'য়ে বৈশিষ্ট্য এবং আকর্ষণ হ'য়েই দেখা দিয়েছিল।

তাছাড়া এ-যুগের আধুনিক নগরবৃত্তিকে আমরা একরকম সবাই যেমন ঘেন্না দিয়েছি, তিনি তাকে বরকাল আমল দেননি। এদিকে যখন ছাপা হচ্ছে খাঁটি নগরজীবন নিয়ে লেখা সমর সেনের চতুর্থ পুরোদস্ত দশ কবিতা, জীবনানন্দ লিখছেন ঘাস, হাওয়ার রাত, ঘুমো ঘাস, শঙ্খমালা। বরিশালে জন্ম, বরিশালেই জীবনের প্রধান অংশ কাটিয়েছেন। কলকাতার আকর্ষণ একেবারে যে ছিলো না তা নয়, সেদিকে বরং এই জলবোলে-বেহালে-ইস্পাতে হাল-ধরানো, এবং তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের কলকাতাকেই তিনি আশ্রয় করেছিলেন। কিন্তু এ-আকর্ষণ সেই রকমের যা দুই বিরুদ্ধের মধ্যেই শুধু সম্ভব।

নিতান্ত শেষ ক'বছরের ছাড়া তাঁর প্রায় সব কবিতাতেই তীক্ষ্ণ এবং প্রগাঢ় প্রত্যক্ষতা নিয়ে গ্রাম-বাংলা উপস্থিত—বরিশালের, কখনো আসাম-অঞ্চলের আরসিতে যে পল্লীপরিবেশকে তিনি চিনেছিলেন। বাঘো বরিশালের লালঘাটা বটও তাঁর কাছে যে অন্যথা এক কৌতূহলের বিষয় ছিল, অন্ধকারে একা-একা মাঠে পায়চারি করতেন আর তারা দেখতেন, কবেকার কোন সূত্রে তিনি যে কিছুকাল আসামের অরণ্যে বাস করেছেন কিংবা তাঁদের বাড়িতে যে ঘরের বেরালে-বেরালে অসংখ্য শিকারের ট্রফি—বাঘের চামড়া, হরিণের শিঙের ধূসর পাণ্ডুলিপি—ঝোলানো ছিল, এ-সব কথা জানাটা কবিতার উপভোগ বাড়ায় না বটে, কিন্তু শিল্পীমনের বিশেষ প্রবণতার কিছুটা হদিস উদ্ঘাটন করতে পারে হয়তো। নেহাৎ তালিকা করলেও দেখা যাবে, বাংলাদেশের গাছপালা, ফল, পাখি, জীবজন্তুর এত নাম আর কোনো কবির রচনাতে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা সন্দেহ। নিবিড় বটের নিচে লাল লাল ফল প'ড়ে থাকে জীবনানন্দের কবিতায়। হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি খেলা করে, বহুদূর পাতাঝরা জিওল গাঁয়ে শিশিরে পালক ঘসে পাখি; সোনার বলের মতো সূর্য আর রুপোর জিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত দুই

শিমুলের গায়ে ব'সে একা পেঁচা দেখে, জলদাই অরণ্যের পারে পাহাড়ের মেঘাবী নীলিমা : কোনোকিতে ক'রে যায় অন্ধকারে আকন্দকুসুম। এ-সব 'ফুলুল সাঢ় লহাচার' আমরা ইতিপূর্বে আর কারো কবিতাতেই পাইনি। অনেক শিরীষের ডাল, অশথের চূড়া, সুন্দরীর অর্জুনের বন, বাবলার গলির অন্ধকার, শাল পাশের নিবিড় মাথা, উঁচু উঁচু হরিণখি গাছ, আর নিম আম বাউ শিরাল শিরালশাল আমলকি শিমুল দেবদারু—ভিড় ক'রে আছে। তলায়—কণিমনসার ঝাঁটা, আদিবের বন, পরকাশ হোগলা মাঝে মধুকুপী ঘাস। কান পাতলেই প্রতিধ্বনি শব্দহীন এক অরণ্যের মর্মর শুনতে পাই যেন, ঝর ঝর ক'রে গায়ে মাথায় রাশি রাশি হলুদ হেমন্তের পাতা ঝ'রে পড়ে। আর এই জীবনানন্দীয় অরণ্যপ্রকৃতি অসংখ্য প্রাণী পাখি কীটপতঙ্গের আনা যাওয়ার সতত চঞ্চল, গাছের শিছক উঠানে, অপচয়ে, আদরে মুখরিত হচ্ছে : ঘুঘুখুরে অন্ধ পেঁচা, একা পাতরা, অবিরল শালিখ, সোনালি চিল, কাকাতুয়া, মাছরাঙা, ভরদিপি কিংবা হুতুম পহুম। সন্ধ্যার আঁধারে ঘুমের ঘ্রাণ-পাওয়া হাঁস—পুকুরপাড়ে : ফটিক-পাখনা-ঢেলা বোলতা—নীলিমায় : পাখা ঝড়—নীল ছাওয়ার সমুদ্রে। শিকারীর গুলির আঘাত এড়িয়ে জ্যোৎস্নার মুনো হাঁস উড়ে যায়। আরো আছে। পশু-সাজানো অলংকার হিসেবে নয়, অবয়ব হ'য়ে কবিতায় মিশে কেননা কাঁচপোকা, গঙ্গাফড়িং, চড়ুই বোলেল ঝিঁঝিঁর কথা বাই হোক, বাড়ি আর নীল মথা, পাটকিলে জানা চিল, তাতা ভিম, মাকড়ের ছেঁচা জাল, পুরোনো পেঁচার গ্রাণ অথবা বাতাসের ফাঁস দিয়ে কবিতার ঘাড়ে ধরে 'শোভাবর্ধন'—সেটা করার কথা কল্পনা করা যায় না। হয়তো 'সিংহের ঘাসের ঘুমের পাণ্ডুলিপি' (বিষাদ ক'রে পড়া গ্রন্থ থেকে এসেছে ?) অথবা 'চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শাল' সৌখিন কল্পনাকে সুড়সুড়ি দেবে ; 'মধুর অলের ঝিনুক পথর, নীলগাই, হরিণের ছায়ার আনা-যাওয়াটাও মনে হ'তে পারে অনেকি রোমাঞ্চ দেবা। কিন্তু সেয়াল ? পাখা ? বেউল, বিড়াল, মহীনের ঘোড়া আর মাইদ্রিদি ? সামুদ্রিক কাঁকড়া, গলিত স্থবির ব্যাং আর ঘাটা মাছ ? এরা সব বিশেষ নিয়মের প্রয়োজনেই জীবনানন্দের কাব্যে প্রবেশ করেছে। পাসপোর্ট আছে।

শুধু উল্লেখ নয়, জীবনানন্দীয় উপমার ঐশ্বর্যও জীবনের গার্হস্থ্যালয় জগৎ থেকে সংগ্রহ করা। মনের সূক্ষ্মের তারতম্যের কথা বলতে গেলেই বাংলা ভাষায় লেখকের অসহায় অবস্থা। জীবনানন্দের বীক্ষণী দৃষ্টিতে তার চমৎকার সমাধান করা পড়েছে। তাঁর কবিতায় আকাশ কখনো 'মানুষের সমুদ্র নীল জানোয়ার' রঙের, কখনো তা কোমল নীল 'ঘাস কড়িংয়ের পেটের মতো'। লালই যা কত রকমের : 'নদীর জল মটকা ফুলের পাপড়ির মতো লাল', চোখের লাল হিজলকাঠের রক্তিম চিতায় (উপভোগ করতে হ'লে কাঁচা হিজলকাঠের চাল ছাড়িয়ে দেখতে হয়)। রোদ্দুরের রঙ কখনো পালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো, কখনো তা হ'য়ে ওঠে কচিলেবুর পাতার মতো নরম সবুজ। পেয়ারা-আর নোনা গাছের সবুজ আমার চিরায় পালকের মতো। প্রেমিক চিনপুকুরের শিশিরভেজা চোখের মতো ঝলমল করে নক্ষত্র : দেখার দৃষ্টি চাই, সৌখিন কল্পনার কর্ম নয়। আতার ঘুসর কীরে গড়া মূর্তির মতো ধবল চিতল হরিণীর ছানা অথবা বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ দেখবার মতো দৃষ্টি কখনো শহরে জন্মায় না।

আশ্চর্য হ'তে আবিষ্কার করলাম—গাছ যোগাড় মাঠ প্রান্তরের এই বিশাল রাজ্যে ফুল নেই—কচিৎ মোরগফুল, মটরফুল, দু-একটা শালুক আর শাদা মটা সেফালির বিরল উল্লেখ ছাড়া। ফল আছে, তাও সামান্য : তরমুজ-মধু আর নূপ নাশপাতির গন্ধের কথা আছে এক কবিতায়; সোকসানি বাজারের বাজের আস্তাকুলও পাওয়া গেল। বাকি থাকে শুধু বেতফল ('তোমার চোখের মতো ম্লান বেতফল'), আমিই পুকুরের সিঙাড়ার ফল (পানিফল বললে আরো চেনা লাগবে), আর দু-একটা নই শাদা পদ্ম। অথচ বার-বার ঘুরে-ঘুরে যে-জিনিসের কথা জীবনানন্দের কবিতায় আসে তা ফল নয়, ফসল : গোধূম, ধান, ধান। ধানের গন্ধ বলতে তাঁর জুড়ি নেই। এ-গন্ধ হেমন্তের মিঠে রোদ্দুর থেকে এসেছে।

জীবনানন্দের কবিতা পড়তে-পড়তে অজান্তে কখন আমরা সেই ফলন্ত হেমন্তের প্রেমে প'ড়ে যাই। ভেবে অবাক লাগে—কবির সোনার কৌটোতে আমাদের প্রাণের হৃদয়টি যদিও বাঁধা আছে তাহলেও ফলন্ত ধানের জন্য

হেমন্তের গাথা বাংলা কবিতায় এরকম ব্যতিক্রম বললেই চলে। শুধু কি মৃত্যুর? সত্যের, সত্তের, আলস্য পূর্ণতা বিষাদের করুণতামাখা সাবলীলতা শুধু হেমন্ত। বাংলা কাব্য বর্ষার স্তুতিতে, বসন্তের বন্দনায় মুখর। এবং সে-দুটি বিখ্যাত শুধুই—বিখ্যাত আরো অনেক কিছুর মতো—জীবনানন্দের কবিতায় অনুপস্থিত। হেমন্তের গভীর গভীর রূপ কীটস-এরও প্রাণ ভুলিয়েছিল। শেষ পর্বে জীবনানন্দের কাব্যে যখন রূপান্তর ঘটেছে, হেমন্ত তখনো তাঁর উপকরণ হ'য়ে ছিল, তার ব্যবহার যদিও তখন ভিন্ন। হেমন্ত প্রথমত সত্যের, তৃপ্তির, বিরতির :

হেমন্তের ঘাস ওঠে ফলে—
দুই পা ছড়ায়ে বোসো এইখানে পৃথিবীর কোলে।

গর্ভবতী জননীর মতো সে :

আমি সেই দুধকরীদের দেখে লই—ঘুরে আসে ধরণীর এ-পারে
ফিরে যাই—রূপ ধরে পড়ে তার
শীত এসে যায় ক'রে দিয়ে যাবে তারে।

মৃত্যুর মুখোমুখি নিয়ে মৃতের শিয়রে সে দাঁড়িয়ে থাকে; সত্যতার সংকটের কথা ভাবতে গিয়েও মনে হয় হেমন্ত তার প্রতীক। আবার শেষ দিককার কবিতায় তা প্রতীক হ'য়ে উঠেছে সত্যতার যে ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি, সম্ভার—তার :

হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে;

কোথাও বা সৃষ্টির অন্তরঙ্গ রহস্যের সঙ্গে বিজড়িত করেছেন তাকে :

আজকে মানুষ আমি শুধু তো—সৃষ্টির অন্তরে
বৈষয়িক স্বপ্নদের সুখের ফসল;

হেমন্ত আসলে একই কালে জীবন-মৃত্যু, সত্যতা-সংকট, পূর্ণতা আর বিনষ্টির একান্ত প্রতীক। জীবনানন্দের এই হেমন্ত-দৃষ্টি থেকেই অনুমান করা যায়, অন্তর্বাহিত সংসারের রূপ রক্ত সফলতা গ্লানি আনন্দ আর পাপ তাঁকে সাময়িকভাবে ব্যাকুল উদ্যোগ এবং অস্থির ক'রে তুললেও নিস্তেজ নিষ্প্রাণিতের

অনবলম্ব হতাশা শেষ পর্যন্ত কখনোই তাঁর নাগাল পাবে না। তার আংশিক প্রমাণ 'শ্রেষ্ঠ কবিতার' শেষ দিকের পাতায় উপস্থিত।

তবে একটা কথা ঠিক। মানুষের কিংকাতর সমাজের অনভ্যস্ত পরিবেশে জীবনানন্দ শেষ্টতই অপ্রতিভ বোধ করেছিলেন। অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আদ্যন্ত শিবিরে মানবী অবস্তরের সুগভীর গৃধিনী এবং হায়েনারা অতদিনে বাংলা-দেশে ইতস্তত বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীতে বিকেলের ছায়া। 'অন্ধকারে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস কেবলি নিবিড় হ'য়ে যায়'।

> এ-মুখে কোথাও কোনো আলো—কোনো আত্মিক আলো
> চোখের গভীরে নেই মানুষের। নেই তো নিশ্চিত অন্ধকার
> মানুষ মায়ের মতো :

যে-অন্ধকার এসে 'মানুষের বিহ্বল দেহের সব ঘোর' প্রক্ষালিত ক'রে দেবে। নেই, নেই। হেমন্ত ফুরোয়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে।

> অথবা সাধারণ লোক বেঁচে থেকে স্বাভাবিক ভাবে পথ দিয়ে
> কি ক'রে তাহলে তারা এরকম বিশ্বাস পাবেনে
> হৃদয়ের জল পরিষ্কার দিয়ে যাবিয়ে দিয়েছে !

চুয়োপের এমন নিকটে থেকে আর তাকে উপেক্ষা করবার মতো সাধ্য জীবনানন্দেরও ছিলো না। এবং তাঁর মতো জীবনবিহ্বল কবির গলাতেও এই প্রথম তির্যক বাঙ্গের সুর লাগলো, প্রকট হ'য়ে উঠল সেই বিদ্রূপের দিকে আকচোখে তাকানো জীবনানন্দীয় কৌতুক-প্রবণতা, নিঃশব্দ অট্টহাসির মতো একবার কেঁপে উঠে যা আমাদের চমকিয়ে দেয়। এ-কালের কবিতায় তাক ছিল যখন চিত্তল হরিণীর জায়গা নিয়েছে সোমেন পালিত, সুবিনয় মুস্তফী, অরুণেশ ত্রিবেদী ; বেচিত ব্রেটের ইহুদী রমণী, খামে ঠেস দিয়ে লোল নিগ্রো, আধো আইবুড়ো তিমিরি আর শাকচুন্নির মতো তিখারিনী ('একদিন হাস ছিলো হয়তো বা, এখন হয়েছে হাস হাঁস !') ; কেঁসে-যাওয়া হাইল্যান্ড থেকে কুইন্সোপী জল চেটে নেয় এখানে, যাতাস বিস্তর চিনেবাদামের মতো, মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরণময় বিকেল ; স্থির পেট্রল থেকে মোটরকার গাড়লের মতো

কেমন হারিয়ে যায়। আর দিকে-দিকে লক্ষ্যহীন অবাচীনের উদ্বাস্ত ব্যস্ততা শুধু, যেন

কোথাও পথের বাঁক একটি মিলেছে হবে—মনে হয়,
জলের মতন যাবে।

তাই ঊর্ধশ্বাস সকলে, যদিও 'অনির্বচনীয় ছুটি' একজন দুজনের হাতেই শুধু রয়েছে আজকের পৃথিবীতে।

বেটি সব মানুষেরা অন্ধকারে বেদনার অধিক পাতার মতন
কোথাও নদীর পাশে উড়ে যেতে চায়।

বুঝতে পারি জীবনানন্দ এতকাল পরে শহরে এসেছেন, এসেছেন তাঁরই মন-প্রাণ নিয়ে। কিন্তু প্রথমে কৌতূহলির তিনি পূর্বেও ছিলেন,—দাশকাটা ঘরের অন্ত পৈঠা মনে পড়বে ;—সে-কৌতূক তখন তাঁর নিজেকেও লেগেছে, সেখে সাধ মেটাচ্ছেন তিনি, যেন প্রাণের রস মেখে কৌতূক করছেন। তার মধ্যে বিদ্রূপের জ্বালা ছিলো না। সে ছিলো আর এক পৃথিবীর কথা, যে-জগতে ফিরতে হ'লে এ-যুগের জীবনানন্দকে 'সত্তেরো বছর আগেকার লেখা' শোধন ক'রে সাধ মেটাতে হ'ত। এখন যখন যুগান্তের কিমাকার মানুষগুলোর কথা ভেবে তিনি লেখেন :

মাঝে মাঝে পুরুষার্থ উদ্বোধিত হ'লে
(এ রকম উদ্বোধিত হয়।)
উপন্যাসিকার মতন
আমাদের চারের সময়
এসে প'ড়ে আমাদের ঘিরে ধ'রে বসে।

কিংবা বলেন

শুধু অন্ধকারে আমরা—অতীতবর্তিক
বহুত তাপের পরে জন্মেছিলাম।

তখন সেখি কণ্ঠে করুণার আবেশ মাত্র নেই, বন্ধুতা না, কান্নাও না। সেখি ক্রোধ, তীব্র বিদ্রূপ, ভর্ৎসনা।

পরে আরো গভীরতর জিজ্ঞাসায় তিমিরে নেমে পড়েছিলেন, সপ্রশ্ন তাকিয়েছিলেন সমাজের সত্যতার অন্তিম লক্ষ্যের দিকে, তাঁকে বিচলিত করেছিল অনন্ত ক্ষতি কত মৃত্যুান্তে ধ্বনিত, তথাপি অক্লান্ত, যে প্রাণরস তার আজন্ম তৃষ্ণা নিবারণ করে। চিরন্তনের ঐশ্বর্যের পরিবর্তে তারা শাঁখা-পরা শূন্য হাতের মতো এ-যুগে নিরলংকার হ'য়ে এসেছে, উপমায় মণিমাণিক্য নিয়ে খেলা করার মন নেই :

পথ চিরে এ-যুগের নিজের মনের চিহ্ন রেখাতে এলাম।
তাতে শুধু?
পৃথিবীকে। আকাশকে। আকাশে যে সূর্য জ্বলে তাকে।
ধূলোর কবিতা অণুপরমাণু ছাড়া সৃষ্টি জলকণিকাকে।
এখন এখন যাই তার আকাশের পৃথিবীকে।

— —

কেন আসো। মাছিদের ওড়াউড়ি।

———

হে মাছিরা, হে মাছিরা, তোমার তোমার মাংস খুঁজতে সঙ্গ ক'রে শুধু?
বেছিলম, বিয়েছে, মিশর, চীন ইরান আফ্রিকা থেকে ঠেলে
অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চ'লে যাও—ধুলো তোমা :

দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার মীমাংসা আমরা কবির কাছে কখনোই প্রত্যাশা করি না। তবে চিরকাল যে-সব প্রশ্নচিহ্ন সপ্তর্ষির মতো মানুষের প্রাণে প্রজ্বলিত রয়েছে, তা আর এক পৃথিবীর আর এক পরিবেশের কবিচিত্তেও স্পন্দন জাগাবে—সেটা স্বাভাবিক। মানুষের জন্ম মৃত্যু কর্মফল, জীবনের এষ লক্ষ্য, আর সত্যতার পরম উদ্বেগকে কেন্দ্র ক'রে সেই অনাগত প্রশ্ন আবর্তিত হয়। ইয়েটস তাঁর শেষ কবিতায় বলেছেন :

Cast a cold eye
On life, on death.
Horseman, pass by!

প্রায় একই কথা বলেছি জীবনানন্দের শেষ লেখায়। তিনি যেন মৃত্যুর নাড়ির উপরে হাত রেখে বুঝতে পারছেন

অনন্তর যেদনার সাথে মিশে হ'য়ে গেছে অমোঘ আঘাত

প্রাণের সার্থকতা অনন্ত মৃত্যুর হাত ধ'রে চিরকাল এগিয়ে চলার মধ্যে। ফুলের বিছানি থেকে ছত্রাকে ঘুরে-ঘুরে বিশ্বের সৃষ্টিকাণ্ডের সঙ্গে পা মিলিয়ে চ'লে যেতে হবে—যে-কাল প্রাণ টিঁকে আছে পৃথিবীতে, রাঙা রৌদ্রে স্ফটিক পাখনা মেলে যতকাল যৌনতার ডিঙ্গি উড়ে যাবে।

'আরো আরো আরো' এই যোষিৎ চিত্তের
এলেবে একত্র, রাত্রি, সিন্ধু, প্রীতি, মানুষের মিলে হৃদয়—
এর অন্তর্দূত, অন্ধ, অনন্ত আত্মপোষণ জয়।

আর এই চলতে-চলতে যখনের মিলিত সংসারকে বিন্যাস ক'রে নিতে পারবে হৃদয়ের সেই অমোঘ শুভ, যার সাধনা মহাপুরুষেরা চিরকাল ক'রে গেছেন :

গীতা : অস্তিম শুভ, অন্তরীন মনুষ্যের আলো

হেমন্তের দৃষ্টিতরা কবির কণ্ঠস্বরটিই আমরা শুনতে পাই যেন। ক্রোধ নয়, বিক্ষোভ নয়, ঔদাসীন্যও নয়, প্রেম প্রীতি করুণায় স্নিগ্ধ হ'লে তাঁর শিল্পচৈতন্য মহত্তর সৃষ্টির জন্য তৈরি হয়েছিল।

• জীবনানন্দ দাশের শেষ কবিতা : বাসনা ৭১

জীবনানন্দের জগৎ

অশোকবিজয় রাহা

জীবনানন্দের কবিতায় কুয়াশা-ঢাকা এক ধূসর জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। ঠিক সন্ধ্যার পরিচয় নয়, আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত মন এখানে এসে কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, অর্ধ-চেতনার অস্পষ্ট আলোকে এখানকার সব-কিছুই অন্তরঙ্গ ব'লে মনে হয়, পরিচিত বস্তুগুলিও চারদিকে রহস্যঘন হয়ে ওঠে, অথচ এদের অস্বীকার করতে পারি নে, আপাতদৃষ্টিতে এরা যতই অস্পষ্ট, তবু এদের মধ্যে এমন একটি গভীর সত্যের ইঙ্গিত পাই যাকে আমাদের একটি মহৎ প্রাপ্তি ব'লেই মনে করি।

এই অর্ধ-পরিচিত জগৎটি সত্যই যতো বিস্ময়কর : এখানকার জল-স্থল-আকাশে যেন একটা প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘ'টে গিয়েছে এখানে বস্তুপ্রতীতি আছে অথচ বস্তুতার নেই, বস্তুর গাঢ়তা আছে কিন্তু কাঠিন্য নেই ; এ যেন অস্ত-আকাশে ছেয়ে-ওঠা একটি গোধূলি-মেঘের জগৎ—কোথাও জমাট বেঁধেছে, কোথাও এলিয়ে পড়েছে, কোথাও ঝ'রে গিয়েছে, আবার কোথাও বাষ্প হয়ে উ'ড়ে যাচ্ছে ; রূপের বৈচিত্র্য, রঙের খেলার অন্ত নেই, অথচ সব-কিছু থেকেই ঝরছে ম্লান আলোর করুণ বিষণ্ণতা, যেন এরা ফুটে উঠেছে মিলিয়ে যাবার জন্যেই, এরা কেবলি রূপান্তরিত হচ্ছে : একটি আকারের সঙ্গে আরেকটি আকার মিশে যাচ্ছে, একটি রঙের সঙ্গে আরেকটি রঙ মিশে গিয়ে দেখতে-দেখতে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, অথচ অনুভব করছি, এদের সঙ্গে আমাদের চেতনার কোথায় যেন একটা মিল আছে, এদের সত্তার সঙ্গে কোথায় যেন আমরা একাত্ম তাই আমাদের সত্তাকেও এরা আস্বাদময় ক'রে তুলেছে।

কী ক'রে এ হয়, সে এক আশ্চর্য। শীতের সন্ধ্যায় নির্জন হ্রদের বুক থেকে কুয়াশার সূক্ষ্ম বাষ্পরেখা উঠে যেমন চারদিকের পাহাড় ও বনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে মিলিয়ে থাকে এবং শেষে হ্রদ, পাহাড়, আকাশ সব ঢেকে একাকার ক'রে দেয়—জীবনানন্দের কবিতা পড়তে-পড়তে আমাদের চেতনাও তেমনি প্রথমে একটু

একটু ক'রে সূক্ষ্ম অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হতে থাকে এবং পরে এক প্রগাঢ় অনুভূতির ঘন বাষ্পে সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। তাঁর ভাবকল্পনায় বিচিত্র ইঙ্গিতগুলিকে অনুসরণ ক'রে আমাদের মন ধীরে ধীরে চেতনার এমন এক সূক্ষ্ম প্রান্তে মিলে যায় যেখানে সত্য জগৎ ও চৈতন্যলোকের ভেদরেখাটি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেখানকার মুদ্রিত আলোকে আমরা আমাদের সত্তার মধ্যেও এ-দুটি জগতের আদিম আত্মীয়তা অনুভব করি। এ যেন চেতনে-অচেতনে-মেশানো এক ত্রিমিত-উজ্জ্বল বাষ্পলোক,—এক আদিসৃষ্টির নীহারিকা যা বর্তমান কালের পূর্ণপ্রকাশিত জগতের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করছে; কবির নিগূঢ় ধ্যানে সে ধরা দিয়েছে এবং সেখান থেকে তার মৃদু আলো বিকিরণ করছে:

পথ যায় মাঠের ভিতর
আরো এক আলো আছে: দেহে তার বিকেলবেলার ঘুমঘোর।
চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো ধরে আছে ধীর
পৃথিবীর কল্পবতী ফেলে দিয়ে সেইখানে পায় চাঁদ ঘুমের শরীর।

'পৃথিবীর কল্পবতী' সত্যই সেখানে 'চাঁদ ঘুমের শরীর' পায়, এবং তার দেহেও মিশে থাকে সেই 'বিকেলবেলার ঘুমঘোর'। এখানে কবি তাঁর রহস্যময় উপলব্ধিটিকে অতি আশ্চর্যভাবেই প্রকাশ করেছেন: চাঁদ যেখানে ঘুমন্ত সে-জগৎ আমাদের অবচেতন মনেরই কাছাকাছি, তাই এই বিশেষ প্রতীক ও ব্যঞ্জনার সাহায্য কবি তাঁর অনুভূতিটিকে আমাদের মনে প্রায় সত্তার আস্বাদের মতো ক'রেই এনে দিয়েছেন।

বস্তুত চেতন-অচেতন-মেশানো এই চিত্র-সোধূলির জগৎটি আর কোনো কবির রচনায় ঠিক এ-ভাবে ধরা পড়েনি। অবশ্যি কবি মাত্রেই কোনো-না-কোনো মুহূর্তে এই রহস্যময় জগতের ইশারা পেয়েছেন, এবং স্বকীয় ভঙ্গিতে সে-অনুভূতিকে প্রকাশও করেছেন,—কিন্তু জীবনানন্দ যেন সব সময়ই এই প্রচ্ছন্ন-লোকের অধিবাসী, বিশেষ ক'রে এখানেই তাঁর হৃদয়ে কবিতার জন্ম হয়। কবি নিজেই এক স্থানে বলেছেন:

আমাকে অনুক্ষণ কাজে হয়েছে যে বস্তুবিবর্জিত এই পৃথিবী, মানুষ ও জন্তুজগতের আমাকে ঘিরে রয়েছে অনুমাত্র এক এক সময় যেন বোধ হয়,—এই-পৃথিবীর-

অন্ধকার-ও-স্তব্ধতার একটি বোধের মতো যেন জ'লে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জন্মের প্রতিষ্ঠা ও আভাস পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে-সময় আমাদের জীবনকে ছেড়ে যায়, সে-সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না···

('কবিতার কথা'—'কবিতা', বৈশাখ, ১৩৩৫)

কবির এই উক্তিটিকে ভালো ক'রে বুঝে নেয়া প্রয়োজন : আমাদের ইন্দ্রিয়-চেতনার কাছে হাজারখানা হয়ে ছড়ানো যে-জগৎ—আমাদের বুদ্ধি দিয়ে যাকে আমরা বিশ্লেষণ করি, ব্যাখ্যা করি, যুক্তি দিয়ে তৌল ক'রে বিচার করি—এই জগতের, 'এই খণ্ডবিখণ্ডিত পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের,' সজ্ঞান চেতনা যতক্ষণ পর্যন্ত কবির মনকে অধিকার ক'রে থাকে, ততক্ষণ তাঁর কাব্যরচনার অনুকূল লগ্ন আসন্ন হয় না। এই ব্যবহারিক জীবনের 'ক্ষুদ্রতম সচেতন অনুভবও' কবির কাছে যখন 'থেমে যায়,' সমস্ত জ্ঞেয়জ্ঞান লুপ্ত হয়ে আসে,—তখনি কবি তাঁর সত্তার গভীরে এক বৃহৎ অখণ্ডতাকে অনুভব করেন, মহাসমগ্রতার সঙ্গে তাঁর সত্তার সাযুজ্য ঘটে, এবং সেই 'একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায়' তাঁর হৃদয় একটি বোধের মতো যেন জ'লে ওঠে'। এই অবস্থায় ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে কবিতার জন্ম হয়। এই নবম অনুভূতি বোধের আলোটি আসলে কবির বিশ্বিত বোধচৈতন্যের আলো ; মহাসমগ্রের অখণ্ড অনুভূতি থেকে তাঁর হৃদয়ে বোধ-চৈতন্যের এই অস্ফুট' আলোকবিন্দুটি জ্বলে ওঠে এবং তাঁর মৃদু কোমল আভায় আলোকিত জীবন ও জগৎ এক নূতন অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনায় রহস্যময় হয়ে ওঠে।

কবিতা রচনার কালে জীবনানন্দ সব সময় এই আলোতেই জগতের সব কিছুকে দেখেন,—সকল আলো, এমন কি অন্ধকারকেও হৃদয়ের এই আলোতেই প্রত্যক্ষ করেন। এখন থেকে এই আলো ছাড়া—

> অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো।

কবি কখনো চেয়ে দেখেন বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে 'কমলা-রঙের রোদ' কখনো কোনো এক আশ্চর্য ঘটনা দেখতে পান 'হেমন্তের সন্ধ্যায় আফরান-রঙের সূর্যের নরম নদীরে,' আবার কখনো তাঁর চোখে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠে

'আলোর রহস্যময়ী নদেদিবার মতো'। এর পর যখন ধীরে ধীরে রাত নেমে আসে—

তখন হলুদ নদী
সমস্ত দরজা হয় খোলা কাশ ঘোড়ায়—মাঠের ভিতরে,

ঘুমন্তিমতে দেখা যায়—

বিশ্বীবনের সমুদ্র যোবন ধীরে
সোনার ডিমের মতো
কাস্তের চাঁদ,

এদিকে পায়ের অতি কাছে মাটিতে—

ধানের উপরে জ্যোৎস্না,—পেঁচার ডানার। উড়ন্ত
নিস্তব্ধ ধানের মতো—

কবি জগৎকে যখন থেকেই তাঁর হৃদয়ের রহস্যময় আলোকে দেখতে শুরু করেছেন তখন থেকে প্রতি মুহূর্তেই জগতের সঙ্গে তাঁর এক নূতন বিস্মিত পরিচয় ঘটছে। এ বিস্ময় অন্তহীন। কবির প্রতিটি কবিতায়, প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে এ-বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

বস্তুত এইখানেই জীবনানন্দের কবিতার মূল সৃষ্টিরহস্য। একে কবিচিত্তের স্বপ্নাবেশ ব'লে মনে করলে ভুল হবে। স্বপ্নের মতো মনে হলেও এ স্বপ্ন নয়। কবি যে অর্ধস্ফুট চৈতন্যের আলোকে জীবন ও জগৎকে দেখছেন, বাইরে থেকে একে চৈতন্যের মূর্ছিত অবস্থা ব'লে মনে হলেও আসলে এটিই হচ্ছে কবিচিত্তের ধ্যানতন্ময়তা। এই ধ্যানলীন অন্তর্তাতেই তাঁর হৃদয়ে কবিতার জন্ম হয়, এ সময়ে তিনি চরাচরের মধ্যে যা-কিছু দেখেন সবই সেই ধ্যানসৃষ্টির সহযোগেই পাওয়া, এগুলি তাঁর বোধচৈতন্যের কাছে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর সত্তায় এই গভীর 'বোধ' সম্বন্ধে কবি নিজেই বলেছেন :

আলো-অন্ধকারে যাই—যাবার ভিতরে
সব মন, কোন এক বোধ কাজ করে।
সব মন, শান্তি নয়, ভালোবাসা নয়,

হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম নেয়,
তারে আমি পারি না এড়াতে,...

এই বোধ একবার হৃদয়ে জন্ম নিলে—

সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে।
..... তাহার সহজ ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর,...

এখন আর সহজ লোকের মতো কথা বলা কবির পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর ভাষাও যে এখন তাঁর ধ্যানোবিষ্ট অন্তর্মুখ চৈতন্যেরই ভাষা, বিচিত্র মিশ্র-অনুভূতির সংকেতময় ভাষা।

এই 'বোধে'র কাছে জীবন ও জগৎ এক নূতন অর্থদ্যোতনা লাভ করে। জীবনানন্দের কবিতায় এই 'বোধে'র ক্রিয়াটি বড়োই বিস্ময়কর: বিচিত্র অনুভূতি ও চেতনার মিশ্রণে অতি সাধারণ পরিবেশও তাঁর চারদিকে এক নূতন কুহক রচনা করে এবং তাঁর ছন্দে এক গভীর সংবাদ বহন ক'রে আনে:

বহুদিন ধ'রে তবু বোধ হয় পায়
পৃথিবীর সেই সত্তা ঘাসে এসে অন্ধকারে মানুষের কথা
ক'য়ে যেত।

কিংবা

যোলার গাড়িই ধীরে চ'লে যায় অন্ধকারে মোমবাতি ঘড়ের খোলা মুখে
শিখা তার লালের খোলস, মালা, পদ্মবন্ অন্ধকার—
পাখি তার মরেছে সমুখে।

কিংবা

মাছরাঙা আবলীতে হয় তবু বেলা
জলসীর সাথে এক। সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন ঝড়ের মতো বেলা
আসে তার,—ঘাস চুল,—চোখে তার হিজলের মতো ছায়া।

এ-ধরনের অসংখ্য পঙ্‌ক্তিতে তার আভাস পাওয়া যায়। এই 'বোধে'র কাছে শুধুই যে বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে একটি গভীর ব্যঞ্জনা আসে তাই নয়, সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়চেতনাতেও বিস্তার নূতন ইঙ্গিত ধরা দিতে থাকে:

হিজলের ডালপালায় আলো আর ঘুলঘুলি কাঁপিয়াছে বেলা,

কিংবা

যেখানে কপালি জ্যোৎস্না ঝিলিমিলে পায়ের ভিতর,

কিংবা

অতিদূর তমসের জামালায় আমি
মাটিমেহে চাঁদমুটকির—হরিণের।

আবার অনেক সময় একটি ছবির পিছনে আরেকটি রূপের ইঙ্গিত ফুটে ওঠে :

ধূসরতা এনেছে চাঁদ আকাশের একখানা পাতার পিছনে
দুই সব কালো কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার,

কিংবা

দেখেছি মাঠের পারে অনেক মহীয় মাঠী বড়াচ্ছেরে ঘুম
ঘুমাপাড়ে,

কিংবা

একটুকরো রোদের আঁধারে
বিরাট নীলাভ খোঁপা খিরে রেখে মাঠী আছে মাঠে
পৃথিবীর অতি নদী,

জীবনানন্দের কবিতায় এমনি ক'রে বিচিত্র রূপকল্পনাকে আশ্রয় ক'রে কোমল আলোছায়ার নানারকম ভাঙাগড়া ও খেলাখেলা চলতে থাকে। আবার অনেক সময় একই সঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়চেতনার অপ্রত্যাশিত অথচ যাদুময় মিশ্রণ ঘটে :

শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে। তাহার চোখের পর মুখে যেন ঘিন,

কিংবা

তাদের ঘুমের পরে ক্লান্তিহরা ঘাস হয়ে জন্মেছে যে বেলা
নির্জন মাঠের চোখে,

কিংবা

এই কথা বলেছিল তারে
চাঁদ ডুবে চলে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে

যেন তার আস্বাদের গায়ে
উটের গ্রীবার মতো কোনো এক বিস্তৃততা এসে।

এ-সব পঙ্‌ক্তিতে কবি অতি অস্পষ্টভাবে চেতনার মিশ্র-অনুভূতিগুলিকে রূপ দিয়েছেন। তাছাড়া—

একটি তারা এখনো আকাশে রয়েছে;
পাড়াগাঁর বাদলঘরে সব চেয়ে গোধূলি-ঘণ্টির ফোঁটার মতো,

কিংবা

তার হাত ফুলুরোর মতো নেই আর
মরে যেয়ে গোপা শালিখের ডানার বিদীর্ণ ইচ্ছার মতো'

কিংবা

কেরোসিনে কেশ তার বিষণ্ণ পাখির মতো ডানা,

উপমার এরকম আশ্চর্য জোড়না জীবনানন্দের কবিতাকে সর্বত্র অনন্য করেছে। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন' কিংবা 'সে কেন ডাকের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়'—এ-সব পঙ্‌ক্তির তুলনা কোথায়? কবি তাঁর ভাবকল্পনার কত বিচিত্র রূপভঙ্গিমা ও রূপসম্ভাবনাকেই না প্রত্যক্ষ করেছেন!

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কবির রূপকল্পনাগুলির বহুল বৈচিত্র্যের মধ্যেও কয়েকটি বিশেষ ভাবলক্ষণই প্রধানভাবে প্রকাশ পাচ্ছে: এদের সৌন্দর্যে একটি ম্লান বিষণ্ণতা লেগে আছে, একটি ক্লান্তির ছায়া পড়েছে ও একটি বেদনার সুর বাজছে; তাছাড়া এদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম রহস্যময়তা ও একটি বাষ্পবিলীয়-মানতার ভাব আছে। এর মূল কারণটি অবশ্য জীবনানন্দের প্রকৃতির মধ্যেই খুঁজে পাই: যোগচৈতন্যের যে-আলোকবিচ্ছুরণে কেন্দ্র ক'রে তাঁর মধ্যে কবিতার জন্ম হয়, তার ম্লান করুণ আভা কবির সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে স্বভাবতই ছড়িয়ে পড়ে।

বস্তুত এইটিই জীবনানন্দের কবিতার প্রধান স্বরূপলক্ষণ। কবির উক্তি থেকে আমরা জানি, কবিতা রচনার কালে অখণ্ড-দেশ-কালের চেতনার লয়

থেকেই কবি জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করেন। তখন তাঁর কাছে চরাচরের বিভিন্ন বস্তুর ভেদরেখাগুলি স্বভাবতই অস্পষ্ট হয়ে আসে. তাছাড়া মহাসমুদ্রের মতো এদের সব রূপই আপেক্ষিক,—কণকালের আলোকে নিরুপিত আকারে প্রতিভাত হলেও নিত্যকালের পরিপ্রেক্ষিতে এরা মুহূর্তে রূপান্তরিত হচ্ছে। তাই কবির কাছে এদের বিভিন্ন সত্তা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় ;—এই-জন্যেই তাঁর কবিতায় এত অজস্র মিশ্র-অনুভূতি ও মিশ্র-রূপের ব্যঞ্জনা এসেছে, আর এইজন্যেই তাঁর রূপকল্পনাগুলি আমাদের চেতনার দাবীর মতো ভেঙে যেতায়। এই অবস্থায় কবির নিজের মনোজগতেও একটা মস্ত বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটে : কোনো বস্তুরই রূপ-প্রকৃতি স্থির থাকছে না ব'লে কবির কাছে তখন সব কিছুই অনিশ্চিত বোধ হয়। কবি নিজেও তা স্বীকার করেছেন, তিনি নিজেই লিখছেন, তাঁর জীবনে সেই রহস্যময় 'বোধ' জন্ম নেবার পর—

> কে বলিতে পারে এই আলোর আঁধারে
> সত্য সোনার মতো ,...কোনো বিস্তরতা
> কে আনিতে পারে আর ?

কবির ইতিহাস-চেতনার মধ্যেও তাঁর এই 'বোধ'কে সক্রিয় দেখতে পাই : নিত্যকালের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি খণ্ডকালকে প্রত্যক্ষ করেছেন। অতীত ও অনাগতের মাঝখানে বর্তমান কালকেও তিনি এই দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন : বর্তমান কাল একদিকে যেমন বিগত অতীতের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত অন্যদিকে তেমনি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় উৎকণ্ঠিত :

> অনেক সোনার ধান ক'রে গেছে আমি যা ভি ? অনেক গল্প কবি
> আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে.—তারাদেরই আমাদের প্রতি
> ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, আশা. ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
> হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদেরই—সেখানে আমরা নাহি ?

যুগে যুগে ঈপ্সিতকে পাবার জন্য মানুষের ইচ্ছা চেষ্টা'র অন্ত নেই, কিন্তু মানুষ তাকে কোনো যুগেই পূর্ণভাবে পায় না :

> মানবীয় লীলাক্ষেত্রে ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের—ইচ্ছারও মহিমার চারু আয়োজন
> বেদনের কুয়াশায় ঘুমাতেছে অন্তরাণ বিশ্বের মতন।

তবু কাল এগিয়ে চলে,—'কেবলি মৃত্যুর জন্ম হয়'—মানুষও অতীতের বিদ্বেষ বেদনা মুছে নিয়ে কালের সঙ্গে-সঙ্গেই চলেছে, এবং পূর্বতাকে কোনো কালেই না পাওয়া সেদেও একটা আদর্শকে লক্ষ্য ক'রে চেতনার দিক থেকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে :

> মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
> থেকে যায় ; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
> আরো ভালো—আরো স্থির নিষ্কলঙ্কিনীর মতো চেতনার
> পরিণামে বিকশিত কাজ
> কতটুকু অগ্রসর হয়ে গেল ছেনে নিতে আসে।

জীবনানন্দকে তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা এমনি ক'রেই দেখতে পাই : নিবাট অখণ্ডের ধ্যানলীন একতান মধ্যে তিনি তাঁর বোধচৈতন্যের স্নিগ্ধ আলোকে আপন উপলব্ধিতে তন্ময় হয়ে আছেন, তাঁর ভাবকল্পনায় অতি দূরে স্মৃতিস্তম্ভগুলিতে কত বিচিত্র মিশ্র-অনুভূতির কম্পন সঞ্চারিত হচ্ছে, তাদের মূল্যনিরূপণে তাঁর কাব্যালোক থেকে রংয়ের রহস্যময় উঠেছে, এবং সব মিলিয়ে আমাদের কানে একটি বিদগ্ধ সুর ভেসে আসছে। বস্তুত কবির সমস্ত কবিতাতেই এই করুণ বিষণ্ণতা ছড়িয়ে আছে : মহাসময়ের চেতনায় লয় থেকে খণ্ডিত জীবন ও জগৎকে ভালোবাসার ফলেই এই বেদনা, কেননা এ অবস্থায় একটি নিমেষ মুহূর্তের অনুভূতিকে বিশ্লিষ্ট ক'রে, একাগ্র ক'রে, আনন্দোজ্জ্বল ক'রে পাবার উপায় নেই, অথচ প্রতিমুহূর্তেই একটি স্নিগ্ধ মুহূর্তের মৃত্যু হচ্ছে, বর্তমানের আকাশ বহু মৃত মুহূর্তের কান্নায় ভ'রে উঠেছে, আবার প্রতিটি নূতন মুহূর্তের জন্মলগ্নেই তার মৃত্যুঘণ্টা বাজছে, প্রতিটি ফুল, প্রতিটি জীবন ফুটে উঠছে ঝ'রে পড়বার জন্যেই।

কবি জীবনকে ভালোবেসে কী নিবিড়ভাবেই না তাকে অনুভব করেছিলেন :

> শিশুর মুখের মত, ঘাস, রোদ, মাতৃস্তন, সমুদ্র, আকাশ
> আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের স্নিগ্ধ ভালোবাস।

কিংবা

> আমরা দেখেছি যারা ভালোবেসে পাখের শুনেছে 'পথে যাও,
> সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে।

কিংবা

> [illegible]
> অতীত আঁধারে ডুবা, অনাগত ভালে ভালে ভাবিষ্যতে বন্ধ
> আমরা ঘুমেছি যারা জীবনের এই দিন বিস্তৃত দুয়ার।

এ-সব পঙ্‌ক্তিতে জীবনের প্রতি কবির যে গভীর অনুরাগ ফুটে উঠেছে সত্যই তার তুলনা নেই, অথচ এই জীবনকে কবি আনন্দোজ্জ্বল ক'রে, উৎসবময় ক'রে আস্বাদ করতে পারছেন না: প্রতিমুহূর্তেই অনুভব করছেন জীবনের দেহে মৃত্যুর হিমস্পর্শ—

> [illegible]
> .....আমি না কি আরো,
> [illegible]
> [illegible]
> বিস্তৃত পরি প্রাণ। যেন কোন মারাত্মক প্রয়োজনে লাগে।

নিত্যকালের পরিপ্রেক্ষিতে খণ্ডকালের ক্ষুদ্রতম অনুভূতিগুলিকেও এমনি ক'রে কবির মহা ব'লে মনে হয়, এরা 'যেন কোন মারাত্মক প্রয়োজনে লাগে', অথচ কবির প্রাণ তো যোগীর শুষ্ক জ্ঞানতপস্যা নয়, তিনি কিছুতেই তাদের বিচ্ছেদ-বেদনা ভুলতে পারেন না। সমগ্রদৃষ্টিতে জীবনকে সব সময় মৃত্যুর পটভূমিতে দেখতে গেলেও এই মৃত্যুপীড়িত জীবনের জন্য কবির সহানুভূতির অশ্রু মীরগুলি আর্দ্র হয়ে ওঠে। প্রবহমান কালচেতনা ওঁর এই বেদনাকে আরো ব্যাপক, আরো দুঃসহ ক'রে তোলে: অতীতের কত বিলুপ্ত যুগের নরনারীও এমনি ক'রে একদিন সূর্যের আলোকে চোখ মেলেছিল, জীবন-পিপাসা নিয়ে পরস্পরকে এমনি ক'রেই ভালোবেসেছিল; আজ তারা মৃত, আজ তারা ধূসর স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে; কবির চির জাগ্রত মন বহু যুগ পরেও তাদের বেদনার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছে:

> মনে হয় কোনো বিলুপ্ত নগরীর কথা
> সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের জল আসে চোখে

আজ কবির কাছে—

> মানুষের অন্তরাত্মা ফিরে আসে সেই মনুষ্যলোকের কাহিনী,
> অন্তরঙ্গ বিলাসে ও মধুরের যেমনকার সেবা,

কবি অনুভব করেন, একদিন সেই নির্জন প্রাসাদে ছিল—

> আমার নিভৃত হৃদয়, আমার মৃদু চোখ, আমার নিবীড় ঘন আকাঙ্ক্ষা
> আর তুমি নারী
>
> তোমার মুখের ছল আমি কত পত্র পত্রাবলী লেখি না
> খুঁজি না।

কবি আত্মবিস্মৃতের মতো তাঁর বহু বিগত জীবনের প্রিয়জনদের মুখ স্মরণ করেন :

> সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল—আকাশে এত ছিল তারা ছিল না।
> পৃথিবীর সমস্ত মৃতের প্রিয় মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতরে দেখেছি আমি।

কিংবা

> যে জনপদের আমি একদিন্যার, নিমেষে, বিচিত্রায় ঘুরে ফেরে দেখেছি
> কাল তারা অতিদূর আকাশের নীহারিকা ধূসরাশার ধূসরাশার দীর্ঘ বর্শা হাতে ক'রে
> কাতারে কাতারে উঁচিয়ে রেখে যেন,—

বর্তমান কালের মধ্যেও অতীতের সন্তাসায় মিশে আছে, অথচ তাকে পূর্বের প্রিয় পরিচয়ে জানবার উপায় নেই :

> তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই—জন্ম,
> তবুও নিশ্চয়ে আমি টের পাই—তুমি
> আজো এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ।
> কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ।
> বহুদিন থেকে আমি নেই।

বর্তমান কালের প্রতি মুহূর্তে অতীতকেও বহন ক'রে চলবার সান্ত্বনার আশা বৃথা : কবি-যে অথচ যেন-কালকেই তাঁর চিরজীবনের সঙ্গী ক'রে নিয়েছেন, —তিনি নিজেই বলছেন :

> হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটতেছি পৃথিবীর পথে
> নিয়েছে সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে

অনেক ঘুরেছি আমি, বিদিশার আলোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি, আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;

তাই আজকের ধূসরালোকে উদ্ভাসিত এই প্রাণচঞ্চল জগতের মাঝখানে—

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র ফেনিল,

এবং আজকের দিনেও যার নিভৃত চিত্তসত্তাটি কবিকে 'দূরতর পাখি বিয়েছিল' সেও যে অতীতের সুখস্মৃতিকে, অতীতের বিচ্ছেদবেদনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয় —সেও যে অর্থেক অতীত :

চুল তার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য,

তাই তার মধ্যে কবি ক্ষণকালের জন্য একটি সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু দেখতে দেখতে চারদিকে সময়ের 'ফেনিল সমুদ্র' উদ্বেল হয়ে ওঠে, বর্তমান থেকে অতীত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কবির হৃদয় আবার আশ্রয় হারায়।

অখণ্ড-কালচেতনার বিরহময় ভাবমান কবিচিত্তের এই দীর্ঘশ্বাস জীবনানন্দের কাব্যকে এমন বিষাদ-করুণ ক'রে তুলেছে। কবির মনে যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অবসাদ, নিরবচ্ছিন্ন কালধারার অনুক্রমে ক্রমপ্রকাশমান ও ক্রমবিলীয়মান জগতের সমগ্র অনুভূতিকে মনের মধ্যে অনুক্ষণ বহন করার এই ক্লান্তি, এই ক্লান্তির ছায়া তাঁর সৃষ্টিলোককে ম্লান-ধূসর ক'রে রেখেছে; এখানে অনন্ত গোধূলি। তাঁর কবিতায় জীবনের যে প্রতিমাকে প্রত্যক্ষ করি তার দেহেও এই ধূসরতা, —সে মৃত্যুস্পৃহিতা—তার বুকে বিচ্ছেদের বেদনা, তার মুখে মৃত্যুর হাসি। জীবনানন্দের কাব্যলোকের গোধূলি-আকাশে এই হাসিটি চিরকালের জন্য লেগে রইল।

পত্রাংশ

অমিয় চক্রবর্তী

[বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত]

Boston University
Boston 15, Massachusetts
১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৪

প্রিয়বরেষু,

কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত হয়েছি—এরকম নিদারুণ দুর্ঘটনার কোনো মানে পাওয়া যায় না। ওঁর কবিতায় একটি তারি আশ্চর্য রহস্যময় সুর ছিল, মনে হ'তো জীবনের বিচ্ছিন্ন বহু ঘটনার মূলে পৌঁছিয়ে তিনি সমস্তটাকে বলবার ভাষা তৈরি করছেন। পড়তে পড়তে সেই একটি আকাঙ্ক্ষী, সর্ববিদসন্ধানী, গাঢ় সুরে ভরা ভাষা আমরা ওঁর কবিতায় শুনতে পেয়েছি। আপাতবিরোধী উপমায়, সংলগ্নতায়, ধ্বনির ঝংকারে এবং নিগূঢ় অনির্দিষ্টতায় কত ভাবে তিনি ওঁর বলবার ধ্বনি রেখে গেলেন। বাঙালির মনে বহুকাল ধ'রে সেই ধ্বনির মূর্তি জাগবে। ঘন জলের উপর দিয়ে ওড়া হাঁসের রেখা, কাঁচা ডিমে ঘাস, লোকজনের কথাবার্তা, এবং কল্পনার জটিল ফাল্গুনে রচিত এই মূর্তি। অনেকখানি চোখে ঠাহর হয় না, এক আলোয় একরকম, অন্য বেলায় একেবারে ভিন্ন হয়ে একই কবিতার বাসনা ধরা দিতে থাকে। প্রসন্ন বেদনার কোমল উজ্জ্বল মতোই নতুন এবং নিজস্ব ওঁর দেখা: বাংলা কাব্যে কোথাও তার তুলনা পাই না। জর্মান কবি রিল্‌কের কথা মনে করিয়ে দেয় যদিও মনঃপ্রকৃতি এবং ভাষা ওঁদের স্বতন্ত্র। একবার ওঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, জীবনের কোনো সময়ে রিল্‌কের হাতে ওঁকে স্পর্শ করেছিল কিনা,—বললেন, না, রিলকে ওঁর বিশেষ ভালো লাগে। জীবনানন্দের কাব্যে একটা নির্দিষ্ট মোহের খোলাবেলা ভাব ছিল, জর্মান কবি চিন্তায় এবং চৈতন্যের ভারে অনেক সময় অত্যন্ত ডুবে যেতেন। যখনই জীবনানন্দের কোনো কবিতা পড়েছি মনে হয়েছে মিত্র যোদ্ধুরে আদুড়, শরৎ-প্রান্তের কোন চেনা দিন ফিরে এসেছে, কোনোদিনই সেইদিনের মাধুর্য অবসান হবে না।

দুটি কবিতা

প্রতীক্ষা

আনন্দ বাগচী

"এতদিন একা লাগে
আমার আদিমে তুমি,—আদিবার ইচ্ছা যদি হয়।"—

আসেনি সে। ভাবলাম, এই যে প্রতীক্ষা ক'রে থাকা
বিশ্রব্ধ বেদনাতে, অলি-গলি সন্ধ্যের প্রহর—
অশ্রুলুপ্ত ছবিদের, মৃত্যুর মতন এরা ফাঁকা
মৃত্যুর মতন এরা ম্লানকান্তি, কান্নার প্রহর।

মোর ঠোঁটে লঘুতা চাওয়া, আসেনি সে, শরতের মন
কেউ হেরে চমকালো, কেউ না, কিছু না, তবু যদি
আসতো সে, তারি জন্যে এই কথা পাতার প্রবিণ
বেদনায় সেউলে হয়, ল্যাম্পস্ট্যান্ড রোজ হয় নদী।

যারারাতে মোম জেলে জাগা-পারে যে মানুষ পাহচারি করে
তার ছবি,
যার চোখে সারারাত্রি শিশিরের জল জমে মাঠের কান্নায়
তার ছবি,
পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র সামগ্রীতে লোভ যার সোপন বিস্ময়
তার ছবি।...
আজ বুঝি এত ছবি শেষ হলো, হাজার বছর ব'য়ে কেউ
রাত্রির পৃথিবী দিয়ে হাঁটবে না, লবণাক্ত ঢেউ
আর কারো রক্তের সমুদ্রে জাগবে না,
আর কেউ জেগে-জেগে যুম-অধ্যায়ী গান করবে না।

আমার তো জানা নেই, কালের ভ্রূকুটি ভঙ্গ ক'রে
আর কোনো দুঃসাহসী আছে কিনা দুই চক্ষু ভ'রে
প্রাকৃতিক স্পর্ধা যার অনুরক্ত, অন্ধকার জলের মতন
স্নিগ্ধ যার মন।
যে পারে হেলায়
নেমে এসে যোগ দিতে আদিগন্ত মৃত্যুর খেলায়।

আসেনি সে। ভাবলাম পাতার মর্মরধ্বনি শুনে,
সে আসে না তবু কাঁপে ল্যাবরাডর রৌদ্রের আকাশ,
সবুজ সেলাম করে ঘাস,
পৃথিবীরা ঘরে ফেরে, নীল মেঘ তারার আগুনে।

আরো শুভ্র রোদ

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

[আজও দুটি মৃত্যু এই কবিতার বিষয়ে। আমার আত্মীয় বিয়োগ-ব্যথা নতুন করে অনুভবেই তখন কবি জীবনদেবের বিয়োগ-বেদনার ভার ব'য়ে এক হ'য়ে গেছে। তাঁদের আমাতে বিদায় নিতে হ'লো কবিকে, আমার একটি ভাইও তেমনি এক অভাবের ভোরে লুপ্ত হ'য়ে গেলো ঐশ্বের সঙ্গে সবারে।]

যেদিন-নদীর পারে গিয়েছে এবার।
সেখানে তো মৃত্যি ছাড়া আর কিছু নেই,
শান্তির উৎসাহে সব মুছে গেছে আর—
অথবা শুধুই জাগা—দীপ্ত শঙ্কাহীন।

বিতস্ত মানুষ হাতে, নেই অন্ধকার।
তবে কেন দুঃখ পাই তুমি নেই ভেবে :

কবিতা

পৌষ ১৩৬১

পোহাবে না অজ্ঞানের ঘোর কোনোদিন,
ধরিত্রী গভীর সুখে উঠিবে না হেসে।

ম্যাটকর্মে যন্ত্র হাত ধরিবে কি তোমার ?
ঘুম ভেঙে খুঁজিবে কি মানুষের আলো ?
হয়তো সেখানে আরো শুভ্র ঘোর আছে—
মনুষ্যত্ব মাধুরী তুমি জানিবে না আর।

কবিতাগুচ্ছ

জীবনানন্দ দাশ

১

কার্ত্তিকের শোরগোল
চোখে মুখে চুলের ওপরে
যে শিশির ঝরল তা'
শালিক বরাল ব'লে ভুল করে

আমলকী গাছ ছুঁয়ে ডিগবাজি[১] খায় শালিক
কার্ত্তিকের রোদে আর জলে
নীলাঞ্জেরি নীল খেত না নীল আকাশ ?[২]
সূর্য ? না কি সূর্যের চক্কর[৩]

পা পিছলে পৃথিবীতে এসে[৪]
পৃথিবীর থেকে উড়ে যায়[৫]
এ জীবনে আমি ঢের শালিক দেখেছি[৬]
তবু সেই তিনজন শালিক কোথায় ।

১৮-৯-৪১

(পড়িশার শৌরভে)

---

১. ডিগবাজি
২. আমার হৃদয় ঘিরে চেনা ভিন বাড়ীর মতন
৩. ঢের ঢের দিন পরে কিচিমিচির কোলাহলে
৪. চেনা মানুষীর ভাষা কানে ঢেলে কয়া
৫. আবার বিরলে উড়ে যায়
৬. এ জীবনে তারপর অনেক শালিক দেখেছি

২

আমাকে সে নিয়েছিল ডেকে ;
বলেছিল : 'এ নদীর জল
তোমার চোখের মতো ম্লান বেতসল ;
সব ক্লান্তি বিহ্বলতা[১] থেকে
স্নিগ্ধ রাখছে পটভূমি
এই নদী তুমি।'

'এর নাম ধানসিড়ি বুঝি ?'
মাছরাঙাদের সহায় :
গম্ভীর মেয়েটি এসে দিয়েছিল সায়।
আলো আমি মেয়েটিকে খুঁজি ;
জলের অপার সিঁড়ি বেয়ে
কোথায় যে চ'লে গেছে মেয়ে।

সময়ের অবিরল শাখা আর কালো
বুনোনির ফাঁক[২] থেকে এলে
মাছ[৩] আর মন আর মাছরাঙাদের ভালোবেসে
চের আগে নারী এক—তবু চোখ-ঝলসানো আলো
ভালোবেসে ষোলো আনা নাগরিক যদি
না হ'য়ে বরং হ'ত ধানসিড়ি নদী।

('বেদ'-এর সৌজন্যে)

১. রক্তের ২. বুক ৩. জল

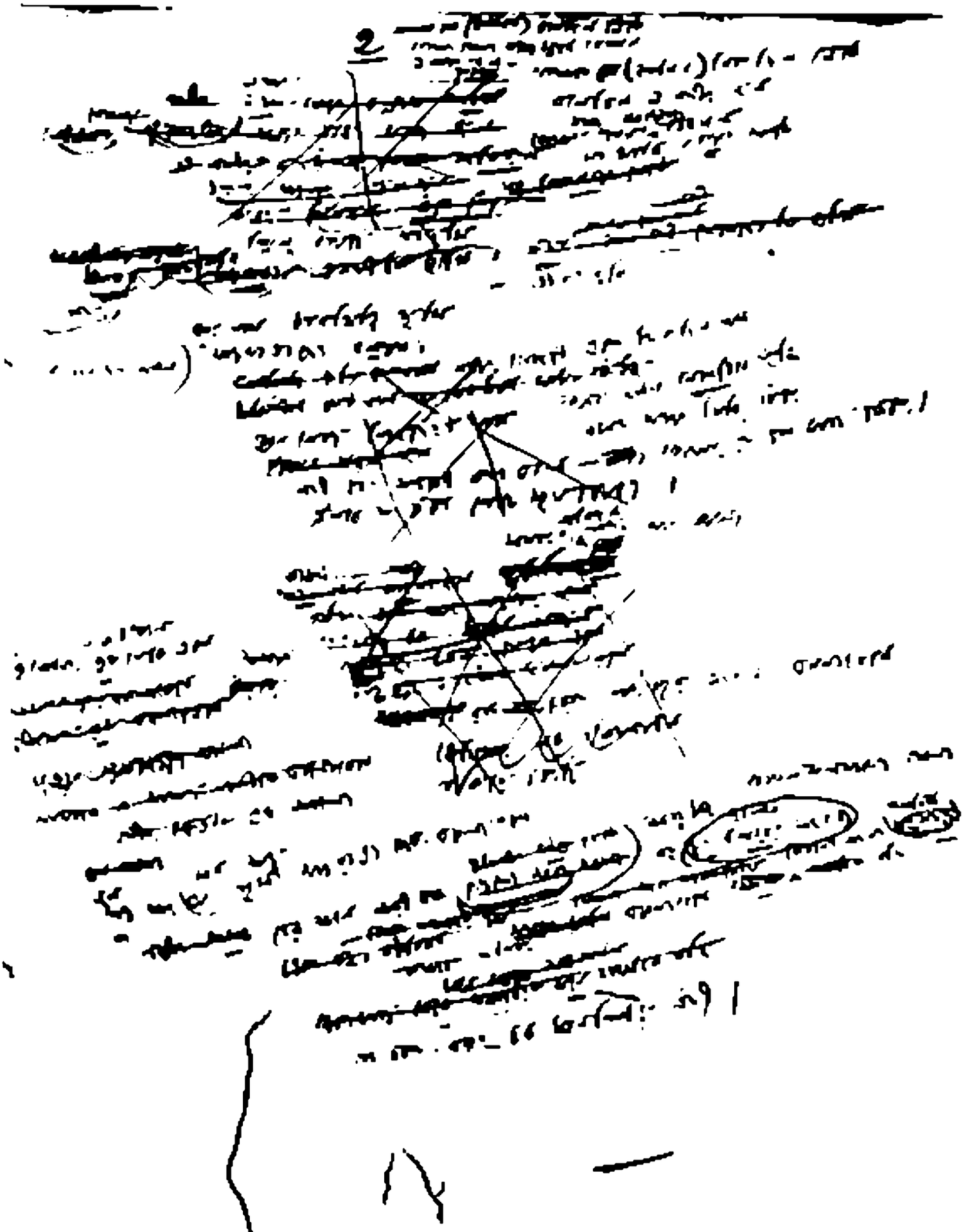

৩

এক অন্ধকার থেকে এসে
অন্য এক আঁধারের দিকে
মুখ ফেরাবার আগে—
কয়েক মুহূর্ত কথা কাজ চিন্তা রয়েছে এ জীবনের
দেখেছি সূর্যের আলো, নীলাভ বাতির বিচ্ছুরণ,
অন্ধকার অজস্র প্রান্তর, মৃত অর্ধমৃত নগর বন্দর,
শোকাবহ আলো শব্দ ফেল,
ক্লান্তিহীন ফেন এরিয়েল,
[নীলিমায় এরোড্রোম হেলিকোপটারের[১]
এঞ্জিনের[২]
অনুরণনের
আর এক রকম সুর :]

হেমন্তের মধ্যরাতে
দক্ষিণসাগরগামী হরিয়াল বুনো হাঁসদের
রাশি রাশি কালো বিন্দুতের বিন্দু,
ডানার ঝাপসা গুঞ্জরণ
—দেখেছি জেনেছি অনেক দিন—
মানুষের সাথে
মিলন বা অমিলের কঠিন[৩] রহস্যসূত্রও নিয়ে
সময়ের দুর্ভেদ্য সাগরতীরে গিয়ে ধীরে ধীরে হৃদয়ের কথা
দেখেছি মানবের[৪] ইতিহাসে[৫] বারবার হয়।

১. নীলিমায় এরো ইঞ্জিনের ২. প্রপেলার ৩. অজিম ৪. মানুষের
৫. বিচরণে

পৌষ ১৩৬১

মনে হয় যেন মানুষের মন শুধু কোথাকার
দুই কালো যাদুতীর ভেদ ক'রে ফেলে
চলেছে নদীর মত—
চারিদিকে জনতার সকাতর কোলাহল—
ঘর বাড়ি সাঁকো।
পাখির[১] ও মানুষের কঙ্কাল পায়ের[২] চিহ্ন
পায়ের[৩] স্পন্দের চিহ্ন সব—
মুছে ফেলে বুঝি অনাদির শাদা কালো[৪]
নির্দোষ আলো আর অন্ধকার আবার সফর ক'রে মন[৫]
জ্ঞানপাপ মুছে ফেলে হ'তে চায় স্নিগ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের মতন।

৪

তোমায় আমি দেখেছিলাম ঢের
শাদা কালো রক্তের সাগরের
কিনারে এক দেশে
রাতের শেষে—দিনের বেলার শেষে।

এখন তোমায় দেখি না তবু আর
সাতটি সাগর তেরো নদীর পার
যেখানে আছে পাঁচটি মরুভূমি
তার-ওপারে সেই কি চ'লে তুমি
ঘাসের শান্তি শিশির ভালোবেসে।

১. প্রেমের। অন্তর ২. প্রেমের ৩. চিত্তের
৪. মুছে ফেলে দিয়ে বুঝি আদি শাদাকালো
৫. নির্দোষ প্রথম সৃষ্টি আবার সফর ক'রে মন

বটের পাতায় সে কার নাম লিখে
[গম্ভীর ভাবে] ভালোবেসেছিলে সে নামটিকে
হরির নাম নয় সে আমি জানি
জল ভাসে আর সময় ভাসে—বটের পাতাখানি
আর সে নারী[১] কোথায় গেছে ভেসে।

৫

ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে
আমাদের দুজনকে নিতে চায় যেই শব্দহীন মাটি ঘাসে
সাহস সংকল্প প্রেম আমাদের কোনোদিন সেদিকে যাবে না
তবুও পায়ের চিহ্ন সেদিকেই চলে যায় কি গভীর সহজ অভ্যাসে।

৬

রক্ত নদীর তীরে[২] কালো পৃথিবীর
দাঁড়িয়ে রয়েছে মৌন বৃক্ষের একমুঠো আলো
সনাতন[৩] শূন্যের অন্বেষণে দিন অনুদিন
মানুষের যে সঞ্চিত মানবতা আজ প্রায় শূন্যে ফুরালো।
অনুভব করে সব মানুষ……
বৃত্তিকার মূল রেখে—লক্ষ্য রেখে আদি নীলিমায়
সহজ[৪] গাছের স্থির প্রতিচ্ছবি হবে—
শ্যামল গাছের[৫] থেকে অবিনাশ ধর্ম শিখবে
অথবা নশ্বর ধর্ম[৬] ভালোবেসে করবে ছায়ায় ?

---

১. মেয়ে ২. রক্তাক্ত নদীর রক্ত কোলাহলে ৩. অন্তলীন
৪. স্থাণু ৫. বৃক্ষের ৬. প্রেম

পৌষ ১৩৬১

চারিদিকে অন্ধ ক্রুদ্ধ সাগরের[১] উল্লাস[২] হাসি
অনন্ত প্রবহমাণ রক্ত[৩] আর জল
জীবনের জয়গান—মরণের যে লাবণ্যরাশি
ছুলে ওঠে আকণ্ঠাকুমারীহিমাচল
সে সব অসত্য নয় সত্য নয়—ফল নয় নৈষ্ফল্য নয়—
যতদিন হয়ে গেছে মানব ও মানবের[৪] মন
নিমিত্তের ভাগী হয়ে[৫] মানুষের[৬] রক্তাক্ত হৃদয়
হরিতের কাছে এসে শিখবে[৭] অক্ষয় গুঞ্জন।

৭

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা :
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন[৮] নেই
পৃথিবী[৯] অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের[১০] প্রতি
এখনো যাদের কাছে[১১] স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প[১২] অথবা সাধনা[১৩]
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

---

১. চারিদিকে ক্রুদ্ধ (অন্ধ। ধ্বংস। মৃত্যু। হিংসা। কালো) সাগরের
২. উদ্ভাসিত। ঝকঝকে। ঝলসানো
৩. ধ্বংস ৪. মানুষ ও মানুষের মন ৫. হবে ৬. মানবের
৭. শুনবে ৮. অবলেশ ৯. সমাজ ১০. পৃথিবীর। জীবনের
১১. চোখে ১২. শান্তি ১৩. সংকল্প

৮

দুদিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ
মাঝখানে আছ এই সময়ের অগ্নিকের আলো
যে নারীর মতো এই পৃথিবীতে কোনোদিন কেউ
নেই আর—সে এসে মনকে নীল—রৌদ্রনীল জ্বানলে ছড়ালো।
ভুলে গেছি পটভূমি—ভুলে গেছি কে যে সেই নারী
আজকে হারিয়ে গেছে সব ;
চারিদিকে গুঞ্জরিত হয়েছিল কি সব গভীর পল্লব
যখনই আমার আত্মা রুক্ষ আর আগুনের মতো নভোচারী
হয়ে ওঠে—মনে হয় যেন কোন হরিতের—নব হরিতের
সংগীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মানুষের ভাষা
হৃদয়ের আরো দূর জন্ম জন্মান্তরে মুখোমুখি ফিরে এসে অনাদি আলোর
ভালোবাসা
সামাজিক অন্তহীন আকাশের নীচে
জ্বালিয়ে জ্বানলনীল ব্যথা হতে চায়।
আমি সেই মহাভক্ত—লাবণ্যসাগর থেকে নিজে
জাগিয়েছ তুমি অনাদির স্পর্শে নীলিমার
পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে অবিনাশ স্বর
আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের নর্মরিত লাবণ্যসাগর।

[জীবনানন্দর এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে প্রথমটি 'পরিচয়'-এ ও দ্বিতীয়টি 'দেশ'-এ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিলো, সম্পাদকদের অনুমতিক্রমে আমরা এখানে পুনর্মুদ্রণ করলাম। অন্যগুলি, আমরা খোঁজ নিয়ে যতদূর জানতে পেরেছি,

এ-যাবৎ কবির হস্তাক্ষরেই আবদ্ধ ছিলো, আমরা তাঁর পাণ্ডুলিপি-খাতা থেকে উদ্ধার করেছি।

জীবনানন্দ কবিতা লিখতেন ছাত্রব্যবহার্য সাধারণ এক্সারসাইজ খাতায়, শক্ত পেনসিলে। তাঁর অভ্যেস ছিলো দুপুরবেলায় লেখা, এবং রচনাটি মনঃপূতভাবে শেষ হ'লে পরে, রাত্রে অন্য খাতায় কালিতে তার প্রতিলিপি তোলা। প্রতি কবিতার রচনার তারিখ সাধারণত উল্লেখ করতেন না, কিন্তু খাতার মলাটে মাস, বছরের উল্লেখ থাকতো। কবির অনুজ শ্রী অশোকানন্দ দাশের সৌজন্যে এই রকম দুটি মূল রচনার খাতা আমরা দেখবার সুযোগ পেয়েছি : একটির তারিখ নবেম্বর ১৯৪১-জানুয়ারি ১৯৪২, অন্যটি মে-জুন, ১৯৪৩। এই দ্বিতীয় খাতার পর আর-কোনো খাতা পাওয়া যায়নি, অতএব ধ'রে নিতে হচ্ছে যে এরপরই জীবনানন্দ তাঁর সর্বশেষ কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন বা আরম্ভ করেছিলেন। ৬, ৭ ও ৮ নং কবিতা এই খাতা থেকেই উদ্ধৃত ; এই তিনটি, আমাদের বিবেচনায়, অন্তত আকস্মিকভাবে শেষ হয়েছিলো। খাতার তারিখ, এবং খাতার পাতায় অবস্থানের পারম্পর্য থেকে অনুমান করা যদি নির্ভুল হয়, তা'হলে ৮নং কবিতাটিই তাঁর জীবনের সর্বশেষ রচনা।

জীবনানন্দ আক্ষরিক অর্থেও দুরূহ পাণ্ডুলিপির রচয়িতা ছিলেন ; তাঁর খাতার পেনসিলের দাগ এত ম্লান এবং হস্তাক্ষর এত ছোটো ও অস্পষ্ট যে কবিতাগুলির পাঠোদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়নি। তবু, কবিতা-রচনার প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয়, এই কবির বাক্-ভঙ্গির সঙ্গে পরিচয়, তার উপর অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধার ফলে যতটা সম্ভব, আমাদের প্রতিলিপি ততটাই সঠিক হয়েছে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। শব্দ, শব্দযোজনা ও পংক্তির বিভিন্ন পাঠান্তর পাদটীকায় সর্বত্র উল্লেখ করা হ'লো, ব্যতিক্রম শুধু ৮নং কবিতাটি। এই কবিতাটির পাণ্ডুলিপি এত অস্পষ্ট ও সংশোধনবহুল যে আমাদের পক্ষে দুটিমাত্র উপায় ছিলো : হয় এটিকে সংকলন থেকে বাদ দেয়া, নয় পাণ্ডুলিপির নীহারিকা-মণ্ডল থেকে কবিতাটিকে গঠন ক'রে নেয়া। কবিতাটির আন্তরিক মূল্যের প্রতি সম্ভাবনাময় দ্বিতীয় পন্থাই আমরা গ্রহণ করেছি। নিজেদের বিচারবুদ্ধি ও স্থিরের অনুসারে প্রত্যেকটি পংক্তিকে পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধার ক'রে নিতে

হ'লো—অর্থাৎ, অনেক অস্পষ্ট ও দুষ্পাঠ্য পাঠান্তরের মধ্য থেকে বেছে নিতে হ'লো সেই শব্দগুলিকে, যার সন্ধানেপে পংক্তিটি ধ্বনির ও অর্থের দিক থেকে সবচেয়ে সংগত এবং কবির চরিত্রলক্ষণে সর্বাধিক আক্রান্ত হয়। বলা বাহুল্য এতে এমন একটিও শব্দ নেই যা জীবনানন্দ ব্যবহার করেননি, কিন্তু তিনি পাঠান্তর হিশেবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এমন অনেক শব্দ বর্জিত হয়েছে।

জীবনানন্দ ইদানীং 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' সমসাময়িক অনেক অপ্রকাশিত কবিতা নূতন ক'রে লিখছিলেন, গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে তার কোনো-কোনোটি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সর্বত্র হয়তো পুরোনো লেখা হ'লে উল্লেখ করেননি; তাঁর কাব্যশরীরে এদের সঠিক সংস্থান, তাই, গবেষণার বিষয় হ'য়ে থাকলো। এই গুচ্ছের মধ্যে ৪নং কবিতাটি এই রকম পুরোনো একটি রচনা, জীবনানন্দের হাতে বিরল স্বরভঙ্গের অন্যতম উদাহরণ। এই কবিতাটির একটি পাঠান্তর 'কল্পনা সাহিত্য' নামক শারদীয় সংকলনে (আশ্বিন ১৩৬১) প্রকাশিত হয়েছিলো; পাণ্ডুলিপি-খাতায় এই একই চিন্তা বা ভাবকল্প অবলম্বন ক'রে পর-পর কয়েকটি কবিতায় বদলাবার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু খুবই সাম্প্রতিক বা সর্বাধুনিক রচনা ব'লে আমরা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারি যে-জুন ১৯৪৪-এর খাতা থেকে সংকলিত ৬, ৭ ও ৮নং কবিতা; এই তিনটি কবিতায় অপূর্বতার স্বাদ আছে, মনে হয় কবি যেন এখানে একটি নতুন পর্যায়ের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর অন্য পর্যায়ের কবিতায় মাঝে-মাঝে একটি সংকুচিত দ্বিধাগ্রস্ততা লক্ষ্য করা যায়—আসলে তাঁর আয়ত্ত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সময়েই, সেই সময়েই 'অন্ধকার' কবিতা লিখেছিলেন, যেখানে 'সূর্যের সৌত্রে আক্রান্ত পৃথিবী'তে 'কোটি কোটি সুরাসের আর্তনাদে'র 'উৎসব' দেখে তিনি 'অন্ধকারের অনন্ত মৃত্যু'র ভিতর মিশে যেতে চেয়েছিলেন। তারই কিছুকাল পরে 'আদিম দেবতারা' কবিতায় এই ভাব গাঢ়তর বিস্তৃতি হ'য়ে উঠলো:

> অবাক হয়ে ভাবি, আমি হাতে কোথায় পুঁথি!
> ছল কেন নির্জন দেবতাদের-দীপের মতন হাত। কেন বা—
> পৃথিবীর সেই মানুষীর ছল!
> দুল হাতে বয়েসও হয়ে—বাড়ছে—বাড়ছে—বাড়ছে—বাড়ছে হ'য়ে
> বাড়ছে—বাড়ছে—

আজন্ম যাত্রার জন্য, আদিম দেবতারা যে যে ক'রে হেসে উঠল :
'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে পুরাতের ভাগে হয়ে যায় ?'

'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'-এর অনেক কবিতাতেই এই ঘৃণা বা বিদ্রূপের আঘাত পড়েছে ; তাঁর প্রৌঢ় বয়সের রচনার মধ্যে এটিকে একটি প্রধান সুর বললে ভুল হয় না। অবশ্য, একই সঙ্গে, অনেক সময় আত্মার চূড়াও স্পর্শ ক'রে গেছেন তিনি—

তবেই ত্রিদিবকণ্ঠ দেবদারুবনে
দেখাবি অমৃতসূর্য আনে

তাঁর মৌল আস্তিকতা বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ যেমনি কখনোই। তবু মনে হয় কিছুকাল ধ'রে একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি কর্ষিত ছিলেন : বিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত, ঘৃণা, ক্লান্তি, যন্ত্রণার সঙ্গে প্রেমের। এই দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা কবির পক্ষে প্রয়োজনীয় ও উপকারী হ'য়ে ওঠে, যদি তিনি শেষ পর্যন্ত তার উপর জয়ী হ'তে পারেন। এই শেষ তিনটি কবিতা তারই লক্ষণে সমৃদ্ধ। মনে হয় কবি সংগ্রামের পর শান্তি পেয়েছেন, আকাশ পেয়েছেন আলোয়, জীবনকে—যেমন নিয়ে নয়, বর্জনকৃত ক'রে নতুন করে বাঁচার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। তাই মধ্য পর্যায়ের জটিলতা কেটে গিয়ে এখানে প্রাথমিক স্বচ্ছতা ফিরে এসেছে—আরো গভীর, সমৃদ্ধ এবং অর্থময় হ'য়ে ; ফিরে এসেছে নতুন, উজ্জ্বল রূপকল্পে নির্ভর ক'রে : ধানসিড়ি, জলসিড়ি, সুতাশুঁটি, বুনো হাঁস প্রভৃতির মতো এখানে পাড়িয়ে আছে 'মহাতরু', 'মৌন বৃক্ষ'—যে-বৃক্ষ সুস্থির, আত্মাধান, অবিচল, জীবনের শান্তি, ঘনতা, অনশ্বরতার প্রতীক। এই বৃক্ষ আমাদের পূর্বপরিচিত—এ-ই সেই ত্রিদিবকণ্ঠী দেবদারু গাছ, কিন্তু এখানে তার অমৃতসূর্যের আলোক পংক্তিগুলির ফাঁকে-ফাঁকে অবিরল কম্পিত হচ্ছে। 'এক মুঠো আলো', 'কবিকের আলো', 'শালুকের উজ্জ্বল হাসি', 'হরিতের অকম্প তরঙ্গ', 'নীল—রৌদ্রনীল স্যামল', 'হরিতের—নব হরিতের সংগীত', 'অনাদি আলোর ভালোবাসা'—এত অল্প পরিসরের মধ্যে আলোর এত রকম উল্লেখ জীবনানন্দের কবিতায় ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। বলা বাহুল্য, এটা 'সিন্ধু-সারস' বা 'নয় নির্জন হাতে'র আলো নয়, শুধু সৌন্দর্যের জন্য কোনো আক্ষেপ নেই এখানে, আছে নতুন সৃষ্টির প্রতি

আহ্বান। 'মঙ্গলাচরণ' কবিতার 'বিশ্বচিত্তের বিশ্বচিত্তে' যে-আলো ছিলো পটে আঁকা ছবিতে সংলগ্ন, এখানে তা মানুষের আকাশ থেকে ঝ'রে পড়ছে, মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হ'য়ে হ'য়ে উঠছে

আমাদের আলোকের অন্তরীণ বিহ্বলতায়
অন্তরীণ হরিতের মর্মরিত ভাষ্যসাগর।

আকাশ একেবারে ভুলে যাননি এখনো, কিন্তু যাদের হৃদয় আধুনিক যুগে 'শস্যের ও শেয়ালের খাদ্যে' পরিণত হ'লো—

মানুষের গভীর আত্মা আজো আলো মানুষের প্রতি
এখনো মানুষ তারে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ দস্যু বা গাঁঠি, ছিনতা শিল্প অথবা সাধনা—

কবি যে তাদেরই একজন, এই নির্ভীক ও সুদৃঢ় উপলব্ধিতেই জীবনোদ্বেল শেষ উচ্চারণ ভাস্বর হ'য়ে থাকলো।—বু. ব.]

কবিতার কথা

(অংশ)

জীবনানন্দ দাশ

সবলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি। কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার চিত্তরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার অন্তর্ম সামঞ্জস্য রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী র'য়ে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব ভাষা-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে, কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার চিত্তরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সামঞ্জস্য রয়েছে তাদেরই সাহায্য প্রায়ই হয়; নানা রকম চমৎকারের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।

বলতে পারা যায় কি এই সমস্ত কল্পনা-আভা কোথা থেকে আসে? কেউ কেউ বলেন, আসে পরমেশ্বরের নিকট থেকে। সে কথা যদি স্বীকার করি তাহ'লে একটি সুন্দর জটিল পাকানো রেখার হীরের ছুরি দিয়ে কেটে ফেলায়। হয়তো সেই হীরের ছুরি পরীদেশের, কিংবা হয়তো স্বর্গীয় কোন চলচ্চিত্রের মতই সত্য জিনিস। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের এবং কাব্য সমালোচনা-বিদ্যার নতুন নতুন আবর্তনে বিশ্লেষকেরা এই আশ্চর্য গিঁটগুলো—আমি যতদূর ধারণা করতে পারছি—মাথার ঘায় পায়ে ফেলে খুলতে চেষ্টা করছেন। ব্যক্তিগতভাবে এ সম্বন্ধে আমি কি বিশ্বাস করি—কিংবা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবার মত কোন দৃঢ়বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছি কিনা এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলবো না আমি আর। কিন্তু যাঁরা বলেন সম্পূর্ণ আত্মভাবে—পৃথিবীর কিংবা স্বর্গীয় দেশের বিগত ও বর্তমান কাব্যবেত্তাদের চিত্তের চমৎকারগুলো দীক্ষিত হ'য়ে নিয়ে কবিতা রচনা করতে হবে তাঁদের এ বাণীর সম্পূর্ণ মর্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারলাম না। কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খণ্ডবিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চলচ্চিত্রের আঘাতে উদ্বিগ্ন মুহূর্তের সচেতন অনুভবও এক এক সময় যেন থেমে যায়,—একটি-পৃথিবীর অন্তকাল-ও-অন্তহীনতার একটি বোধের মতন যেন জেগে ওঠে হৃদয় এবং ধীরে ধীরে কবিতা জনমের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে

সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়, যার ভিতরে সমাজশিক্ষা, লোকশিক্ষা, নানারকম চিন্তার আয়াস ও মতবাদের প্রাচুর্যই পাঠকের চিত্তকে খোঁচা দেয় সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে বেশী ক'রে, কিন্তু তবুও যাদের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী, পাঠকের মন কোনো আনন্দ পায় না, কিংবা নিরক্ষরের হৃদ্‌যোগ করে শুধু, এবং ক্ষুধাই কাব্যরসীদের আত্মা খুঁজে বেড়ায়।

আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যা খচিত অতিরিক্ত সৌন্দর্য্য হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তা হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক্-কবিত হয়ে কবিতার কলাদেহে যদি দেহ দিতে যায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আত্মা তাহ'লে কবিতা সৃষ্টি হয় না—পদ্য লিখিত হয় মাত্র—ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু। কিন্তু আমি আগেই বলেছি কবির প্রণালী অন্যরকম, কোনো প্রাক্‌নির্দিষ্ট চিন্তা বা মতবাদের জমাট জানা থাকে না কবির মনে—কিংবা থাকলেও সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিরস্ত ক'রে থাকে কল্পনার আলো ও আবেগ; কাজেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রভৃতি কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে নিদ্রা, উদাসিনী ও যত্নের কবিতার মত লুকিয়ে থাকে যেন। লুকিয়ে থাকে; কিন্তু নিবিষ্ট পাঠক তাদের সে সংস্থান অনুভব করে; বুঝতে পারে যে তারা সমস্তির ভিতরে রয়েছে, অসংশ্লিষ্ট পীড়া দিচ্ছে না; কবিতার ভিতর আনন্দ পাওয়া যায়; জীবনের সমস্যা ঘোলাজলের মুর্বিকাগুলির ভিতর শালিখের মত ধান না ক'রে বরং যেন ফলে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের শান্ত রৌদ্রের মত;—সৌন্দর্য্য ও নিরাকরণের স্বাদ পায়।

এ না হ'লে আমরা জিজ্ঞাসা ও চিন্তার জন্য কেন সূত্রগুলির কাছে যাব না, বস্তুদর্শনের কাছে যাব না, বেদান্তের কাছে যাব না, যাব ও তারবিদ্‌ কাছে না গিয়ে? জীবনের ও সমাজের ও জাতির সমস্যার সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট আলোক চাই—অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন, মহাত্মা গান্ধি, পণ্ডিত জওহরলালের নিকট যাব না কেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নিকট না গিয়ে? দার্শনিক বার্গসঁর কাছে যাওয়া উচিত,

ইংলণ্ডের বা ফরিয়ার অর্থনীতি ও সমাজনীতিবিদ গুরু ও কর্মীদের নিকট যাওয়া উচিত—ইয়েটসের কাব্যের নিকট এমন কি এলিয়ট ইত্যাদির কাব্য-প্রচেষ্টার নিকটেও নয়।

এখন আমি আর একটা কথা বলতে চাই খানিকটা অত্যুক্তি ক'রেই যেন, অথচ যা অত্যুক্তি নয়—আমার কাছে অন্তত সত্য ব'লে মনে হয়: কাব্যের ভিতর লোকশিক্ষা ইত্যাদি অর্থনীতিবিদের মত একান্ত হ'য়ে থাকে না; যান, ফুল বা মানবীর প্রকৃত সৌন্দর্যের মত নয়; তাদের সৌন্দর্যকে সার্থক ক'রে কিন্তু তবুও সেই সৌন্দর্যের ভিতর গোপনভাবে বিধৃত থেকে উপরেখার মত যে জিনিসগুলো মানবী বা ফুলের সৌন্দর্যের আভার মত মনোগ্রাহীকে প্রথম ও প্রধানভাবে মুগ্ধ করে না—কিন্তু পরে বিবেচিত হয়—অবসরে তার বিচারকে তৃপ্ত করে। যারা এ কথা স্বীকার করেন না, যারা বলতে চান যে কবিতার ভিতর প্রথম প্রধান মর্মবীর জিনিস কিংবা সৌন্দর্যের দলে একান্ত হ'য়ে সৌন্দর্যের মতই প্রধান জিনিস হচ্ছে লোকশিক্ষা বা দর্শন বা নানারকম সমস্যার উদ্ঘাটন, তাঁদের আমি এই কথা বলতে চাই যে মানুষ—সে যে অনৈতিহাসিক শতাব্দীতেই প্রথম হোক না কেন—একটা বিশেষ রস সৃষ্টি করল যা ধর্ম বা বিজ্ঞানের রস নয়—যাকে বলা হ'লো কাব্য (বা শিল্প)—যার কতগুলো স্বাধীন পদ্ধতি ও বিকাশ হয়েছে; যার আস্বাদে আমরা এমন একটা তৃপ্তি পাই, বিজ্ঞান বা দর্শন এমন কি ধর্মের আস্বাদেও যা পাই না—এবং ধর্ম বা দর্শনের ভিতরে যে তৃপ্তি পাই কাব্যের ভিতর অবিকল তা পাই না; পৃথিবীর শতাব্দীস্রোতের ভিতর মানুষ যদি এমন একটা বিশেষ রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করল (কিংবা হয়তো অমানব কেউ মানুষের জন্য সৃষ্টি করলো) —কি করে সেই বিচিত্রতার নিকট তার অনধিগত, অতিরিক্ত দাবী আমরা করতে পারি? কিংবা সেই সব দাবী কবিতা যদি মেটাচ্ছে বা মেটাতে পারে, ব'লে মনে করি তাহ'লে তার জন্য ধর্ম অকল্পুর নয় আর; তার বিশেষ সিদ্ধির কোনো প্রয়োজন নেই। সে যা দিতে পারে, ধর্মও তা দিতে পারে। সমাজসংস্কারক, জাতিসংস্কারক মনীষীরা এমন-কি কর্মীরাও তা দিতে পারে। তাহ'লে কাব্যের স্বকীয় সিদ্ধির কোনো প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আমি জানি

কাব্যের নিজের ইনটিগ্রিটির প্রয়োজন রয়েছে। ... দর্শন বা সমাজসংস্কার বা মানুষের কর্ম ও মননের জগতে অন্য কোনো বিকাশের ভিতর এই কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ঠিক এই ধরনের সাযুজ্য নেই।

হতে পারে কবিতা জীবনের নানারকম সমস্যার উদ্‌ঘাটন; কিন্তু উদ্‌ঘাটন দার্শনিকের মত নয়; যা উদ্‌ঘাটিত হ'লো তা যে কোনো জগতের থেকেই হোক আসবে সৌন্দর্যের রূপে, আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে। যদি তা না দেয় তাহ'লে উদ্‌ঘাটিত সিদ্ধান্ত হয়তো পুরোনো চিন্তার নতুন আবৃত্তি, কিংবা হয়তো নতুন কোনো চিন্তাও (যা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে,) কিন্তু তবুও তা কবিতা হ'ল না, হ'ল কেবলমাত্র মনোবীজরাশি। কিন্তু সেই উদ্‌ঘাটন—পুরোনোর ভিতরে সেই নতুন কিংবা সেই সত্যের নতুন যদি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করতে পারে, আমার সৌন্দর্যবোধকে আনন্দ দিতে পারে তাহ'লে তার কবিতাগত মূল্য পাওয়া গেলো; আরো নানারকম মূল্য—যে সবের কথা আগে আমি বলেছি—তার থাকতে পারে, আমার জীবনের ভিতর তা আরো খানিকটা জ্ঞান বীজের মত ছড়াতে পারে, আমার অনুভূতির পরিধি বাড়িয়ে দিতে পারে, আমার দৃষ্টিশূলতাকে উঁচু মঠের মত যেন একটা মৌন সুদীর্ঘ আরোহের আস্বাদ দিতে পারে; এবং কল্পনার আভায় আলোকিত হ'য়ে এ সমস্ত জিনিস যত বিশাল ও গভীরভাবে সে নিয়ে আসবে কবিতার প্রাচীন প্রাসাদ—ততই মানুষের নূতনতম রূপপরিবর্তনের স্বীকৃতি-ও-আবেগের মত জমতে থাকবে। ... ...

আমি বলতে চাই না যে কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই; সম্বন্ধ রয়েছে—কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকটভাবে নেই। কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুই রকম উৎপাদন; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি ক'রে কবির বিবেক পাচ্ছে পায়, তার কল্পনা রবীন্দ্র শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়। কিন্তু সাধারণত বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি তার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন

তবুও কাব্যের ভিতর থাকে না : আমরা এক নতুন প্রদেশে প্রবেশ করেছি। পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায় কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দ্বীপ ছেড়ে দিয়ে এক নতুন প্রদ্বীপের কল্পনা করা যায়—তাহ'লে পৃথিবীর এই দিন, রাত্রি, মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধুলো, সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে যা কাব্য ;—অথচ জীবনের সঙ্গে যার গোপনীয় যুক্তক-লালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ : সমুদ্রের ধূসরতা ও নূতনতা। সৃষ্টির ভিতর যাকে যাকে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আস্বাদ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংস্পর্শ লাভ করা যায়—কিংবা প্রকৃত চেতনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথাও যেন ছিল ;—এবং চকুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে আরো অনেকখানি পদার্থ, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান যৌত্রালোক পর্যন্ত কোথাও যেন হয়ে যাবে : —এই সবের অপরূপ উদ্দীপনের ভিতরে এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়,—নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমনি হৃদয়শক্তির প্রদেশ হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতর ;—এবং সেই প্রতিফলিত অনুভূতাবিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ ক'রে ওঠে যেন, সুরের জন্ম হয় ;—এই যন্ত্র ও সুরের পরিণয় শুধু নয়, কোনো কোনো মানুষের কল্পনা মনীষার ভিতর তাদের একেছত্রতা ঘটে—কাব্য জন্মলাভ করে।

কবিতা মুখ্যত লোকশিক্ষা নয় ;—কিংবা লোকশিক্ষাকে হৃদে মণ্ডিত ক'রে পরিবেশন—না, তাও নয় ; কবির সেরকম কোনো উদ্দেশ্য নেই। 'কিছু লিখায়' কিংবা 'কলাকা'র কবিতায়—এবং পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যেই কবির কল্পনা-প্রতিভার বিস্ফুরণে, কিংবা তার সৃষ্ট কবিতার ভিতর সেরকম কোনো লক্ষ্যের প্রাবাল্য নেই। কবিতাপাঠ হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র ঘটনা : যার পরিচয় দিয়েছি ইতিপূর্বে। কিন্তু তবুও কবিতার সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সমস্ত অন্তত দুই রকম। প্রথমত শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে মানুষের তথাকথিত সমাজকে বা সভ্যতাকেই শুধু নয় এমন কি সমস্ত অমানবীয় সৃষ্টিকেও যেন তা ভাঙছে—এবং নতুন ক'রে গড়তে চাচ্ছে ; এবং এই সমস্ত

যেন সমস্ত অনন্তদিন ছুট দিয়েছে কোনো একটা সুদীর্ঘ আনন্দের দিকে। এই ইঙ্গিত এত রোমাঞ্চকর, গভীর ও বিরাট, অথচ এত সূক্ষ্ম যে ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতা তাকে উপেক্ষা করলেও (সব সময় উপেক্ষা করে না যদিও) এই ইঙ্গিতের প্রভাবে তারা অতীতে উপকৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকভাবে উদ্ধার লাভ করতে পারে। এই জন্যই সমস্ত অতীত ও বর্তমান শ্রেষ্ঠ কাব্য তাদের নিজের প্রণালীতে মানুষের চিত্তকে যত বেশী অধিকার করতে পারবে সভ্যতার তত বেশী উপকার। কিন্তু খ্রীস্টান পাদরিরা যেমন অনন্তার হাজার হাজার ধর্মমাইলের দিকে তাকিয়ে বাইবেল বিতরণ করেন শ্রেষ্ঠকাব্য সেরকমভাবে বিতরিত হবার জিনিস নয়। • • •

আসল প্রশ্ন হচ্ছে চিত্তের হয়ত পরিবর্তিত হওয়া দরকার; কিন্তু সেই পরিবর্তন আসবে যে? সেই পরিবর্তন হবে কি কোনোদিন?—যাতে তিন হাজার বছর আগের জনসাধারণ কিংবা আজকের এই কিলোল চিত্তের মত জনসাধারণ থাকবে না আর? যাতে এলিজাবেথের সময়ের ইংলণ্ডে কিংবা ধরা যাক উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সব শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হয়েছে গল-পাঠক সে সবের গভীর বোদ্ধা হয়ে দাঁড়াবে? ভাবতে গেলেও হাসি পায়। কিন্তু তামাশার জিনিস নয় হয়তো। যখন দেখি শুধু তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পী ও চিত্রশিল্পীই শুধু নয়, এদিককার উচ্চতর শিল্পীরাও দিকে দিকে স্বীকৃত হচ্ছে তখন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় প্রথম শ্রেণীর কবি নির্বাসিত হয়ে রয়েছে কেন? কিন্তু যখন দেখি তথাকথিত সভ্যতা কোনো এক হাঙ্গর হস্তীজননীর মত যেন বুদ্ধিখলিত দাঁতাল সন্তানদের প্রসবে প্রসবে পৃথিবীর ফুটপাথ ও ময়দান ভরে ফেলছে তখন মনে হয় যে কোনো সুস্থতা, পুরোনো দেহ ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিরুদ্ধে যা, পুরোনো প্রদীপকে যে অদৃশ্য হাত নতুন সংস্থানের ভিতর নিয়ে গিয়ে প্রদীপকেই যেন পরিবর্তন ক'রে ফেলে, তার এই সাময়িকতা ও সমন্বহীনতার গভীর ব্যবহার যেন মুষ্টিমেয় দীক্ষিতের জন্য শুধু—সকলের জন্য নয় —অনেকের জন্য নয়।

কিন্তু তবুও সকলের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে কি? কবে? কে আনবে? কবিকে কি শিক্ষার অধিনায়ক সাজতে হবে? সৌন্দর্যপ্রবাহে স্নাত করে

বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে হবে ? প্রত্যাগ্যাতা করতে হবে ? ডিক্টেটর মানতে হবে জীবনের সমৃদ্ধি ও সুষমার সাধনায় উদ্বুদ্ধ হবে ? যদি কোনো শেষ বৈকালিক ইন্দ্রজালে আজকের এই সত্যতার মোড় ঘুরে যায় তাহ'লে কবিকে কিছুই করতে হবে না আর : তার নিজের প্রতিভার নিকট তাকে বিনম্র থাকতে হবে শুধু কতিপয়ের হাতে তার কবিতার দান অর্পণ করে। যে কতিপয় হয়তো ক্রমে ক্রমে বেড়েও যেতে পারে—মানুষের হৃদয় তার পুরোনো আলোয় অন্ধলোকের ভিতর আর থাকতে পারছে না বলে। ● ● ●

কিন্তু সভ্যতার মেঘ ও ইন্দ্রধনুশ্রির যদি পুনর্যৌবন না ঘটে, তিনি তৃতীয় শ্রেণীর কবি নন, অন্তত যখনতিনি লিখেন মানুষ আমাদের দেশের সাহিত্যকলার সহানুভূতি যার জন্য একটুও নেই তিনি কি করবেন ? তিনি প্রকৃতির সাধনার ভিতরে চলে যাবেন—গহনে গভীরে ঘুরবেন—জনতার স্রোতের ভিতরে ফিরবেন—নিরালায় অন্যমতিকে যেখানে কল্পনা-মনীষার প্রতিক্রিয়া দিয়ে আঘাত করা দরকার নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার জন্য সেই চেষ্টা করবেন ;—আকাশে চলে যাবেন, হয়তো উন্মুখ পদ্মের সঙ্গে ক'রে নিয়ে, প্রকৃতির সাধনার ভিতর :—সেই কোন্ আদিম জননীর নিকটে যেন, নির্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমার নিবিড় কোনো অধিষ্ঠিতির নিকট।

তার প্রতিভার নিকট কবিকে বিনম্র থাকতে হবে ,—হয়তো কোনো একদিন পৃথিবীর সেই কবিতার সঙ্গে তার কবিতারও প্রয়োজন হবে সমস্ত চরাচরের সমস্ত জীবের হৃদয়ে মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের ক্ষেতে ঘুমনের জন্য।

('কবিতা', দিনের সমালোচনা সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৫৪)

জীবনী-পঞ্জী

জন্ম : ১৮৯৯ (৬ ফাল্গুন, ১৩০৫)

শিক্ষা : বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল, ব্রজমোহন কলেজ। বি. এ., ইংরেজি অনার্স, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা, ১৯১৯; এম. এ., ইংরেজি সাহিত্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২১

কর্ম : অধ্যাপনা, কলকাতা সিটি কলেজ (১৯২২-২৮), রামযশ কলেজ, দিল্লি (১৯৩০-৩১), ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল (১৯৩১-১৯৪৮); কলকাতার 'যুগান্তর' দৈনিকপত্রের সাহিত্যবিভাগের সম্পাদনা (ব্রজমোহন কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে) ১৯৪৭; অধ্যাপনা, বড়িশপুর কলেজ, ১৯৪১-৪২, মহিষা কলেজ, ১৯৪৩, হাওড়া গার্লস কলেজ, ১৯৪৩-৪৪

বিবাহ : ১৯৩০ : শ্রীমতী লাবণ্য গুপ্ত (কন্যা : শ্রী মহুশ্রী দাশ : পুত্র : শ্রী নয়ধানন্দ দাশ)

গ্রন্থ : ঝরা পালক, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৯২৮; ধূসর পাণ্ডুলিপি, বি. এম. লাইব্রেরি, ১৯৩৬; বনলতা সেন, কবিভবন, ১৯৪২; মহাপৃথিবী, পূর্বাশা লিমিটেড, ১৯৪৪; সাতটি তারার তিমির, গুপ্ত রহমান অ্যাণ্ড গুপ্ত, ১৯৪৮; বনলতা সেন, সিগনেট প্রেস, ১৯৫২; শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা, ১৯৫৪; নিখিল-বঙ্গ-রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক 'বনলতা সেন' (সিগনেট প্রেস সংস্করণ)-কে পুরস্কার-প্রদান : ১৯৫৩; কলকাতা সেনেট হল কবি-সম্মেলনে স্বরচিত কবিতা-পাঠ : ১৯৫৪

কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্তি : ১৪ অক্টোবর, ১৯৫৪; মৃত্যু, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল, কলকাতা : ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪

[কখনো দুপুরে, কখনো রাত্রির গভীরতায়, তাছাড়া বিকেলের দিকে, নিয়মিতভাবে একাকী বেড়ানোর অভ্যাস ছিল। শহরের পাকচক্রের মাঝখানে ভিড়, হৈ-হট্টগোলে মিলি কেটে, হাটুর নিচে বৃষ্টিটাকে একটু গুটিয়ে তুলে ধরে,

আড়চোখে তাকাতে-তাকাতে চ'লে যেতেন। খুব কম লোকে চিনতে পারতো ইনিই জীবনানন্দ দাশ। দেখা হ'লে একটু লাজুক চাপা হাসি হাসতেন, যা অত্যন্তই কথা বলতেন দুচার মিনিট, রাসবিহারী এভিনিউ-ল্যান্সডাউনের মোড়ে দাঁড়িয়ে।

১০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা। আমরা কেউ সেদিন মোড়ের কাছাকাছি ছিলুম না। পরদিন একটি কি দুটি বাংলা খবরের কাগজে খবরটা ছাপা হোলো, অনেকেরই চোখে পড়েনি। কোনো কোনো সংবাদপত্রে আরো পরে। কোথাও বা একেবারেই না।

মোড়ের কাছাকাছি রাস্তা পেরিয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরছিলেন, বুঝতে পারেননি পশ্চিম থেকে ট্রামটা কখন হুড় বেগে ছুটে এসে ধাক্কা দেবে। রাস্তার লোকজনেরাই ট্যাক্সি ক'রে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে পৌঁছে দেন। এবং বাড়ির দরজা থেকে এতগুলো গজ দূরে ঘটনাটা ঘটলেও তাঁর বাড়িতে এ-খবর পৌঁছয় তার অনেক পরে, হাসপাতাল থেকে। বুকের অনেকগুলো পাঁজর, কাঁধের হাড়, এবং কোমরের নিচে একখানা পা চূর্ণ হয়েছিল।

সবই করা হয়েছিল, চিকিৎসাবিদ্যার আয়ত্তে যা করা যেতো। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর আহত ফুসফুসে নিউমোনিয়া দেখা দেয়, যেটা আরোগ্য না-করা পর্যন্ত চূর্ণ অস্থি পুনরায় সংস্থাপন করা সম্ভব ছিল না। এই নিউমোনিয়া শেষ পর্যন্ত আরোগ্য করা যায়নি।

তাঁর যাঁরা সমসাময়িক কবি এবং সাহিত্যিক বন্ধু, কলকাতার যাঁরা তরুণ লেখক, এবং তাঁর কবিতার ভক্ত পাঠক, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন মন নিয়ে হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। ডাক্তারি-পড়া তরুণ ছাত্ররা সারারাত্রি শয্যার পাশে উপস্থিত থাকতেন। সারাদিনই দেখা যেতো ব্যাকুল চোখমুখ ছোটোখাটো একটি দল হাসপাতালের বারান্দায় নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন।

২২ অক্টোবর রাত সাড়ে এগারোটায় মৃত্যু হোলো। পরদিন সকালে রাসবিহারী এভিনিউ দিয়ে নীরবে তাঁর দেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে নিয়ে

সেলাম আমরা। তাঁকে যাঁরা জানতেন, ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন, তাঁরা এসেছিলেন। নাতিদীর্ঘ একটি শোকযাত্রীর দল।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় জানতে চাইলেন একজন—'কে গেলেন?' লোহিয়ে যেতে-যেতে শুনলাম—'জীবনানন্দ। জীবনানন্দ দাশ।' 'কী করতেন?' 'কবি ছিলেন।' বলতে-বলতে তাঁরা লাফিয়ে আগিলের বাসে উঠে পড়লেন।

গ্রন্থপঞ্জী

(* চিহ্নিত গ্রন্থ বর্তমানে আমার নেই)

* ঝরা পালক। ১৩৩৪। প্রকাশক 'শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, ২০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।' এক টাকা। ক্রাউন ৮ পেজি, ১০+৯৩। কাগজে বাঁধাই। কবিতার সংখ্যা ৩৪। উৎসর্গ : '—কল্যাণীয়াসু—'। লেখকের ভূমিকা : 'আমার পালকের কতকগুলি কবিতা প্রবাসী, বঙ্গবাণী, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, বিজলী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাকীগুলি নূতন। শ্রীজীবনানন্দ দাশ। কলিকাতা, ১০ই আশ্বিন, ১৩৩৪।'

* ধূসর পাণ্ডুলিপি। অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ ; ডিসেম্বর ১৯৩৬। 'প্রকাশক : জীবনানন্দ দাশ'। নামপত্রে সি. এম. লাইব্রেরির নাম, ঠিকানা মুদ্রিত আছে। দুই টাকা। ক্রাউন ৮ পেজি, ১০+১০১। কবিতার সংখ্যা ১৭। উৎসর্গ : 'বুদ্ধদেব বসুকে'। কাপড়ে বাঁধাই, জ্যাকেট সংবলিত। প্রচ্ছদশিল্পী : অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। লেখকের ভূমিকার অংশ : 'আজ ন'বছর পরে আমার দ্বিতীয় কবিতার বই বার হ'ল। এর নাম "ধূসর পাণ্ডুলিপি" এর পরিচয় দিচ্ছে। এই বইয়ের সব কবিতাই ১৩৩২ থেকে ১৩৩৬ সালের মধ্যে রচিত হয়েছে। * * * আজ সেসব মাসিকপত্রিকা আর নেই—প্রগতি, ধূপছায়া, কল্লোল—এই বইয়ের প্রায় সমস্ত কবিতাই সেই সব মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল একদিন। সেই সময়কার অনেক অপ্রকাশিত কবিতাও আমার কাছে রয়েছে —যদিও ধূসর পাণ্ডুলিপির অনেক কবিতার চেয়েই তাদের দাবি একটুও কম নয়—তবুও সম্প্রতি আমার কাছে তারা ধূসরতর হ'য়ে বেঁচে রইল। আশ্বিন ১৩৪৩। জীবনানন্দ দাশ'।

* বনলতা সেন। পৌষ ১৩৪৯, ডিসেম্বর ১৯৪২। কবিতাভবনের 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশক : জীবনানন্দ দাশ। চার আনা। ডিমাই ৮ পেজি, ১৬। কবিতার সংখ্যা ১২। কাগজের মলাট। প্রচ্ছদশিল্পী : শচু সাহা।

* মহাপৃথিবী। ১৩৫১। 'পূর্বাশা লিমিটেড, সি ১৩ সত্যেনচন্দ্র এভিন্যু,

কলিকাতা হইতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সেট টাকা। রয়্যাল ৮ পেজি, ৮+৪০। কবিতার সংখ্যা ৩৫। ('বনলতা সেনে'র ১২টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত।) উৎসর্গ: 'প্রেমেন্দ্র মিত্র সজনী ভট্টাচার্য প্রিয়বরেষু'। বোর্ড, ন্যাকেট সংবলিত। লেখকের ভূমিকা: '"মহাপৃথিবী"র কবিতাগুলো ১৩৪৬ থেকে ১৩৫৪-৫৮এর ভিতর রচিত হয়েছিল; বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বেরিয়েছে ১৩৪২ থেকে ১৩৫০এ। বনলতা সেন ও অন্য কয়েকটি কবিতা বাদ হয়েছিল 'বনলতা সেন' বইটিতে। বাকী সব কবিতা আজ প্রথম বইয়ের ভিতর স্থান পেল। ১৩৫১ শ্রাবণ, জীবনানন্দ দাশ'।

সাতটি তারার তিমির। অগ্রহায়ণ ১৩৫৫। রচনাকাল ১৩৩৪-১৩৫০। 'প্রকাশক: আশু গুপ্তের বহুমান'। নামপত্র: 'গুপ্ত বহুমান অ্যান্ড গুপ্ত কলিকাতা'। আড়াই টাকা। ডিমাই ৮ পেজি, ৬+৮০। বোর্ড; প্রচ্ছদপট: সত্যজিৎ রায়। কবিতার সংখ্যা: ৪০। উৎসর্গ: 'হুমায়ুন কবির বন্ধুবরেষু'।

বনলতা সেন। শ্রাবণ ১৩৫৪। রচনাকাল ১৩৩২-১৩৪৯। দুই টাকা। 'প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত সিগনেট প্রেস ১০।২ এলগিন রোড কলকাতা ২০'। ডিমাই ৮ পেজি, ৪৯। বোর্ড; প্রচ্ছদপট: সত্যজিৎ রায়। কবিতার সংখ্যা ৩০। (কবিতাভবন 'বনলতা সেনে'র ১২টি এবং 'মহাপৃথিবী'তে প্রথম প্রকাশিত ২টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত।)

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। বৈশাখ ১৩৬১, মে ১৯৫৪। পাঁচ টাকা। 'প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু, নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩'। রয়্যাল ৮ পেজি, ১৩৬। বোর্ড, 'প্রচ্ছদচিত্র শ্রীইন্দু দুগার কর্তৃক অঙ্কিত'। কবিতার সংখ্যা ৭২ (বনলতা সেন, ৩; ধূসর পাণ্ডুলিপি, ১০; বনলতা সেন, ১; মহাপৃথিবী, ১৩; সাতটি তারার তিমির, ১৯; ইতিপূর্বে গ্রন্থে অপ্রকাশিত, ১৪; ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত, ৪)। লেখকের ভূমিকার অংশ: 'এই সংকলনের কবিতাগুলো শ্রীযুক্ত বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় আমার পাঁচখানা কবিতার বই ও অন্যান্য প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা থেকে সঞ্চয় করেছেন, তাঁর নির্বাচনে বিশেষ শুদ্ধতার পরিচয় পেয়েছি। বিন্যাস-সাধনে মোটামুটিভাবে রচনার কালক্রম অনুসরণ করা হয়েছে। কলকাতা, ২০. ৪. ১৯৫৪, জীবনানন্দ দাশ'।

পৌষ ১৩৬১

'কবিতা'য় প্রকাশিত জীবনানন্দর কবিতার তালিকা

(* চিহ্নিত কবিতা কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি)

বর্ষ ১

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৪৭ ধূসর পাণ্ডুলিপি
* ধূসর পাণ্ডুলিপি
* বনলতা সেন (হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি) বনলতা সেন :
কবিতাভবন
* বুড়ি বছর পরে (আবার বছর বুড়ি পরে একদিন তার সাথে)
ব. সে : (জ. ভ.)
* ঘুম জাগানো (ছাদা ছেড়ে ঘুরে ঘুরে পড়ে যেন ঘাসের উপরে)
* ঘাস (কতো বেবুলোনীয় ছেলে সমুদ্র আসিয়াছে) ব. সে : (জ. ভ.)

সংখ্যা ৩, চৈত্র * হাওয়ার রাত (পরীর হাওয়ার রাত ছিল কাল)
* আমি যদি হতাম (আমি যদি হতাম বনহংস)
* হায়, চিল (হায় চিল, সোনালি ডানার চিল)

সংখ্যা ৪, আষাঢ় * পঙ্‌ক্তিমালা (কারাগারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে)
* ঘুমের চিল (পৌষের ঘুমের পাখা উড়ে যায়)

বর্ষ ২

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৪৮ * নয় নির্জন হাত (আমার আকাশে অন্ধকার) ব. সে : (জ. ভ.)
* শিকার (ভোর—আকাশের রং) ,,
* 'বলিল অশ্বত্থ সেই' (বলিল অশ্বত্থ ধীরে : কোনদিকে যাবে) মহাপৃথিবী
* নদী (ঘাঁটির ঘোল তনু—শালিখাবদনা ঘাড়)
,, * হাজার বছর শুধু খেলা করে (হাজার বছর শুধু) ব. সে :
দিনরাত্রির সেতু

সংখ্যা ২, পৌষ ,, * সিন্ধুসারস (দুই এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের পিঙ্গল ফেনে) মহাপৃথিবী
,, * রাত্রিবাসা ঘাসে (একখানি নক্ষত্রের দিকে চাই) মহাপৃথিবী :
পরিবর্তিত নাম 'নিঃসঙ্গতা'
,, * অন্ধ (পাণ্ডুলিপি রাখে ঢেকে ঘুমন্ত নীলিমা কাঁদে আমি) ,,
,, * রাত্রিবেলা (অন্ধের ভিতরে পৃথি—কাস্তের জ্যোৎস্নার ভিতরে)
ব. সে : (জ. ভ.)

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২

সংখ্যা ৩, চৈত্র	প্রাণপণ্ডাত (প্রাহকের প্রতীয় অভ্যর্থনায় ছাতে)	মহাপৃথিবী
,,	বিড়াল (সাধারণির একটা বিড়ালের সাথে) ব. সে :	(ক. ভ.)
সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৫৪	আদিম জেলেডাঙা (আজন্ম ডাঙাসে অন্ধ :)	মহাপৃথিবী
	দুপুর (আকাশে জ্যোৎস্না,—ঘরের পথে)	,,

বর্ষ ৩

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৫৩	ও বৈমাত্রিকা। (বৈমাত্রিকী, আইবাসে বেঞ্চাসে তুমি)	সাতটি আকাশ
	ফিরিব : পরিবর্তিত নাম 'আকাশলীনা' (দুরন্তনা, আইবাসে বেঞ্চাসে' তুমি)	
	ফিরে এসো (ফিরে এসো মধুমেহ ঘরে)	ম. পৃ.
	ইয়াকেরি ভাসে (একবার মস্কোর পাশে ফেরে)	,,
,,	সমাবেশ (সব ফিরেই তুমি বেঞ্চাসে')	সা. ভা. ফি.
সংখ্যা ২, পৌষ	ইট খাও (এই সব ইটের ভাতে আমার হৃদয়ে)	ম. পৃ.
	• ইটখোলা (অজস্র ধূমের চিমে পাখা মেলে)	
,,	ঘাসের জমিরা (ঘাসেরা জমিয়া এসে বলে ঘরে) ব. সে :	(বি. ফে.)
	ফুটিল পৌষের (তারপর একটির উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত এসে)	ম. পৃ.
	কমলালেবু (একবার যখন ফেরের থেকে মেয় হ'তে যাব)	ব. সে : (বি. ফে.)
সংখ্যা ৩, চৈত্র ,,	আট বছর আগের একদিন (সোনা ফেল লাশকাটা ঘরে)	ম. পৃ.

বর্ষ ৪

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৫৪	আজকের এক মুহূর্ত (হে মৃত্যু, তুমি আমাকে)	ম. পৃ.
সংখ্যা ২, পৌষ	ফিউনরাল (কাফনের ফোকরে দুর্গ ঘরে)	সা. ভা. ফি.
,,	• তার চির প্রেমিকের প্রিয়াই—কোনো ঈর্ষান্বিতা (বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই,—আমি বলিনি তা)	
,,	প্রার্থনা (আমাদের প্রভু যীশুর দাও)	ম. পৃ.
সংখ্যা ৩, চৈত্র ,,	• অগ্নি (আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নি, হে সন্তান প্রথম জন্মুক তব ঘরে)	
সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৫৮	• উদয়াস্ত (পূর্বের উদয় দেখলা সমস্ত নদী)	
,,	শহর (হলদে, অনেক বড় বড় শহর ফেলের তুমি)	ম. পৃ.
,,	শব (যেখানে কলাদি জ্যোৎস্না ঝিলিমিলে)	ম. পৃ.

বর্ষ ৫

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৫৯	• সুমেরীয় (জলে ঘুলো উঠে ঘর)	

কবিতা

পৌষ ১৩৬১

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৫০ • মৃত্যু (হাতের ভিতর দিয়ে আমা ঈত যোর করে)
.. • আশ্বিনশেষ অন্তরায় (মৃত্যুই মৃত্যুর মতো,—আশ্বিনেরে প্রতিশ্রুতি)
সংখ্যা ২, কার্তিক • বেদনা (আজ হাতে মনে হয়)
• সিংহদর্প (সূর্যের গৌরবে বসে প্রাণে আশা আশ্বিনেরে)
সংখ্যা ৩, পৌষ ১৩৫৩ • বিস্ময় (অতলের যা সুন্দর অমানবের দেশে)
সংখ্যা ৪, চৈত্র .. • নাস্তিনীড়, আকাশবিহীন (কোথায় সূর্যের শেষ ধূসর ধূসর অস্ত বিয়ে)
• শান্তি (জীবন কি শীতের সম্রাট এক তুষারোহ)
.. • যে ছন্দে (হেমন্তের, একদিন মিলে যুগি নদী)
সংখ্যা ৫, আষাঢ় ১৩৫৭ সংসারীজ (আশ্বিনের যম যম আইবাসে হতেছিল আসা ?) স. সু.

বর্ষ ৬

সংখ্যা ১, আশ্বিন .. • ১৩৫৬—৫৮ শ্রাবণে (অনেক চিন্তার সূত্র সমবায়ে)
পৌষ রাত্রি (রাইচাপা খুলে দিয়ে মুখরোপী) স. ভা. ভি.

বর্ষ ৭

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৫৮ • খাদ (হরণ তাহার মেঘ কৌটভারে ফেলে যেন্ত)
.. • সন্নিহিতেষু (শ্রীবাসে বিদেহের সন্নিহিতে অমরার লোক)
সংখ্যা ৩, পৌষ • কোরাস (অতীত বিশাল মুক্তি মধুমেঘ প্যারে)
সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৫৯ অভাব (যদিও আমার কোথে মেঘ নহী) স. ভা. ভি.

বর্ষ ৮

সংখ্যা ২, কার্তিক .. বিদিয়ে তোমায় (পৃথিবীতে মেঘ দিন যোর থেকে) স. ভা. ভি.
সংখ্যা ৩, পৌষ • বোধন (একটি মীরব লোক মাঠের উপর দিয়ে)

বর্ষ ৯

সংখ্যা ৩, পৌষ ১৩৫০ তিমিরহননের গান (কোনো দূরে কোথাও নদীর ঢেউয়ে) স. ভা. ভি.

বর্ষ ১১

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৬২ মরুসমুদ্রোত্তির গানে (কে পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের দিকেরে) স. ভা. ভি.

বর্ষ ১২

সংখ্যা ৩, চৈত্র ১৩৬৫ • নাগালের (এখন কিছুই নেই—এখানে কিছুই নেই আর)

কবিতা

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২

বর্ষ ১৫

সংখ্যা ৭, চৈত্র ১৩৫৩ অন্ধকার (গভীর অন্ধকারের মুখ থেকে মহীর অগ্রহণ)
ম. সে : (দি. প্রে.)

সংখ্যা ৩, বৈশাখ ১৩৫৭ চ'ণ্ডীদাস (আমাকে খোঁজো না তুমি যদিদিন) ম. সে : (দি. প্রে.)

বর্ষ ১৬

সংখ্যা ৩, আষাঢ় ১৩৫৮ দুর্বলতা (একদিন হাত ছেড়ে আমি) ম. সে : (দি. প্রে.)
" শিরীষের ডালপালা (শিরীষের ডালপালা দেখে আজ) "
" তুমি (অন্ধকারে চলাফেরা ইশারায় তারিখিতে) "

সংখ্যা ৪, আশ্বিন " • আমাকে একটি কথা দাও (আমাকে একটি কথা দাও)
" ধান কাটা হ'য়ে গেছে (ধান কাটা হ'য়ে গেছে কবে বেন)
ম. সে : (দি. প্রে.)
" আমাপ্রার্থনা (আমি আমি তোমার ছুতোর আজ) "

বর্ষ ১৭

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৫৯ আছে (এবার চৈত্রের দিন নিতে আসে) ছোট কবিতা
সংখ্যা ৩, চৈত্র " • যাত্রী (মানুষের জীবনের শেষ গল্প শেষ)
" • ওগো, তুমি (ওগো, তুমি সেই মানীকে ভালোবেসো)
সংখ্যা ৩, আষাঢ় ১৩৬০ Disposition (অনুবাদ : শ্রীমতী লীলা রায়) (মূল কবিতা । অজ্ঞাত ।
দা. ভা. ডি.)
Darkness (মূল কবিতা : অন্ধকার । অনুবাদ : শ্রীবোমকেশ লাহা)
ম. সে. (দি. প্রে.)

বর্ষ ১৮

সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৬০ • একটি মন্ত্রম আসে (একটি মন্ত্রম আসে ।)

'বৈশাখী'তে প্রকাশিত কবিতার তালিকা

বর্ষ ১,
১৩৫৮ অবশেষে (এখানে এখনও সূর্য খেলা করে উঁচু উঁচু ঘাস) ম. সে. : (দি. প্রে.)

বর্ষ ২,
১৩৫০ ঘুম (দাতীঁ ঘুম থেকে জেগে অপরাহ্নে) দা. ভা. ডি.

বর্ষ ৩,
১৩৫১ মাঝিনী (কেমন ঘুমায়ে থেকে পৃথিবীর তীরাদের থেকে) দা. ভা. ডি.
• নতুন পাখা (কেমন ছড়ানো সবা ডানাগুলো দাতাদিন)

বর্ষ ৪
১৩৫২ বীথি (তোমার নিকট থেকে বহুদূর দেশে) দা. ভা. ডি.

গত প্রবন্ধের তালিকা

বুদ্ধদেব বসুর 'কলাবতী'র সমালোচনা	কবিতা	বর্ষ ৩	সংখ্যা ৪	পৌষ ১৩৩৪
কবিতার কথা	—	—	বিশেষ সংখ্যা	বৈশাখ ১৩৩৫
অমলকুমার কবিতা	—		অগ্রহায়ণ-সংখ্যা, বর্ষ ১০, সংখ্যা ৩,	
				ফাল্গুন-পৌষ ১৩৪১
কবিতা, তার আলোচনা	পূর্বাশা	বর্ষ ১৪	সংখ্যা ১	বৈশাখ ১৩৫৬
কবিতা পাঠ	—	—	— ৫	আষাঢ় —
বেদকাল ও কবিতা	—	—	— ৬	আশ্বিন —
সত্তা, বিশ্বাস ও কবিতা	—	—	— ১০	মাঘ —
কবি, বিচার ও অন্যান্য কথা	—	—	— ১১	চৈত্র —
বুদ্ধিজিজ্ঞাসা ও ধারাবাহী	—	বর্ষ ১৫	সংখ্যা ১	বৈশাখ ১৩৫৯
আমার মা ও বাংলা	উত্তরসূরী	জীবনানন্দ-সংখ্যা		(পৌষ ১৩৬১

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)

[অন্যান্য সাময়িকপত্রে প্রকাশিত জীবনানন্দের কবিতার তালিকা (নাম ও প্রথম পংক্তি) সম্পাদক বা কোনো অনুরাগী পাঠক সংকলন ক'রে পাঠালে আমরা পরবর্তী সংখ্যায় সাদরে তা প্রকাশ করবো। জীবনানন্দের অন্য কোনো প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধের আমরা সন্ধান পাইনি, যদি অন্য কারো জানা থাকে তাহ'লে প্রবন্ধের ও পত্রিকার নাম এবং প্রকাশের তারিখ উল্লেখ ক'রে আমাদের জানালে আমরা বাধিত হই।

এই সুযোগে জীবনানন্দের এখনো গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রে অপ্রকাশিত কবিতার, ও কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর গ্রন্থের বিষয়ে প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। —সম্পাদক]

জীবনানন্দ দাশের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা

প্রকৃতির কবি : বুদ্ধদেব বসু	কবিতা	বর্ষ ৬ সংখ্যা ৩ ('ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সমালোচনা)
মনলতা সেন : "	"	" ৮ " ৪ ('এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় 'মনলতা সেন'-এর সমালোচনা) এই দুটি প্রবন্ধ পরিমার্জিত আকারে 'কালের পুতুল' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।
জীবনানন্দ দাশ। সঞ্জয় ভট্টাচার্য		'হিমানীর আধুনিক কবি' (১৩৫১, পূর্বাশা লিঃ)
বাংলা কবিতায় নূতন দিক : "		পূর্বাশা বর্ষ ১১ সংখ্যা ৩ আশ্বিন ১৩৫১
কবি জীবনানন্দ। অজিত দত্ত		আনন্দবাজার পত্রিকা ৩১ আষাঢ়ের ১৩৫৪
জীবনানন্দ দাশ : আলোকানন্দ দাশ		উত্তরসূরী জীবনানন্দ-সংখ্যা, পৌষ ১৩৬১

৩১ থেকে ১১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শ্রীবিভাপ্রসন্ন দত্ত কর্তৃক ৪৩ ফলেপাড়া এভিনিউ পূর্বাশা লিমিটেড-এ
ও ১১৭ থেকে ১৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক ৪৩ ফলেপাড়া এভিনিউ
অরোরা প্রিন্টিং এম্প্লয়িজ লিমিটেড-এ মুদ্রিত

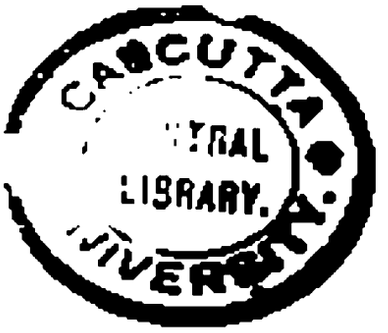

কবিতা
চৈত্র ১৩৬১
উনবিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
ত্রৈমাসিক সংখ্যা ৮১

বোহিনিয়া

বিষ্ণু দে

কোথায় গিয়েছে সেই দিন! তার স্মৃতি
আজ শুধু একাকিত্বে জাগে।
অন্ত হে, সে জীবনের যুদ্ধে বীর কৃতী;
কৃতিত্ব কোথায় বলো স্মৃতির সংরাগে?

সময়ের দুই পিঠে দিয়ে জোড়াতালি
একজন আরও দেখে নিবিড় আকাশ,
সেই ঘর, তারলার পাশে বোহিনিয়া,
সে গাছে দুজন লোক এক অবকাশ
জোড়ে জোড়ে গেঁথেছিল।
আজ একজন
সে গাছে খোঁজে না ফুল, ভেসিয়া ভিনিয়া
সিঁড়ির গুধারে টবে রাখে তার মালী।

অন্ত ঘরে সেই ফুল যাদে একজন,
খেয়ারাই আনে খাসকামরায় ডালি।

আমার ঘরের পাশে ঘরে বোহিনিয়া॥

প্রাচীন পৃথিবী আলো

শান্তিকুমার ঘোষ

তারপর উঠলো সে সমুদ্র কেমিল সেই সমুদ্রের থেকে :
অজস্র সন্তানে চুল ঝেঁপে-ঝেঁপে শঙ্খ-মালা কটিদেশ ঢেকে
যেন প্রাচীনা : হাতির দাঁতের থেকে খুঁদে তোলা মুখ
ঈষৎ নামানো : নিটোল মুক্তোর মতো এঁকেছে চিবুক
স্বেদবিন্দু জ'মে : বুকের বল্লুল গুঠ সুমেরু সমান :
নখর-মুকুরে হাঁকা কত মৃত্যু ধ্বংস বড় যুদ্ধ অভিযান···
দুহাতে আগুন ঠেলে সিংহল ডিঙোর ট্রয় দূর দূরান্তরে।
অনেক মুহূর্ত ধ'রে মিলন ধাঁধালো শেষ গায়ারদিরেরা।

প্রাচীন পৃথিবী আলো : অনন্ত ধারনা তবু মানুষের প্রেমে
প্রাণকলাপের ভ্রূণে—রোমীর বিষয়ে এলো শুভ্রধার নেমে।
স্মৃত নগর আজ মলকিত প্রায় তার কোটি জনতায়
চলন্ত সংসার এক সূর্যালোক-ঘ'রে-যাওয়া দীপ্ত আবেদায়।

কিছুই হয় না বলা

সুপ্রাতর চক্রবর্তী

কিছুই হয় না বলা এই দিনরাত্রির আলাপে,
একটি কথায় তবু ধ্বনিছে আকাশ
সহজ ঘুমের স্নেহে সহজ জাগার মতো কাঁপে,
একটি কান্নায় তবু জন্মের আবাস।

ঘরে ও বাহিরে প্রেম নিত্য তাই ছন্দনিশা যাপে।

অগ্রহায়ণ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

হেমন্তের বেলা প'ড়ে আসে :
ক্ষেতে ক্ষেতে ধান কাটা হ'য়ে গেছে সারা ;
খামারে খামারে সোনা, তারা তারা খড় আসে পাশে ;
শুধু ঘাট, শিউ ঘাট ; একমাত্র তারা
অনুদ্বিগ্ন পাণ্ডুর আকাশে ॥

বহস্তের অনঙ্গ অক্ষিণা
মুহূর্মুহু সংঘোষকে ; হতবাক্ ক্রমে
প্রবিষ্ট নিবিড় ছায়া, বহিরঙ্গে বিশীর্ণ মলিমা ;
অবলুপ্ত অবশেষ ইন্দ্রনীল ঘুমে,
ঘরে ঘরে প্রদোষের দিধা ॥

শোষযোগ্য সূত্রে অবস্থিত :
নির্গত স্বেদের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত ক্ষমতা ;
পারিশ্রমিকের ক্লান্তি সর্বাঙ্গে শরীরে কর্ষিত ;
নষ্ট নীড়ে নিবিক্ত সে, অপগত ধমতা,
অবকাশে নির্বেদ বসিত ॥

ঘুম নেই শুধু রক্ত চোখে :
শিথিল সন্ধিতে আজ্য, ধমনীতে হিম ;
কিন্তু সে, এখনও অল্প অস্তমিত সূর্যের আলোকে,
বোঝে না অভাবদোষে রাত্রির মুষ্টির
বয়কটি অক্ষয় অশোকে ॥

কয়েকটি কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

রূপবাতাস

আলাপ

বিকেল-সূর্যের মুখে ঠিক যেন তোরে-পাওয়া মন।
আমি এক মহিলাকে দেখছি এখন।
খানিক মরলা আলো ঘাসে গাছে পাতায় লতায়
দু'জনের চুপ-ক'রে-থাকা ঘিরে, হঠাৎ কথায়
শুধু ঠোঁটে খেলছে বিদ্যুৎ,
শুধু সাবধান গাছে ভবিষ্যৎ আসে রাত্রি-কালি-মাখা ভূত।

আস্বাদী

রাত্রি না হ'লেও যে থেকে যায় শীত।
যেন রাজহাঁস কোনো দূরের-সঙ্গীত
বিদ্বেষের কথা নিয়ে ঘিরে চায় খানিক আমোদ,
রোদ ওঠে ওষ্ঠপুটে, হাসি হয় রোদ,
টানছে মরণভূমি ভুল মন।
নিমূল-খালিকা শুধু মনে একজন
রোমাঞ্চিত হাতে মুখ মুছে দেয়, পুতুল বানায়,
বলে, চুপ, চেয়ে থাকা শুধু আজ তোমায় মানায়।

আতোগ

এক মণ আমনের ধান
তোমায় অ-মনে নিয়ে আসা।
কতো দূর হতে মুক্ত আমার প্রয়াণ।
তবু যে সমুখে এসে তরমুজ-লাল
খানিক গোলাপ-জল মেখে চিরকাল,
জানো ব'লে আমার পিপাসা।

কবিতা
বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৩

তুমি-আমি

[এক]

খানিকটা জল তুমি তবু কী যে সমুদ্রের প্রতি
পাহাড়ের কোলে ছিলে ব'লে
তোমার বীণে কি আছে পাহাড়ের উদাস আকুতি
তুমিও হারাও সব রঙ ধু-ধু সমুদ্রেই দোলে।

[দুই]

একটি নধোড় হাত আমার হাতেই তার মন
প্রৌঢ় হ'তে-হ'তে আজ লোল
আগছে বসন্ত আর বর্ষাও ফুরোল
গাছের পাতায় আর শাখায় তেমনি সব দোল
শুধু হাত খেকে চ'লে গেছে সমীরণ।

[তিন]

কী নেব তোমার চোখ থেকে
কোন দিকে চাওয়া ?
আমার মুখেই ছায়া রেখে
দু'পাশে ছড়োতে পারো, জানি,
আলো আর হাওয়া।
মনে তাই কালোকে বাখানি।

[চার]

তোমার তত্ত্ব যে পিছে টানে
ততোই এগোয় মন ততো বেশি জানে
ততো: বেশি আসে হাত, জানো কি লাইনি,
যন্ত্র লিখছে লাইন শুধু নিরিবিলি।
হয়ত হদ্দ হবে চিঠি
দিনের দৌড়টা না পেলে, ক্ষতি নেই তাতে।
তুমি-আমি আনন্দ যে সব দিনে-রাতে
জাগরণ না থাকলেও থাকবে তা কাজে পিঠাপিঠি।

কবিতা
বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৩

চারটি কবিতা

শামসুর রাহমান

আত্মজীবনীর খসড়া

গলায় রক্ত তুলেও তোমার মুক্তি নেই।
হঠাৎ-আলোয় শিরায় ঘায়ের আবির্ভাব,
আবহেই ওড়া ঝড়ের সবের পাখির ঢেউ।
তাদের হৃদয়ে ফিরিয়ে দেবার যন্ত্র যদি
জানতে, তবে কি প্রতি মুহূর্তে ব্যর্থতার
কাদাবালি মেখে সত্য-তারার আত্মজ্যোতি
কখনো হারায়, লোকনিন্দার তীক্ষ্ণ ছলে
অচিরে বিশ্ব অকালবৃদ্ধ সহজে ব'নে
কেটে যেত কাল আকাশকুসুম জল্পনায়?
তারা যাকে বলে সফলতা তার চিহ্ন তুমি
সারা পথ হেঁটে এখনো কিছুই পাওনি খুঁজে:
সহজ তো নয় স্বর্গসিঁড়ির আশায় বাঁচা।

যার দেখা পেতে চলতি পথের সূর্যোদয়ে
মুহূর্ত তরুণ অবয়বের ঘর পেলো,
অচেনা মাঠের বিহ্বল ঘাসে দাঁড়িয়ে একা,
পেতে চাও ঐ নদীর নিবিড় আবেগে যাকে,
ইচ্ছে-জোয়ারে ভেসে-ভেসে তুমি ঠেকের পথে
নেমে যাও সুখে হঠাৎ বেহিক ইঙ্গিতে
যেমনি আশার সন্ধানে যার দিনের শেষে
প্রণামান্তে কোনো, তাকেই তো বলো সুন্দর, না?
গোলকধাঁধাঁয় তাকে খোঁজা তার সত্য জেনো,

তার জন্যেই অপেক্ষা গানের কত না কলি,
পথ চেয়ে আছো সকল দ্বার প্রতীক্ষায়
কে জানে কখন আসবে সে তার শান্ত পায়ে—
আসবে যেদিন কী দিয়ে বরণ করবে তাকে ?

তোমাকে দীর্ণ ক'রে যারা আসে, প্রস্ফুটিত
পদ্মের মতো সুরভী আভায় কামদুহিতা
ভরায় হৃদয়ে, কোটি জ্যোতিকণা বিলায় মনে,
সমস্ত রাত একা একা ঘুরে চাঁদ-বেহালায়
যাদের খুঁজে, চাও, মরছো যাদের প্রতীক্ষায়
চিনেছো তাদের বহুবার তবু কেন যে এই
লগ্নে রক্তে কুমারীর তীক্ষ্ণ চঞ্চলতা,
আসবেই ওরা—পারবে না তুমি ফেরাতে আর।

ভেবেছো কখনো সুখের সন্ধায় আসন পাওয়া
সম্ভব হবে ? এই যে ভরানো কথার ভালো
ভুবনময় আলো জোনাকি-জীবন, কখনো শুধু
ধূসর পথের স্মৃতিসন্ধায় পাবে কি আলো ?
এ-কথা কখনো আসবে না তবু ভৃত্য হবে।

শহর ভেঙেছে, ধূসর খণ্ডীয় গ্রামের ধ্বনি,
রোদ্দুর শরীরে নামলো নিম্না হাসপাতালে,
যারা কোনোদিন ভুলেও পেলো না আপন ঘর,
ছেঁড়াখোঁড়া সেই ক'জন রাতের ঘুরোনেবের
ক্লান্তিতে কেন ভিজলো মোঁয়াটে বেতোয়ার।
ক্লান্তাবলের সহিস ঘোড়ার পিঠে বুলোয়,
দীতের শুকনো ডালের মতোই ভিত্তি বুড়ো
কেঁপে-কেঁপে তার জলযন্ত্র মনক ঘর,

পথের কুয়াশা হাই তুলে চায় ঘুমোয়, কেউ
জানল না তোর ফুটলো তরুণ ফুলের মতো,
খণ্ডিতা নারী এখন আলোর আলিঙ্গনে।
আছো আছে ভিক্তরীটুকু লুকোনো মনে
সেই গৌরবে উজল তুমি, তখন আমি
বেয়ালে তোমার কাঠকরলার আঁচড় পড়ে।

পূর্বরাগ

জেনেছি কাকে চাই, কে এসে চোখে ফোটে
নিমেষে শরতের খুশির জ্যোতিকণা
কাঁপি না ভয়ে আর বিধায় নেই ভোলা—
এবার তবে রাতে হাজার দীপ জেলে
সাজাবো তার পথ যদি সে হেঁটে আসে।
যদি সে হেঁটে আসে, প্রাণের ছায়াপথ
ফুলের মতো ফুটে তারার মতো ফুটে
জ্বলবে সারারাত, জ্বলবে সারারাত।
জেনেছি কাকে চাই, বলি না তার নাম
জিভের ত্রিসীমায় ; শুধু-ধ্বনি শুধু
হৃদয়ে বলে নাম, একটি মৃদু নাম।

তোমাকেই বলি

ছায়া-ঘ'ষে-আসা ঘুমের পথের
সাঁকো পেরোবার বীর-মুহূর্তে
পাশাপাশি শুধু হেঁটেছি দু'জন ;

যত ছিলাম দায়াবেলা তবু
কিবক্তি তুমি করোনি কিছুই।
মনের কথাটি বলতে যাবার
সময় আমার হয়নি তো।
সন্ত-পাখি-ঘর ফোটে নির্জনে,
সেই কাকলির ভাষার মধুর
আপন কথাটি তোমার হারায়।
হয়তো তেবেছো কোনোদিন কেউ
সেই ঢেউ মেখে হয়নি উতল
যার উত্তরোল কেনার ঘিরে
জমছে আমার ভাষার ঘুড়ো।
দিন-রাত্রির ভাবনার জাল
ফেলে দেবে তুমি কতটুকু পাবে
হৃদয়ের সেই অতল আমার?
নতুন কথার অপরূপ ঘনি
তোমাকে যে দেবো কৌটোয় তুলে
এমন আমার কখনো জানিনি।
প্রাকৃতিক মহাদানের মতোই
তোমার দানের শাস্ত-মধুর
পুরোনো কথাটি নতুন বেদন
—প্রতি বার যদি হৃদয়ের কাছে—
মনের কথাটি তেমনি আমার :
তোমাকেই চাই তোমাকেই চাই।

শিখা

আনন্দময়
পোড়ায় সে নদীর ও গ্রাম,

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৩

সজল শিবির আর মিত্রের পতাকা
সমান প্রতাপ তার। অলক্ষ্যে কখন কী হারায়
পৃথিবী, কে জানে—
হাওয়ায় ঘোরানো কাঁটা শুকনো পাতা, অথবা সত্যতা, তার স্বাদে
নিয়েছি নিজেরই মনে খুঁজে।
দেখি চোখ বুজে
সে যায় অনেক দূরে মনের হাওয়ায়
এবং ঘোমের মৃদু শিখা হ'য়ে কাঁপে তার খোলা জানালায়।

ঘর

জ্যোতির্ময় দত্ত

তোমাকে সম্পূর্ণ ভালোবাসবার আগে আমাকে
দু'এক মিনিট সময় দাও। এ খোলা দেশে একটা
ভালো ঘর অন্তত তুলি। না হ'লে অসম্ভব ভালোবাসা।

জন্ম হবার প্রথম ভোরেই শিখেছি যে শান্তি
বাসা বাঁধে শুধু পদ্মেই আর কবরে, একটা কিন্তু
আবশ্যক চাই, একটা ঘর, অন্তত, যার দুয়োরে খিল,
যেখানে যেছিলেযি পৃথিবী ছিন্ন মনের পাহশালা
হতে না।

তুমিও জানো যে হরিণের বৈতালিকে
সেখানে দিন শুরু সেখানেও নিস্পাহে রাত্রি রক্তিম,
এ-কথা অন্তত জানো যে সময়ের দুজন অনুচর
পাড়ায় পাড়ায় চৌকি দেয়।

গত বসন্তে মনে হয়েছিল
এই বুঝি পৌঢ়দাম দুঃখ-প্রশান্তির নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে,
তখন কৃষ্ণচূড়ার অঙ্গে-অঙ্গে দিগন্তের রক্ত, রঙন, যৌবনের
সমস্ত বিজ্ঞাপন গাছে-গাছে। ছিতে অগ্নিসার যে-পৃথিবী
বসন্তে সেও ছাইল, কিছুমাত্র লাভ নেই, নিজেকে শুধু
সাজায় গোছায়।

বসন্ত গর্ভের মাস, বসন্ত
দিনলগ্নকুল। দুটো চক্ষুই সকল অভিমানের
যাদাহুবাদ শেষ ক'রে পথ নিলো গোপন তালের।

শেষে তুমিও এলে যখন দিনের কলরবের পর পৃথিবীতে
সলজ্জ সন্ধ্যার অভিসার। তুমি এলে আর মনে হ'লো
হঠাৎ আদিগন্ত আকাশ তার বিপুল পাখা মেলে
উড়ে এলো হৃদয়ের সীমিত পরিসরে।

সে আকাঙ্ক্ষা
অনেকালের। আমার বেদনা তাই। যৌবনের সেই
উদ্ভাস মাসেও যেমি এক মৃতপ্রায় বৃদ্ধ কুকুর,
মুখে কালো দাগ, পুরাতন অস্তে দাস দেহ, আমাদের
পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকছে।

আর একটি
যৌবন-ভার, দেহ-উচ্ছ্বাস, সুখবাসা আনোতার ডাকে
দু'একবার আমন্ত্রণ জানায়: প্রত্যাখানে ক্ষুব্ধ
ঘরে ফেরে। তোমাকে পেয়েও আমার বেদনা
সেই হৃতযৌবন, প্রাচীন কুকুরের।
তাই গোপন আবাস খুঁজি, প্রাচীরের ব্যবধান
টানি মৃত্যুর চারদিকে। সংগোপন আশ্রয় তাতা
শান্তি কোথাও জোটে না তো। গর্ভের আশ্রয় চাই।
গর্ভের আশ্রয় চাই, অথবা, কবরের।

ঘর আমার
শেষ হ'লে তুমি এলে। কুৎসিত চিন্তার মতো রাত্রিও
মনের অন্ধ মহলে প্রবেশেচ্ছু; সে চৌকা দিক যত খুশি,
তোমার আমার মধ্যে সে স্থান পাবে না কখনো।
বাইরে কুয়াশার চাদরে ঢাকা মুক্তো মুক্তো ঘট

চৈত্র ১৩৬১

ব'সে থাকে। দূরে দিগন্তে উষার অনিল রোমাঞ্চ।
আরো দূরে আকাশের প্রতি ঝলাটে অনেক নক্ষত্র
নৈঃশব্দ্যের কম্পিত বুকে আলোকের শিহরণ জাগায়।
কে যেন কোথায় ডেকে ওঠে। সন্ধ্যের দুয়ারে তাকাই,
কে যেন ব'সে আছে, তোমার আসার জন্য, এ কী, কোথায়
ভুলেছো মন? আমার বুকের উপর তোমার মনের চিৎ।

কবিতা
বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৩

প্রবাস থেকে

অমিয় চক্রবর্তী

বে-গ্রেট রোডে

ঠিক তাই : নীচে আসা। একটি কথার প্রতি ধাপে
শব্দ যেটা স্তব্ধ হয়ে ভাবনা আবার নীচে টেকে
সেখানে সিঁড়িতে ঘাস, পাশে রেখা পশ্চিমী পাতার
লাল ছায়া আসন্নতা অবেধরে, তন্দ্রা অন্ধকার
অন্তরে প্রান্ত-নিশ্বসিত ; ট্রামিকের চিহ্ন থেকে
কেবিনের ভিতে শোনা সমস্ত নগর ঘুরে কাঁপে
একটি গুঞ্জন অনন্তরে ; যারে যারে নীচে থামা,
উর্ধ্বে জলে গৌড় তারা, বহুযামিনীর পূর্ণিমা।

ঘরে ফিরে শুরুদন্তী বেকর্ডের শুভ্রতা তখন
মুহূর্তেও কণ্ঠে আসে যাদব দেউল আগে তীর,
প্রবাস-সমুদ্রহীন, অন্তর চাঞ্চল্যে যুক্ত স্থির ;
কতদিন হয়ে গেল খুঁজেছি সে সখের সদন।
নীল আঁকা চীনে হাঁস ফুল-পাত্রে উঠেছে ঘিরে ঘুরে
ডেকে তারি কাছে আসা ; শূন্য সাত। বেঁচেছি দৈবাৎ
—ককটেল আতিথ্যে কারো ধূম্রতাবিলাসী বক্ষে ঝুঁকে—
কার্পেটে ঘুরানী নম্রা, বিয়ে তারি ঐন্দ্রিক বৃত্তান্ত।

চিত্র-আসি, জীর্ণ-আসি ; নিরাশার ঘনের দুঃখে যত্নে
জমা-মেঘ-অন্তর্দীপ্ত ব্যথাদান চূর্ণ-কণা দিনে
পত্রলিপি-সূত্রে পড়ি, কৌতুকে ভরে ভাবি, বই খোলা
প্রোজেক্ট আঘাতে কেন প্রত্যহ ধূলোর ধর্মে ভ'রে

অব্যবহিত-হারা অবিশ্বিত ইট গেঁথে তোলা।
আধরোটের কাঠে-খোদা কাশ্মীর কুঙ্কুম মন চিনে
চুমকি-বসানো ব্রত—মনে আছে ?—ধরি বুকে তাই।
স্বামীজি অধিলানন্দ তাঁর কাছে মন্ত্রে মন্ত্রে যাই।

এস্পাদোল

বন্দির ভঙ্গিতে কাঁপা বেহালার বেহালায়
দূর সমুদ্রের শব্দ চিনে
কেন এ টান্সানি গান গাও এই কঠিন মাটিনে ;
মধু তাল উত্তাল নৃত্যনীল সুরে মাতা
রোদ্দুরে বিদ্যুতে পাখা
মাতাও শঙ্কিত ধ্বনি ক্যাস্টানেটে।
হাতা খুলির গানে
অশ্রুতে করে আনচান
মেহিদেও অলিন্দের একাকী উৎসুক বুক ফেটে ;
কিন্তু ছুঁল সে নারকী অনির্দেশ মেয়ের তালায়।

এই গানে অলিন্দের ছায়া দোলে,
আঙুরের মিষ্টিতে সোনা মদরস ভ'রে তোলে,
আঙুলে মুহূর্ত জাগা পায়ের নাচের তাল খোলে।
এ-গানের যা-ই নাম দাও
এই গান
এই প্রেম, এই প্রাণ
কন্দু মাদ্র, ক্যাটালনিয়ান
সাহারের নীল-কাটা আভা দুটি ভাও
চেনা চেয়ে বেশি,
তবু নয় মন্ত্র অত বেশী—

এর টুংটাং ধ্বনি শাদা ধুলো রাস্তা বেয়ে
চকল চলন্ত কন্ত জীবনীর ছায়া ফেলে
দাঁড়ায় মিলায়-তলে, গাছগাছা ছড়িল বাজারে
প্রাচীন ইস্পানী খচা তারি ধরতা তারি ধারে।
আজ আনে দুর্দিনের রক্তে ফোন ফারাতানে ঝাঁকাঝাঁকা
ধূপাক্ত-পৌছন প্রাণ, বিস্তরণী ছাকনিতে ঢাকা।
হয়তো লেখিবে লিরেনিসে
বিদ্রোহীর ধ্যানে মিশে
ফাদানুস্ চেলোর তাঁর নির্বাসিত বেদনার স্পেন
অগণ্যের ঘরে জাগা
বহুল প্রাণনী লাগা
প্রাচ্যের প্রাণের বুকে এ গান নিদেন।

দিঘি

যেখানে সে ডুবে আছে
সেখানে জল নেই,
সোনালি ঘোলে ঝিলুক তল
ঝুকো কলস,
আরো গহন আলোর নীল।

সেখানে ঢেউ নেই,
অবগাহনের প্রতি পলক
ঢেউনা চালে অতলে,
নৈল পাখি আকাশে মিল,
তীরের আনন।

চৈত্র ১৩৬১

শীতান্ত এই ধরাঘাত,
হাতা শুধু হাওয়ার পাত।
কানে কানেই ঝরে বাঁশি
মধুকোষকে মুকুলরাশি
তরলক্ষণ
কমলদল নেই।

শীতের সন্ধ্যা

শাদা-কালো-ছাই। সিঁথের পটে
আঙুল-বোলানো সিঁদুর
সারি-সারি এই পাতাঝরা তাল গাঁয়ে
বয়স-নদীর ধারে—
কোন সবুজের মুছনি ওদের, তাবি,
বসন্ত চ'লে-যাওয়া
বসন্ত ফিরে-আসা,
ছন্দের শীষ কলিকা-জবানো
নুয়ে থেকার তটে
চাকা সে বল্লকাল ;
অঘ্রাণে পাখে, দোলে অঘুলি তাল।

বসন্তে বন যৌবনী বন
ডাকে সেও আসলতা,
ভিজে হাতের কথা।
যে-রেখা চিত্তির : ছুঁয়ের অতীত,
নয় যৌবন, জরা,
তার একতা যেখানে প্রথিত

সে-রূপ ধরে কি
পাড়ের প্রতীকে ছিটের শিহর বেলা।
সারি-সারি ভাঙে শিল্প পটের রেখা
—ওদের আঙুল নির্দেশ ছেড়ে দেখি।

পদাবলী

পায়ের ছাপ কি দেখেছ ধুলোতে
ঠাকুর ঘরের পথে যেতে, যাপ
কখনো মেয়ের, কখনো সে বাঁকা।
শিশুর চরণ গেছে আঁকাবাঁকা।
কত অসংখ্য তারি আনাগোনা,
সাক্ষাৎ ভগবান।
প্রাচীন দ্রাবিড়, অরণ্য-ছোঁয়া
ঘুঙে ঘুনো ধান বুনেছে নিবিড়
গেয়েছে কী গান, প্রাণমন্থিরে
ভারতী মাটিতে পদপাত রেখে গেছে।
ঠাকুর ঘরের পথে, প্রতি যাপ,
বর্ষের আগে আরো সে-বর্ষে
গোপন মর্মে নিয়ো পদ-ছাপ ;
যিনি এসেছেন যুগে যুগে আসা
শুনে সেই ভাষা, ঘুরে যার থেকে
এসো ফেলে-রেখে ঠাকুর ঘরের ভাত,
পথের ধুলোতে কোরো সন্ধান।

কবিতা
চৈত্র ১৩৬১

দুটি কবিতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কবিতা

আমি জানি শেষ নেই : যতক্ষণ আছে দেহে প্রাণ
তোমাকেই খুঁজে-খুঁজে পথে ঘাটে মাঠে পর্যটন
অব্যাহত, অনিমীত, বধির পাখির মতো মন
রৌদ্রতাপে নিশেহারা, ধূর্ণিঝড় অতীতের ঘ্রাণ
আড়ালে পশ্চাতে টানে, বর্তমান বিপন্ন যাযাবর
কণ্টকিত প্রস্তরাঘাতে, কাটে দিন বিবর্ণ নগরে
নিত্য নব পরিহাসে, ছলনার গোলকধাঁধায়
বিষাক্ত রক্তের লাল আর্তনাদে আনে ছন্দ ঘরে—

তবু অব্যাহত গতি ; শ্রান্ত দেহে যেখানেই থামি
কেবলি তোমাকে খুঁজি ; শতাব্দীর গভীরঘুমায়
ধূসর উত্তাল ঢেউ, বিক্ষিপ্ত, তবু ধীরি থামি
অগণন দিনের হাতে, শেষ লগ্নে মুক্ত মোহানায়
ক্ষিপ্ত যুগের প্রান্তে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জাগে,
বিস্তীর্ণ জীবন জুড়ে তোমাকেই খুঁজি পূর্বরাগে ॥

অনুরক্ত

আমার শ্রান্তির ভার তুমিই নিয়েছো আমি জানি,
তোমার শরীরময় ছড়ানো আমার শুষ্কতার ;
প্রস্ফুটিত তুমি ফুল, মেঘান্তিত আমি ফুলদানি,
আরো তুমি তপ্ত মেঘ, নিচে আমি বিহ্বল পাহাড়।

কখনো একাকী কাছে দুইজন পাশাপাশি চলি,
রৌদ্রে যাত্রা অব্যাহত, বক্ষেও উত্তীর্ণ দীর্ঘপথ,
তোমাকেই মনে রেখে উচ্চারিত পথের শপথ,
তোমার নিঃশ্বাসে আজো খুঁজে পাই নিজেকে কেবলি।

বাহিরে কঠোর ছায়া, বনস্পতি স্তব্ধ রক্তাহত,
সর্বত্রই কালো হাওয়া রাত্রিদিন পশ্চিমে ও পূবে;
প্রান্তর ফলনহীন, কৃষ্ণচূড়া আগুনে আনত,
বলিদান অব্যাহত দুর্বলের আকাঙ্ক্ষার যূপে।
ধূলোর ভয়ন্ত ভুলে কী আশ্চর্য তবু ফুলদানি
ধরে যে বিচিত্র ফুল, তোমাকেই নিতে হবে জানি।

শেষ দৃশ্য

সুশীল সরকার

শেষ মুহূর্তে তৈরি হয়েছি, তবু
ঝাড়াতে ইতর ঘটনার হাত-ঘেরি
এখানও হল যে দেরি!
ব্যাপৃত দিনের কামনাকলাপ গুটিয়ে
মূঢ় মননের শেষগ্রাসে মন তুষ্টিয়ে
ঘাটে পা দিতেই দেখেছি ছেড়েছে ফেরি!

আগে কতবার অন্য জীবনে
হয়তো হয়েছে এমনি,
মুগছন্দের চেয়ে বিলম্বে
বেজেছে আমার ধমনী।
পুতুল-নাচের পাট তুলে দিয়ে পালাতে
আটক থেকেছি প্রস্তুতি-যজ্ঞশালাতে,
কীর্তনদল গেছে নীলাচল
পাড়া দিয়ে আমাদেরি।

এতদিনকার অক্ষমতার
ভাঙা কুলুপ নেরিয়ে
আজো যদি শীষ বাজে সৈকতে
যাবো সে মতে বেরিয়ে…
অসংখ্য দিন ফিরিয়ে আঁধার কারাতে
নীহারও তো শেষে তাকায় তারাতে-তারাতে:
চরম দৃশ্যে কিছু বিস্ময়
থাকে প্রতি নাটকেরি।

দুটি কবিতা

সুরেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

ছায়া

ওই ঘুরে ঘুরে
দুপায়ির ছাহাকার যায় কেঁপে-কেঁপে,
অন্তহীন এ-বিশ্বের আলো-ছায়া-তাতে
অদ্বিত্ব দুলিল কোনো নত্তা বুনে-বুনে,
ছোড়ো-হাওয়া-উদ্দীপিত এশাত জ্যোৎস্নাতে।
বহুদূর ধনুক একদিন তীব্র টান
মর্মন্তুদ মেঘের কাঁচুলি ছিঁড়ে আনে
স্রু-উদ্ভত, যৌবন-গর্বিতা,
অপ্রাপনীয়ার
সোনালি স্তনের মতো।

ঘড়েও আবেগ রিক্ত।
ছোট্ট পুকুর,
দীর্ঘ কালো দুপায়ির ছায়া
শান্ত, চুপ।
পায় নাই বহু সাধনাতে,
খরোখরো পাতার প্রার্থনা ভাসিয়ে দিয়েও
উদাস হাওয়াতে,
স্রু-উদ্ভত, যৌবন-গর্বিতা,
অপ্রাপনীয়ার
সোনালি স্তনের মতো—

শুধু
মাত্র দুই হাতের মুঠিতে
জলের আয়নাতে—স্থির ছায়ার জগতে।

গাঁয়ের হাটটি

গাঁয়ের হাটটি কত ছুঁয়ে দিই রোজ
নীল কাশফুলের দিকে,
মাঠ আর পৃথিবীর স্পর্শ দিয়ে ঢ'লে
বাকের ঘুমন্ত অলিকে।

তারপর আলোকের দীর্ঘ শাখা হ'তে
ঝরিয়ে সৌরভ স্বপ্নের,
ফিরে আসে রক্ত সব পতঙ্গের মতো
তন্দ্রার অঞ্জলি হ'য়ে ফের।

ফিরে আসে ; শুধু আশা একটিও ফুল
আকাশকন্যার চুলে যদি
শাশ্বতীর ধ্রুব গায় তারাদের মতো
আলো হ'য়ে অন্তহীন নদী।

বাসন্তিক

শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্য

সব করুণ আঙুলে যেনো পরশ তুলে রাখো !
যদি আমার যাইছে আজ
হয়ত, মরা দিনের লাগ
ঘুম সেই বসন্তের বর্ণ দিয়ে ঢাকো
বর্ণমালা বাসন্তিক, কন্যা কলতান।

আজকে যদি সাদা দুপুর
সূর্য-ছেঁড়া রূপোর সুর
তরল নীল
অপরিসীম ;—
এ-কাজল চোখে।
স্পর্শ-বাঁচা অন্ধকারে কৃষ্ণচূড়া মন।

একটি মুখ

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কার মুখ মনে পড়ে, কে আমার যন্ত্রণার রানী,
কাছে সে ডাকে না, তবু দেবে না যে দূরের পাখানী !
আদ্রতাসভারে তবু থরোথরো স্বপ্নের ভাষা
পুরোনো পটের মতো অবিরোধী মন ভালোবাসা।

রাতের দুঃখের মতো, প্রাণের গভীর খাঁজে জমে
একটি মুখের ব্যথা স্মৃতিলগ্ন নিস্তব্ধ নিয়মে।

নির্বাসিতের স্বপ্ন

গোপাল ভৌমিক

মাছরাঙা-নীল দিনের স্বপ্ন
আজও তো যায় নি মুছে
ইস্পাতে-মোড়া নাগরিক ঘর থেকে :
তাই এঁকে বেঁকে
চলতে চলতে
ফুটপাতে পাতে;
চোখ দুটি এসে বে-ই যাবা যায়
ঘর-খরচা মাথে।

বাধা-নিষেধের বেয়াদ মানে না,
গগনায় ফুল ফোটে :
মহাদিনের রাজপথে তার
অটল ভাবনা ছুটে
কোন মাহাবীর হাতের স্পর্শ লাগে।
সূর্যও যেন সুগভীর অনুরাগে
লুকোচুরি খেলে মেঘের আড়ালে গিয়ে—
ট্রাম চলে যায় অফিস যাত্রী-নিয়ে।

তবু বিস্ময় ঘটে :
আড়িয়ল বিল
মাছরাঙা-নীল
পতিয়াঘাটের মোড়ে
এসেছে দ্বিপ্রহরে।
ফুটফুটায় রাঙা ঘর নিয়ে
ক্লান্ত শ্রীচের যাত্রী
মরা খড়িকেই ভাবে বুঝি তীর-যাত্রী।

কবিতা
বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৩

একদিন সেই ঝড়

লোকনাথ ভট্টাচার্য

প'ড়ে আছে কোণে ধূলো-জমা আঁধারের তলায়, প'ড়ে আছে অন্ধকার ঘরে
হয়তো ঝড়,
হয়তো কোনো ছুটো—তাতাইনি তার দিকে অবহেলা ভরে।

জানিনা কার কাছে চেয়েছি নিয়তই ঘুম যাও, রাত যাও, নিশ্চিহ্ন বিস্মৃতি যাও
ময়লের মতো।
ঘুম নয়, নামে রাত তারা-ছাওয়া স্তিমিত আকাশে, যার কোনো ছাড়িতে আখর
হয় না

ঝড়, যার কোনো বার্তা আসে না আমার ঘরে।
শুধু প'ড়ে আছে কোণে হয়তো ঝড়, হয়তো কোনো ছুটো অবহেলা ভরে।

একদিন ব'সে-ব'সে কোহরে যাবা ধরে—চোখের বাইরে যে-অন্ধকার,
প্রাণহীন প্রেম,
তার শিরায় মজার ধমনীতে ঠিক করে। তাই উঠেছিলাম এবং তখন নিজেরি

অজান্তে···ছুঁয়েছি তাকে—ঐ ঝড়, কিম্বা ছুটো, প'ড়ে ছিল অন্ধকার ঘরে।
হঠাৎ জ্ব'লে উঠল আগুন, ভেঙে চুরমার হ'ল ঘর, সমস্ত আকাশ চৌচির
হ'য়ে ফেটে গেল বিদ্যুতে।

চেঁচিয়ে উঠলাম, যতটুকু শক্তি ছিল কণ্ঠে : কোথা থেকে এল এই আগুন,
কোথা থেকে এল ঝড়, কেন এই বিদ্যুৎ?
হেসে উঠল ঝড় : হা-হা, বিদ্যুৎ, আগুন! কেউ আসেনি কোথা থেকেও।

তুমি যে ছুঁয়েছ আমায়, সে-ছোঁয়ায় ছেউ আকাশে খেলা করে। দেখেও তাখোনি
যাকে, সে-ধূলোতেও লুকোনো আছে বিস্ফোরণের মায়া, তারি চুম্বনে জেগে
উঠেছে বিদ্যুৎ। ঘুম নয়, নয় বিস্মৃতিতে, আলোর খেয়ায় চিরসুখের দেশে
জাগছি আমরা সবলে—বান ডাকি দু-তীরে, সে-তীরে নিয়তই নৌকো চলে।

আটটি কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

বহুমুখী প্রতিভা

অনেকেরে ভালোবেসে অবশেষে সুন্দর বিকেলে
তাকে, যার সাবলীল প্রাণিনীর মতো হেসে-খেলে
মিনিটের কাঁটা থেকে বুক পেতে বাঁচিয়েছে তাকে,
সেই সব প্রেয়সীরা পরিচয়াপেক্ষ পাহাড়ে
একে-একে প'ড়ে যায়, বিধায় না-ব'লে, অকস্মাৎ।
উৎসুক দেয় না সাড়া, সুচতুরা উৎসুক নয় আর,
কোথাও মেলে না খোঁজ, এমনকি, চিত্রাঙ্গদার
লেলিহান যৌবনের। মাঝে-মাঝে, সময়ের দূর
প্রান্ত থেকে, কাপনা ঘুমে যেন, হাজার-পাপড়ি-জলা মণিপুর,
হারকার অন্বেষণ, সপ্রতিভ গতির প্রখর
চাওয়া, স্বতঃপ্রেত মাছের আগুনে মিষ্ট গভীর বাসর
ভেসে উঠে ডুবে যায়, কিছুই না-দিয়ে, অকস্মাৎ।
এর চেয়ে ভালো কি হ'তো না, যদি পাত্র অপ্রধানে—
যে তারে বকনা করে, অথচ গোপনে ভালোবাসে—
অসতী, অনিশ্চিত সেই পাকালীর অন্বেষণে
খুঁজে নিতো একান্তেই অবিকল বিচিত্রের মানে।
তাহ'লে অন্তত এই সুন্দর বিকেলে, ইতস্তত
ধাবমান, বাষ্পবিহ্বল, ত্রস্ত শলকের মতো
ছিন্নভিন্ন হ'তো না সে, আশ্রয় না-পেয়ে, অকস্মাৎ।

শিল্পীর উত্তর

আমি যে, তা মনে রেখো। সহজেই লক্ষ্যভেদ ক'রে,
না-বুঝে, প্রথম বার, তারপর থেকে সহজের

অসহ্য আত্মীয় জেনে কেবল খুঁজেছি ঘুরে-ফিরে
যাযাবরবিহারিণী নিখিলচেতন হরিণীরে।
মেয় না সে আত্মীয়, প্রবিত্তি, প্রজ্ঞা ; তাই তো আমার
পৌঢ়তার তৃপ্তি নেই, আছে নিত্য-আরব্ধ যাত্রার
আবর্তন ; তাই আমি বনবাসে, নির্বাসনে, ছদ্মবেশে
ঘুরেছি বাদশ বীপ ইন্দ্র, হর, যক্ষপের দেশে ;
করেছি অবগাহন সব তীর্থে ; কাহলার সাত্ত্ব আবেষ্টনে
জেগেছি দশস্ত ঘুণ ধ্বালার সন্ধ্যায়, মনে-মনে
দ্রৌপদীরে দুর্বল জেনেও। বুঝে হয়েছি অজেয়
নির্বিবেকে পক্ষপাত মেনে নিয়ে, যার যুগে প্রথম কৌন্তেয়
বধা হ'লো, একলব্য বিফলাঙ্গে ; আর, যদিও সভায়
ক্ষাত্রধর্ম বজায়ন, অস্ত্র ফেলে, অচল আঘাতে—
সমবক্ষকটে হবে অপ্রকৃতি উপচীয়মান—
শুনেছি অদ্ভুতকণ্ঠে প্রতিশব্দ নিয়মের গান।
সব সত্য।—কিন্তু সেই প্রত্যাহত, সমর্থ, সজ্ঞান,
সাক্ষাৎ ঈশ্বর যদি রেখে যেন উত্তরচরিতে
ক্ষুব্ধ ব্যাধের তীর, তবে আর কোন শুভ্র ক্ষণে
পাণ্ডবের অবিচ্ছেদ ব্যবসায়ে পূর্ণ থাকে ঘুণ ?
সারথি নিস্পৃহ হবে, সেইক্ষণে নিঃশেষ অর্জুন।

কবি : তরুণ ও প্রৌঢ়

তার পরে কী হ'লো তা বলেনবি হাস আণ্ডেরসেন।
এপ্রিলে, ধরক-গলা, আলো-জলা পুণ্য সরোবরে
জন্ম নিলো, নির্দোষ যোচন ক'রে যে-তরুণতম,
সে কি প্রীত চন্দনের প্রথম ফোঁটার পরে, হাইমন,
বেদব্যাস, আশুপ্রসাদের বশে পাবনা ঋষিরে,

কেন হ'লো আরো বেশি পুকুর-পাড়ের পাখিহাস?
না কি হ'লো আরো সে তৃষ্ণায়, যত মরণের বেলা
প'ড়ে এলো, আরো উর্ধ্বে, অন্তহীন নীলিমার
আলোয় সাঁতার কেটে, সূর্যাস্তের সোনার প্রাঙ্গণে
ডুবিয়ে অমর পাখা গেয়ে গেলো মরালে-সঙ্গীত?
…জানি না, জানে না কেউ। শুধু জানি, লাবণ্যের দুঃখ
যদিও থাকে না মূর্ত কোনো দীপ্তে, শুধু ছেলেমেয়েদের দল
কুড়িয়ে টুকরো হাতে নূতনতরের প্রত্যাশায়
প্রত্যহ দাঁড়িয়ে থাকে, মুখ তেতো, আধার এপ্রিলে।

কবি: লোকের চোখে, আর—হয়তো—তার নিজের

যেহেতু সে ভালোবেসে শুধু
বিনিময়ে পেলো অবিরল
বিদ্রূপের পারিশ্রমিক,
তাই অন্ত যে-কোনো প্রবল
ব্যবসায় অব্যবসায়ে
লিখে গেলো সহস্রাধিক
চন্দ্রু, গাথা, উদ্ভটকবিতা,
উপরন্তু বিদেশি নাটক—
তা'রে দিলো গোপন মূঢ়তা,
বিশ্রব্ধ, অপ্রাপঞ্চিক
জীবনের দিন, রাত, পল:
তারপর, দু-চারি শতক
গত হ'লে, যে-কালের তার
ছিলো তা'র ছুঁচে-কেলে-দেয়া
রসজ্ঞসাপেক্ষ পরিধান,

তারই কোনো কাজ ফুলে, ধীরে
দেখা দিলো, নক্ষত্রের মতো,
ইতিহাসবিচ্যুত অনলে
আপনাতে আপাতসার্থক—
মরণের শেষ পরিণাম—
তার নাম, শুধু তার নাম !

কবিতার জন্ম

...till all my priceless things
Are but a frost the passing dogs defile.

W. B. YEATS

'ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ বা ভ্রমণকাহিনী,
কিছুই না থাকে যদি এই খণে, তাহ'লে বিদেশ
একটি কবিতা দিস, তারও আছে পারিশ্রমিক—'
এই ব'লে নয় ছেলে সম্পাদক বিদায় নিলেন।
উত্তরে যে-কথা যোগ্য, উপস্থিত জানাতে পারিনি ;
লিখে রাখি এইখানে : আকাঙ্ক্ষায় উজ্জ্বল যদিও
কোনোখানে আছে, এই কল্পনার প্রগল্‌ভতায়
অনেক বন্ধুরে ঘুরে, অপরাহ্ণে অনুকূল ক্ষণে
বিবেকের পরামর্শে পেয়েছি সুন্দর সমাধান।
হৃদয়ের রত্নগুলি—সাধনীর সলজ্জতায়—
ফেলে যাবো রাজপথে মূল্যের ধূসর বিশ্বাস ;
পথে-চলা মুহূর্তের প্রভাবের সজাগ সন্তান
গায়ে মেখে, অবাধের রৌদ্রে, জলে, শৈবালে, কর্দমে
যায় ক'মে, ভেঙে-ভেঙে, ব্যবহার্য হবে ক্রমে-ক্রমে।

বাড়িওয়ার ভার

কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নয় আর।
লেখা, পড়া, ফের পড়া, চিঠি লেখা, কথোপকথন,
যা-কিছু খুলিয়ে রাখে, আপাতত, প্রত্যহের ভার—
সব যেন, দুরূহরহস্যের মতো অর্কপরাজয়
হ'য়ে আছে বিকল্পকুটিল এক চতুর পাহাড়।
সেই দুঃখে বার-বার ছেয়ে গিয়ে, ম'রে গিয়ে, হন
যখন বলেছে, তবু দেহ নিয়ে বেঁচে থাকা তার
সবচেয়ে নির্ধারিত, প্রার্থনীয়, কেননা তা ছাড়া আর
কিছু নেই শান্ত, স্নিগ্ধ, অবিচল প্রীতিপরায়ণ—
আমি তারে তখন বিষণ্ণ ভেবে কোনো-এক দীপ্ত প্রেমিকার
আলিঙ্গনে সন্তাপ সারাৎসার ক'রে সহর্ষণ—
দেখেছি শিহরিয়ে দূরে, যদিও সে উদার উত্তার
দূর ক'রে দিলো ভাবা, লেখা, পড়া, কথোপকথন,
তবু প্রেম, প্রেমিকেরে ঈর্ষা ক'রে, নিয়ে এলো ক্রূর ব্যবধান—
দুরূহ, নূতনতর, কথাহীন বাড়িওয়ার ভার।
কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর।

অনুজের প্রতি—কোনো আত্মহীনা

অন্বেষা, যেহেতু তুমি বীর পার্থ, তোমার কীর্তির
উপার্জনে ধন্য হ'য়ে সার্থক মেনেছে আপনারে।
সন্ধান চেয়েছে ওরা, বিভূতির মাত্রার সমান :
তার মুখে রেখা হ'লে প্রাকৃতিক সপ্রতিভতায়
মিশিয়ে মিলিয়ে গেছে আত্মহানের অন্তরালে।
মাঝে-মাঝে অপরূপ প্রণয়ের অবসরে তুমি
পক্ষপাতে সমাপন সামাজিক পতি হ'য়ে ছিলে,

আর ছিলে সেই যুট পুরুষের আশ্রয়ে অভয়
লোকেরা বিস্ময়ে থাকে দ্রৌপদীর সখা হ'লে যাকে।
এই ব্যর্থ, জ্যোতিষ্মান ইতিহাসে তবু একজন
স্নায়ু শোণিত দিয়ে জ্বা'লে গেছে তোমার ফুলার,
জেনেছে তোমারে তার অনলের পর্যাপ্ত পাওয়া—
অন্য কোনো পরিণামমূল্যে নয়, তুমি—তুমি—তাই, তবু তাই।
নামহীনা, পুত্রহীনা, চিহ্নহীন, প্রথাবিহীন
তার কথা বেদব্যাস যদিও হেলায় ভুলেছেন,
আমি জানি, প্রস্থানের অন্ধকারে প'ড়ে যেতে-যেতে
তুমি, বিস্মরণী বীর, মেরেছিলে আরো একবার
অনাবিল, অসমাপ্ত, ব্যক্তিগত সেই আলিঙ্গন।

কোনো দুর্ঘটনায় মৃত্যুর স্মরণে

তিলে-তিলে নির্বাপনের
হ'লো না সে নিস্তেজ আধার,
ঠাণ্ডা ভোরে পাণ্ডুর সেয়ানা।
বিনিময়ে, অনেক মূল্যের
উপহৃত আকর্ষ মেয়াদে
স্বেচ্ছাচারী সম্রাট যেমন
উদ্ধত, লক্ষদীপজ্বালা
উৎসবের অলক্ষ্য সংকেতে
হ'রে নেয় অন্ধ, অন্তকার—
ছিন্ন তার, বন্ধ সব গান—
সেই মতো, নিভীক, সক্ষম,
অনাক্রিত, দৃপ্ত, অবিকল,
অমর্ত্যের প্রেমের অতীত,
অকস্মাৎ তাঁর অন্তর্ধান।

এজরা পাউণ্ড-এর কবিতা

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

ক্যান্তেসুকা

তুমি এলে রাত্রি থেকে বেরিয়ে
আর তোমার দুহাতে ছিল ফুল
এখন তুমি বেরিয়ে আসবে লোকের ঠেলাঠেলি থেকে
তোমাকে ঘিরে কোলাহলের মধ্যে দিয়ে।

আমি তো তোমাকে দেখেছি সব প্রাথমিক বস্তুর ভিতর
আমার রাগ হয় যখন ওরা তোমার নাম বলে
যতো মামুলি জায়গায়
আমি চাই যে শীতল ঢেউ বয়ে যাক্ আমার মনের উপর দিয়ে
আর পৃথিবী শুকিয়ে যাক্ ঝরা পাতার মতো।
বা কোপাটির বীজকোষের মতো আর উড়ে চলে যাক্
যাতে আমি আবার পাই তোমাকে
একা।

দুখ-প্রহরের লেখ কলকে

কী করে বা আমি এই সৌন্দর্য, যখন আমি বহুদূরে থাকব
আমার উপরে যার মায়াবে, ছেয়ে যেবে আমার মন।

কী করে বা আমি এই প্রহর, যখন আমরা দুজনে হবো সঙ্গহীন,
তার শ্রীনীল তোমাকে দিয়ে আমাদের উপরে আসবে
উজান ভুলে।

বেদী

এখানে আমরা পড়ি এসো অন্তরঙ্গ এক মানুষ
এই শিখা, এই নগর এবং প্রেমের এই সমূহ সোপান
এইখানেই তাদের সংবাদ শেষ হয়েছে, এ আশ্চর্যের খাদ,
যেখানে এরা ছিল, এ তো যুক্তিযুক্ত, সেখানের মাটি পুণ্য।

মেট্রোর এক ষ্টেশনে

ভিড়ের মধ্যে মুখগুলির প্রতিভাস।
ভিজে কালো ডালের উপরে কটি পাপড়ি।

কর্দা ও পাথর

পাপড়িগুলি কবীবাবার পক্ষের
কমলারঙের গোলাপপাতা,
তাদের হলদি লেগে থাকছে পাথরে।

প্রার্থনা

থাকো আমার মধ্যে যেন হিমের হাওয়ায়
চিরন্তনভাবে এবং যেতো না
যেমন দূর নগর বন্ধু থাকে—
মুখের হাসিমুখি।
আমাকে দাও বৃত্ত নিশ্চেতনায়
সূর্যহীন শিখরের
আর ধূসর অলয়ানির
দেবতারা আমাদের কথা যেন বলেন নয়ন ভাষায়

চৈত্র ১৩৬১

আগামী কালের দিনে,
বৈতরণীর ছায়াচ্ছন্ন কূলগুলি
তোরে রাখুক মনে।

ছবি

এই মৃত সুন্দরীর চোখ দুটি আমায় কথা বলে,
কারণ এখানে ছিল প্রেম, যা যায় ভেসে যায় না,
এবং এখানে ছিল কামনা, চুমায় যা নয় নিঃশেষ।
এই সুন্দরীর চোখ দুটি আমায় কথা বলে।

ভোরবেলায়

লোকেরা কি এদের নেবে
(অর্থাৎ এই গানগুলিকে)।
মৃত স্বপ্নীর মতো যেন কোনো কিন্নরের
(বা কোনো মনসবদারের) কাছ থেকে
এরা তো এখনই পালায়, ওরাও চিৎকারে।

এরা কি কিছু বুঝবে যাথার্থ্যের সত্যাসত্য ?
এদের দুরাশী নির্বুদ্ধিতা যে অপ্রলোভ্য।
আমার বোঝাই শোনো, হে অনুকূল সমালোচকেরা,
আমার জন্যে আসর জমাবার প্রয়াস তোমরা কোরো না,
আমার খেলাধেলা আমার স্বাধীন অগোছে চুকায় চুকায়
গোপন গুহার কন্দরে
আমার গানের প্রতিধ্বনি পৌঁছয়
শীতল আলোকে,
অন্ধকারে।

চিলেকুঠুরি

এসো আমরা কল্পনা করি যাদের অবস্থা আমাদের চেয়ে সচ্ছল
এসো হে বন্ধু আমরা করি বিত্তবানদের, যাদের থাকবার আছে, বন্ধু নেই,
আর আমাদের বন্ধু আছে, নেই থাকবার।
এসো কল্পনা করি বিবাহিতদের আর অবিবাহিতদের।

উষা আসে ছোটো ছোটো পদক্ষেপে
সোনালি এক পাতলোভার মতো,
আর আমি রয়েছি আমার আকাঙ্ক্ষার কাছে।
জীবনে আর কিছুই নেই
এই স্বল্প বিকলতার প্রহরের চেয়ে ভালো
এই একসঙ্গে আমার প্রহর।

গান

যাও, হে আমার গান, প্রশংসা খুঁজো তরুণদের আর
অসহিষ্ণুদের কাছে,
খুঁজো শুধু উৎকর্ষের প্রেমিকদের মধ্যে।
সর্বদা দাঁড়াতে চেয়ো কঠিন সোক্রেতীয় আলোয়
আর তার হাতে আঘাত নিও সহর্ষে।

স্তোকাদল বা সুন্দর

আমার মধ্যেও তুমি আমাকে বঞ্চিত করেছ,
পাঠিয়েছ শুধু তোমার করতবাদিনীদের।

ভোরাই

শীতল বেলা ঘুঁইটাপায় পাতু ভিজে পাতা
আমার পানে সে চাহে ভোরবেলায়।

লিখে চে

রেশমের খসখসানি থেমে গেছে,
ধুলো উড়ছে উঠোনে
পায়ের শব্দ নেই, পাতাগুলি উড়ে উড়ে
অন্ধো ঘর আর হিম হ'য়ে প'ড়ে থাকে,
আর সে, হৃদয়ের যে রমিণী, সে তারই স্বপনে :
ভিজে একটি পাতা চৌকাঠ আঁকড়ে।

এক অমরতা

আমরা গান করি প্রেম ও আনন্দের,
আর কিছুই চাওয়া পাওয়ার যোগ্য নয়।

যদিও ঘুরেছি আমি অনেক দেশ,
আর কিছুই জীবনের সত্য নয়।

বরং আমার মধুরাতেই চাই
যদিও গোলাপ হবে ম্লান।

কী হবে হাতেরিতে মহাকাব্য রচে,
যা লোকে ভাববে বোঝে সভ্যি নয়।

আলো অন্ধকারের গান

(শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র, বন্ধুবরেষু)

সুরেশ গুহ

বিগত দিন, আগামি জ্যোৎস্নায়।
মনে হয় যেন একদা-দাহ্য সেতু
যাত্রীরা ঢেউ ঘুরে নিয়ে চ'লে যায়,
একতারাকায় ঘর করে ঘুমকেতু।

গ্রীষ্মের শেষে পরতর গ্রীষ্মের
লাটা নেমে আসে উপত্যকার ঘাসে
উড়ে যেতে-যেতে পথিক পাখির ঝাঁক
অসহায় ডানা ছাপটিয়ে নেমে আসে :

ঘর ঘুরে পত্নী, স্বামীর সহ.
ছুঁয়ে ব'সে থাকে কাল যামিনী হবে,
নগরে মাতাল মুখিকের উৎসব
যেন অসময়ে তাদের ডেকে কী যা হবে।

এ-যন্ত্রণার অবসান হয় যেন।
আমুদের যাত্র ভেবে-ভেবে মেটে যাক :
সেই আলোটির ফুক জোড়া ধাঁকা যেন।
(শেষ তারাটি কি ডুবেছে তোমের তাক ?)

চৈত্র ১৩৬১

আলো চোখে নিয়ে স্নান এশিয়ার কোণে
অন্ধকারে সে যে শিশুর বার্তা শোনে।
শিশুকে কোথায় কে শোয়াবে, বলো, কার
অক্ষত হাত পাবে সোনার হার?
বুকে নিয়ে তারে কে আজকে দোলা দেবে।

আকাশে বিশাল বিদ্যুৎ চমকায়।
বৃষ্টি এখনো নামেনি মুষলধারে:
ধুলো কালি কাদা দিল্লি কলকাতায়,
আমরা আহত বাহুতে অন্ধকারে।

আয় সে-রে আলো, অন্ধ জীবনে আয়।
তার বাঁকা ভুরু, তার কালো চোখ, তার
চিকন গলায় অমল সোনার হার,
অন্ধোষ ঘটে প্রকাশের নির্ভয়।

হোল্ডারলিন-এর কবিতা

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

যৌবন

কোনো-এক দেবতা আমাকে
প্রথম যৌবনদিনে, মানুষের
ব্যাকুল, সংসারের উন্মাদ চীৎকার থেকে
অনুক্ষণ রক্ষা করেছেন।
তখন অপাপবিদ্ধ, চিন্তাহীন,
অরণ্যে ফুলের সঙ্গে খেলা ক'রে,
ঈশ্বরের বাগানের বন্ধু হ'য়ে আমি
কাটিয়েছি দিন।

স্নেহে মণ্ডিত করো
উন্মীলিত ফুলেদের হৃদয়েরে
যখন তোমার দিকে
উৎসুক, বাড়িয়ে দেয় কাঁপ যার ডানা,
সেইমতো, হে পিতা পুষণ্, তুমি আমারও হৃদয়ে
এনেছো অনিবার্যস্রোত : আর এতিমিরদের মতো
আমিও পেয়েছিলাম তোমাকে প্রেয়সী,
হে পুত চন্দ্রমা!

দেবগণ, দয়াবান,
একনিষ্ঠ আত্মীয় তোমরা—
জানো না তো, তখন আমার প্রেম
কী ব্যগ্র ব্যাকুলতায় ছুটেছিলো তোমাদের দিকে।

যদিও তখনো তোমাদেরে
আমি চিনে তাকিনি কখনো আমি,

তোমরাও, পরস্পর-পরিচিত মানুষের মতো,
আমারে করোনি সম্ভাষণ,

তবু, মানুষের চেয়ে
অনেক গভীরতর সত্য হ'য়ে, তোমরাই
ব্যাপ্ত হ'য়ে আমার হৃদয়ে ছিলে
নীলিমার মৌন বীণা শুনেছি অনলস, কিন্তু মানুষের
ভাষা আমি বুঝিনি কখনো।

মর্মরিত পল্লবের সুর
লালন করেছে মোরে, অরণ্যকুসুম
শিখিয়েছে ভালোবাসা ; যেসকল ছিলেন আমার
ধাত্রী, পিতা, মাতৃস্থানীয়।

মধ্যজীবন

যত দোষগুণে পূর্ণ, বাসনাক্লিষ্ট
চলমান আক্রান্ত এই দেশ, যারে
ঘুরে পড়ে অন্ধোদ্যত হৃদয়ের ক্রোড়ে ;
সেখানে, সাধ্যপূর্ণ
মরালেরা, ডুবনে মাতাল হ'য়ে, বার-বার
আমার ডুবায়ে দেয়
পুণ্যময় প্রশান্ত সলিলে।

অবশেষে যখন কঠিন ক্ষিতি
দেখা দেবে, আমি তখন কোথায়
খুঁজে পাবো ফুলফল, আর কোন্‌খানে
রৌদ্রের উল্লাস, আর
পৃথিবীর ছায়ার সম্পাত ?

চাতা মেঘাল শুধু
নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে, ঘনিত হাওয়ায়
আবহমুহূর্ত মূর্ছাযান।

হাইপেরিয়নের অদৃষ্টের গান

তোমাদের বিচরণ ঐ ঊর্ধ্বে, হে পুণ্য কিরণ,
আলোর প্লাবনময় কোমল মুহূর্তে,
দেবতার তাদের বাতাস
ধীরে স্পর্শ ক'রে যায় তোমাদের,
যেমন বীণার
মন্ত্রপূত মূর্ছনায় ঈশ্বর অঙ্গুলি।

দেবযোনি, স্বর্গের সন্তান,
ঘুমন্ত শিশুর মতো অদৃষ্টরহিত
তোমরা নিশ্বাস নাও, শুদ্ধচারিতায়
সুরক্ষিত, বিনম্র কোরকে
চিরকাল-বিকশিত আত্মা নিয়ে
মেলে রাখো অম্লিত নয়ন
চিরন্তন, স্থির, অক্ষতায়।

কিন্তু আমাদের
নিষ্কৃতি দেয় না শান্তি; তাপিত মানুষ,
ক্ষীয়মাণ, অন্ধ বেগে
প্রহরে-প্রহরে ক্ষ'য়ে যায়;
যেমন ঝর্নার জল
পাথরে-পাথরে প্রতিহত,
অবিরল অধঃপাতিত, বৎসরের অনিশ্চয়তায়।

দিওতিমা

তোমারে চেনে না এরা ; নিঃসঙ্গ দুঃখের কারে নত,
অন্তরঙ্গিণী, তুমি মিলমাঝ বিনা প্রতিবাদে ;
তবু আলো সূর্যের আলোয়
ধরিত্রীর চক্রব্যূহে বৃথা খোঁজো আপন দোসর।

কোনোখানে নেই আর মহাপ্রাণ প্রেমিক পুরুষ।
কিছু কাল নিরবধি। এ-ময় দংশীত মোর তবু দেখে যাবে
সেই দিন, যে-দিন তোমার নাম, দিওতিমা, দেবতার পদে
বীরের সমান পাবে, যোগ্য হবে তব।

দিওতিমার প্রতি

সরস্বতী, স্বর্গের কন্যা, তুমি একদিন উতরোল পক্ষদুঃখে
যৌবনে দিগন্তেছিলে, এসো আজ শান্ত করো উল্কাক্ষণ কালের প্রলয়!
মুক্ত করো উত্তাল বুকের তব মন্ত্রপূত বীণার ঝংকারে
যতক্ষণ মর্ত্যের হৃদয়ে পুন বিজ্ঞির ভক্তির
না ঘটে মিলন, জাগে সময়ের কেনিল আবর্ত থেকে, সৌম্য, বলীয়ানে,
অবিচল, উপঃকূপ, মানুষের প্রতন প্রকৃতি!
পা ছাখো মন্দিরে পুন, ফিরে এসো শ্রীতিময় নবারপ্রাণনে
এসো জনতার দীর্ঘ-কুণ্ঠিত আত্মার, সৌন্দর্যের প্রাণলক্ষ্মী তুমি!
কেননা,প্রিয়নো আছে দিওতিমা, বেঁচে আছে ক্ষিতে ধান মঞ্জরীর মতো,
সহজ ঐশ্বর্য নিয়ে, অথচ সূর্যের অপেক্ষায়।
কিন্তু সে-উজ্জলতর মহুয়রা নেই আর, অন্ত গেছে আত্মার পরম সূর্য ;
আজ শুধু কলঙ্কক্ষণ বাত্যা হিমোক্ত নিশীথে বামমান।

ভ্রম-সংশোধন

১৮৩ পৃষ্ঠার 'দাহিনের তার' কবিতার অষ্টম পংক্তিতে 'আর্দ্রীর' শব্দটি অক্ষরমে 'আর্দ্রীর' ছাপা হয়েছে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

সমালোচনা

নাম রেখেছি কোমল গান্ধার : বিষ্ণু দে। নিউনেট প্রেস : আড়াই টাকা

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা '২রা মে জাবণ', শেষ কবিতা '২৫শে বৈশাখ'। এই নামনির্দেশ তাৎপর্যসূচক। কবিতাগুলি মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে, অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে, নিরাশা থেকে উদ্দীপনায়, অসুস্থ থেকে সুস্থতার জ্যোতির্লোকে, বিশ্বাসে শান্তিতে ধাবমান হবার আহ্বান। বিষ্ণু দে বরাবরই দেশকাল সম্বন্ধে সামাজিক অর্থে চিন্তিত। গত দশ বছরের বাংলা-দেশ—ক্ষুধা, দুঃস্থের মিছিল, অনাচার, নীতিচ্যুতি, 'মৃত্যু আর মৃত্যুর প্রলাপ'—এই বইয়ের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার বেদনাভূমি। কিন্তু অন্যান্য বামপন্থী লেখকদের মতো শুধুমাত্র রাজনৈতিক আবহাওয়ার রোজনামচা লিপিবদ্ধ ক'রে এবং প্রতিক্রিয়ার চাই আওয়াজে বিষ্ণু দে নিরস্ত হননি। ফলত, তাঁর রচনায় কৌতী মনোভাব কম : লেনিন স্টালিনের জন্য উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও, মেষানোপমা অল্প : তাঁর রচনা সাম্যবাদের জাবান্তরিত কস্তোমাত্র নয়। ঘৃণা আর হিংসা, হতাশা আর ক্লেদ, যখন অপরাপর বামপন্থী লেখকদের মূলধন, বিষ্ণু দে-র অবলম্বন তখন প্রীতি আর প্রেম। প্রেম, এবং তা থেকে উদ্ভিত আনন্দ, এই দুটি একান্ত অনুভূতিকে, পরিপার্শ্বের ছায়ার বিকৃতি সত্ত্বেও সচেতন থেকেও, তিনি নিজের মধ্যে অবিকৃত রেখে তার চিত্তেই সাধনা এবং সাহস খুঁজে পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, স্বকীয় অনুভূতিকে সার্থকতায় সম্পূর্ণ সঞ্চারিত করতে পেরেছেন আমাদের চিন্তায়, চেতনায়। বক্তব্যের সপক্ষে দুটি আবেগঘন ছোটো কবিতা উদ্ধৃত করছি।

অন্ধকারে আর রেখো না তুমি,
আমার হাতে রেখো তোমার মুখ,
দুঃখেরে দিয়ে যাও দুঃখ ঘুম
চোখে দিয়ে গড়ো তোমার জগৎ,
আমার ভালে আঁকো তোমার জয়।

অনেক আলো আজ ফুরায় যদি,
ঘুচিয়ে দিয়ে আয় রেইকো তবি,
অন্ধকারই একমাত্র ওষুধি,
খেয়ো সবটুকু ফুরায় তবু।
আবার হাতে লেখো তোমার ঘুম।

(অন্ধকারের আয়) —

আমার দিন শুরু সূর্যোদয়ে, আমি তোমাদের বিশ্বাসের,
প্রাচুর্যে মানবের আনন্দের অসীম ঢেউ যাকে ছড়ায় দিন,
তোমাদেরই যেন তোর অন্তরিক্ষ অন্ধকারের রোদ্দুর ফুরোয় যার।
রৌদ্রে এই হয় বিলিয়ে যাক, যদ্যপিও হোক শ্রান্তিক।
আমার দিন শুরু সাতটি রঙে, আমি আদি নীল মহাসত্যের,
প্রাচুর্যে পথের আনন্দের অসীম ঢেউ যাকে রঙ হীন,
রঙের বন্যাটা অন্তরিক্ষ
আনন্দ শিল্পীর ফুলির চাঁদ—
তারাদের পাহাড়ে এ মিলিয়ে দিই এবার ফুরিয়ে এদিক।

(পাঁচ প্রহর)

তিন-চার-তিন-দুই মাত্রার লেখা এই দুটি কবিতার প্রথমটি কার না চিত্তচুরি ঘটাবে? আর দ্বিতীয়টির মধ্যে যে প্রাণবন্তের বৈচিত্র্য আনন্দ উদ্ভাস হ'য়ে উঠেছে তা নিঃসন্দেহেই সংক্রামক। এই আলো উজ্জ্বলতার অনেক 'আমি রেখেছি কোমল গান্ধারে'র আরো অনেক কবিতায় মূর্ত হয়েছে, যেমন, 'আশ্বিন বুঝি? আশ্বিনে কাশে ঘর', 'উপোসী পাহাড়ের চড়াইপায়' ইত্যাদিতে।

বামপন্থী কবিদের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণু দে-র কবিতাই যে আমার কাছে পাঠ্য মনে হয় তার কারণ তিনি নিজেকে মজুর নয়, মজুরপ্রেমিক মধ্যবিত্ত ব'লেই স্বীকার করেন, অন্তত তাঁর রচনা এই ধারণাকে প্রশ্রয় দেয়; এবং ব্যক্তিক আবেগ-অনুভূতি তথা মানুষের নিত্যকালের হৃদয়বৃত্তিগুলিকেও তিনি কবিজনোচিত সম্মান দিতে কোনোদিন ভোলেন না। অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক তাঁকে প্রেম এবং প্রকৃতি বিষয়ে মুখচোরা ক'রে তোলেনি, যেমন করেছে

সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেককে। বস্তুত, 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এ অনেক উপমাই নৈসর্গিক, বাহ্যবাহিত উৎস কোনো-না-কোনো প্রেমোপাখ্যান। ব্যক্তি এবং সমষ্টির সম্বন্ধনির্ণয়ের সময় ব্যক্তিকে যেউ আর সমাজকে সমূত্রূপে কল্পনা ক'রে উভয়কে কবি চিরবাহ্যবদ্ধ বাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তিতে অথবা পার্বতীপরমেশ্বরেই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাছাড়া, 'চিলানেলে'র মতো বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা লিখতেও তাঁর 'সমাজচেতনা'র বাধেনি।

বিষ্ণু দে-র কবিতা আমার ভালো লাগে তাঁর মনের এই সজীব স্বাভাবিকতার জন্যই। যুক্ত দৃষ্টির স্বচ্ছতায় ঐতিহ্যকে তিনি সত্য-সত্যই আত্মসাৎ করতে পেরেছেন। শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্য নয়, পুরাণ এবং মঙ্গলকাব্য থেকেও, কমলে কামিনী, কালীয় দমন ইত্যাদি, এই বইয়ের উপমার উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে; তদুপরি বিশ্বসাহিত্য তো আছেই। সাহিত্য প্রধানত সাহিত্যের দ্বারাই পুষ্ট এবং প্রভাবিত হ'য়ে থাকে, সাহিত্য কেবলমাত্র বহির্জাগতিক ঘটনাপুঞ্জের প্রতিচ্ছবি নয়। এই সত্যে, তথা মানুষের চারধারের সজীবতার অস্তিত্বে, সন্দিহান হ'য়ে, এদেশের অধিকাংশ বামপন্থী স্লোগানকবিরা ব্যর্থ চিত্রকল্পে সাহিত্যের নামে অন্ত দেবতার পায়ে অঞ্জলি দিচ্ছেন। এ-কথা স্বীকার্য যে সাহিত্যের উপকরণ হ'তে পারে না এমন বস্তু পৃথিবীতে নেই, কিন্তু আবেগগ্রাহ্য না হলে কোনো কথাই তো কবিতা হ'য়ে ওঠে না। আধুনিক কবির প্রধান লক্ষ্য হল ভাবালু উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে সজীব চিত্রাবয়বকেই উপযুক্ত প্রতীক, রূপক, উপমার মধ্যবর্তিতায় আবেগরূপ দেওয়া। বলা বাহুল্য, অনাত্মীয় চিত্রকল্প চিন্তা এবং আবেগের এই স্বাভাবিক সমীকরণে বাধা দেয়। তাই কাব্যের অলিখিত নিয়মকানুনের অস্বীকারেই কবির মুক্তি। সম্প্রতিকালের বামপন্থী কবিরা দুরূহতর কাব্যবোধের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে কেন যে দুর্বোধ্যতার্থে আবদ্ধ হ'য়ে রয়েছেন তার কারণ এইখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে। বিষ্ণু দে-র কাছে তাঁদের শিক্ষালাভ করা উচিত।

চিত্রাবয়বের দিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থটি খুব এক বহুর অদ্বৈতসাধন। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার', এক কথায়, মীরুর-সাগর-সঙ্গমে কবির তীর্থযাত্রা। 'তোমারি লাগি' ও 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় আবেগ স্বাভাবিক পরিণতির দিকেই

চলেছে। যাত্রাপথের বন্ধুর চড়াই উৎরাই এই বইয়ের একাধিক বিশ্লেষণাত্মক রচনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কিন্তু পরিণামে বিষ্ণু দে-র কবিতায় মুখশ্রী বিকৃত হয়নি, বরং তাঁর চিন্তার সংশ্লেষী ক্ষমতা তাঁর আত্মাকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই পুস্তকের অন্তর্গত 'একজন দুঃস্বপ্ন' নামক কবিতাটি সমকাল-বিমানের অধিবাসী একটি বিশিষ্ট মানুষের আলেখ্য হিসেবেই উল্লেখযোগ্য নয়, সম্প্রতিকালের বাংলা কবিতায় একটি স্মরণীয় সংযোজনা। 'টাইরেসিয়স' কবিতায় 'পরিমিত সংস্কৃতিসম্ভোগে' বিশ্বাসপরায়ণ এতদ্দেশীয় সচ্ছরিত্র ভদ্রলোকদের ছবি থেকেও মজা পাওয়া যায়।

বিষ্ণু দে অসামান্য ছন্দকুশলী। তাই যথাবিহিত দ্বিধা নিয়েই বলছি ইদানীং তাঁর অনেক কবিতা নিখিল হ'য়ে পড়ছে, যেমন যেন এলোমেলো, অন্তর্বিন্যস্ত। এই অনুমানটাই হয়তো সত্য যে সম্প্রতি ছন্দ নিয়ে তিনি এমন সব পরীক্ষা করছেন যার সঙ্গে আমাদের কান ঠিক তাল রাখতে পারছে না। যা-ই হোক না কেন, দ্বিত্ব শব্দের বিচিত্রিকরণ বাহুল্য—ঘুরে ঘুরে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে, জলে জলে, পাকে পাকে, দিনে দিনে, ঘুরে ঘুরে, হাওয়ায় হাওয়ায় ইত্যাদি ছাড়াও, আলোচ্য প্রবন্ধটি পড়বার সময় অনেক জায়গাতেই আমাকে মুশকিলে পড়তে হল। ধরা যাক প্রথমেই যে দুটি কবিতা উদ্ধৃত করেছি তার দ্বিতীয়টির শেষ পঙক্তি, অর্থাৎ, 'পাহাড়ে পাহাড়ে এ মিলিয়ে দিই প্রবল মুক্তিতে নন্দিত' বাক্যটিকে। এখানে চার-চারটি 'এ'-কারান্ত শব্দ এবং তদুপরি 'এ' বর্ণটির বোঝা পাহাড়প্রমাণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। 'দিই' শব্দটিও স্বাভাবিক উচ্চারণে পুরো দুমাত্রার ওজন দাবি করতে পারে কি? শব্দের এধরনের অসতর্ক ব্যবহার এ-প্রবন্ধে অজস্র, যেমন, '২২শে শ্রাবণ' নামক কবিতার শেষ অনুচ্ছেদে 'হতেম'। এখানে 'ম'-বর্ণটি এলিয়ে পড়ে। প্রাকরণিক গোলযোগের আরো কতকগুলি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

আকাশ বাতাস ছন্দমুড়ায় ঘাস
পল্লিতে পল্লিতে আজকেও হাট
কোথাও অন্তত না আজ

তোমার দুচোখে তোমার আকাশে নাচে
আমার নীল পাহাড় ঘেরে ঘরে কাজল
জীবনেরই আহ্বানে

(মায়ামোক্ষ)

তোমার তোমার কুসুমুড়ায় শোক
ধূলির থেকেই ধরার উদ্ভব
প্রতিমা তোমার হোক প্রতীক আমার
আকাশ ঘেরে পাহাড় ঘেরে আমার সমাজে জীবন ঘেরে।

(ঐ)

মাঝের বাঁধা ছন্দের সঙ্গে 'আমার নীল পাহাড় ঘেরে ঘরে কাজল' আর 'প্রতিমা তোমার হোক প্রতীক আমার' অসঙ্গতাধিত্বের বিস্ময় এনেছে কি? না কি অন্তরাধ এবং আকস্মিক আকর্ষণে পাঠকের কানকে বিমর্ষ করেছে? ভয় হয়, এই ধরনের পরীক্ষাগারের মোড়াতেই সমাধ করে গেছে, কেন না, স্পষ্টতই নির্মলের স্বপ্নভঙ্গের যোগাযোগ এদের জন্ম হয়নি। আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

ঘুচি বা যে আমি তোর ভাষা
পথকে যে ডেকে আনা আঙিনার পরে
এ কি বা আকাঙ্ক্ষা কি আশা!
বাজারে বন্ধ কাঁদে ভয়ে।

তাকাস পাহাড়ের ছিদ্রে
তাকিস অরণ্যের ছায়ার নীড়ে.
ভয়ের যায় কি তার ঘরে?
বন্ধ কাঁদে তোর ভয়ে।

(পাঁচ এবার)

এখানে অক্ষর বা মাত্রা বা স্বর কোনো নিয়মেই আপত্তির গ্রাহ্য করা হয়েছে ব'লে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' থেকে কয়েকটি শব্দ এবং বাক্য গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া হয় সেই নৃত্যনাট্যের ছাঁচেই পঙ্‌ক্তিগুলি রচিত, তা হলেও যেন সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। নাচগানের সঙ্গে যা

উপযুক্ত তাকে কবিতা আখ্যা দেব কেন? পদ্যে হোক, গদ্যে হোক, কবিতাকে টেনে টেনে পড়া হবের উপর নির্ভর করলে চলবে না এবং তাকে আবৃত্তির যোগ্য হতেই হবে। আর এ-কথা যদি স্বীকার করি, তা হলে যেখানে সেখানে যতিপাত, যে কোনো কারণেই হোক, গ্রাম্য ব'লে বিবেচিত হবে না এবং নিচের পঙ্‌ক্তিগুলিকে দোষদুষ্ট না বলুন, অনেকেই বলবেন এড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

তোমার বাহুতে ঝরুক অমৃত-অশ্রু
তোমার বাহুতে ঝরেছি ইন্দ্রধনু

(বাহোবাহু)

যাদব ছুটেছে চারিদিক
ধনু যেন এত, বেগ তার
প্রাকৃতিক, ও অবাস্তবিক।

(বহুবচন)

মধ্যখণ্ডনের মজাটা যেন মাঠে মারা গেছে, ছন্দ বজায় রেখে পড়তে গেলে 'অশ্রু অ' এবং 'ও অ' উচ্চারণ করতে হবে। ছন্দ যদি আবেগের চলচ্ছক্তিকে উৎসাহিত না করে, তা হলে তার থাকিয়ে এই বিকৃতিকে মেনে নেব কেন? অবশ্য মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এই উচ্চারণ-বিকৃতিটা আজকাল এত বেশি চালু হয়েছে যে এটাকেই অনেকে রীতি ব'লে মনে করছেন। কিছু যে তাত্ত্বিকই করেন না, তবে আশঙ্কা হয় পরিশ্রমকে এড়িয়ে যাবার ইচ্ছা, তাৎক্ষণিক আবেগের প্রেরণায় পা তাস্তিয়ে দেবার নেশা, তাঁর ইমানীংকার কোনো কোনো লেখার প্রকট হ'য়ে উঠছে, এমন কি অক্ষরবৃত্তেও। একটা নমুনা দিচ্ছি।

কমলে কামিনী কিম্বা ঘটনায় যারে পারে বলে
সত্যবদ্ধ চিত্ত সত্য সবল হৃদয়ে যাহারা।
যেন না পারিজাতলোভে এ বেতাল পাদপে

(বাহোবাহু)

শেষ লাইনে 'যে' এবং 'এ', অর্থাৎ, দুটো পরনির্ভর 'এ', পাশাপাশি থাকায় শুধু যে উচ্চারণের বিকৃতি ঘটেছে তাই নয়, ছন্দেও বেতাল ভঙ্গ করেছে। পূর্বে

উদ্ধৃত 'পাহাড়ে পাহাড়ে এ' পঙ্‌ক্তির 'এ', যাত্রাধ্বনির লেখায় সকল ঘটিই তা ভায় সইতে পেরে থাকে, এখানে তা পারেনি। সামান্য পরিশ্রম করলে এই ত্রুটিকে বোধ হয় এড়ানো যেত। তবে এমনতর অসতর্কতার নিদর্শন এই গ্রন্থে এত বেশি আছে যে ঠিক যাচ্ছে পা উন্নাত হ'য়ে যাবার সম্ভাবনায় আমি আর দুটি মাত্র উদাহরণ উপস্থিত করছি।

তুমি তবো প্রৌঢ়ে দেবে পা হে খুব মনের মুকুর (চাইবেশিনে)
আমার স্বপ্ন অপরিশীল (ক্লান্তি নেই)

'পা হে' নিশ্চয়ই বাক্যটিকে খোঁড়া ক'রে দিয়েছে। আর 'স্বপ্ন' শব্দটির সঙ্গে 'ও' যোগ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয়েছে কি? অ-কারান্ত বা ও-কারান্ত পদের সঙ্গে 'ও' যোগ দিলে সন্ধি ক'রে পড়বারই ঝোঁক হয়, ফলে ধ্বনিই যোগফল থাকে। কিন্তু বিষ্ণু দে-র সাম্প্রতিক রচনায় 'ও' বর্ণটির এই উদ্দেশ্যহীন ব্যবহার প্রায় সর্বত্রই, যেমন, 'হয়-ও নেয় না', 'নেকড়ের চক্ষের দেখা ছিনতিন, সন্দেহ ও ভয়' ইত্যাদি। 'সন্দেহ ও ভয়' ক্রমে পড়া শক্ত, বাকি আমারই বিদ্যার জড়তা বুঝতে পারছি না।

সম্প্রতি একই কবিতায় হঠাৎ বিভিন্ন ছন্দের আমদানি করা বিষ্ণু দে-র অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার মনে হয় কবির খেয়ালখুশি চরিতার্থ করা অথবা আপাতবৈচিত্র্যের সন্ধান প্রয়াস ছাড়া এগুলির পিছনে আর কোনো উদ্দেশ্য কাজ করেনি। রবীন্দ্রনাথ রক্তের 'অর্কেস্ট্রা' নামক দীর্ঘ কবিতাটিতে যেমন সামগ্রিকভাবে সমস্ত রচনাটির ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রয়োজনে একটির পর একটি ছন্দ আত্মপ্রকাশ করেছে, বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে তা হয়নি। ফলে পাঠক একটি মূল সুর খুঁজতে গিয়ে বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েন। এবং ভাবসংগতি হারিয়ে কবিতাও শিথিল হ'য়ে যায়। বিষ্ণু দে-র সাম্প্রতিক কবিতার এই শৈথিল্যপ্রবণতা তাঁর অনুগামীরা অনায়াসেই নকল করেছেন। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কেনানো কাঁপানো পদ্য এবং মণীন্দ্র রায়ের বক্তব্যবর্জিত আঙ্গিকসর্বস্বতার জন্য বিষ্ণু দে-ই সম্ভবত দায়ী। আক্ষেপের বিষয় অনুকারকদের কাছে কবির মনোবৈভব একেবারেই ব্যক্ত হয়নি।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধারে'র কয়েকটি কবিতা স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। কিন্তু কোথাও-কোথাও কবি ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করেছেন ব'লে মনে হল। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

দিবাস্বপ্নের আসনদেশে সদাকালের তন্দ্রায়
চাপালি না যে—দুপারে পদ্মা, তরীটি বাঁধা তাই বাঁধ।
শান্তাকীরব বিলিয়ে দিয়ে বাজায় মনে সন্ধ্যায়।

(বালাই : দুই আকাশ-এর অঙ্গ)

পড়তে কোনো অসুবিধা হয় না, কিন্তু 'চাপালি না যে' এবং 'দুপারে পদ্মা'—দুটোতেই এক মাত্রা ক'রে বেশি আছে ব'লে আমার মনে হয়। 'আগামীবারে সমাপ্য' নামক কবিতাটিও স্বরবৃত্তে শুরু হ'য়ে 'হয়তো এ গ্রামে দুটি জীবন দিয়ে যুঝি'-তে মাত্রাবৃত্তের মোহে চরিত্র হারিয়েছে। প্রসঙ্গত এখানে স্বরবৃত্ত ছন্দে এই ধরনের স্বাধীনতা কিছু দে ছাড়াও আরো অনেকে নিয়েছেন, জীবনানন্দ দাশ তো প্রচুর, বুদ্ধদেব বসুও। শেষোক্ত জন লিখেছেন :

কাকের ডাকে অবাক হ'য়ে তাকাব যবে।
কিংবা, চৌরঙ্গি-মোড়ে
হঠাৎ থেমে থমকে দাঁড়াব কোনো কবির
পুরোনো লাইন মনে প'ড়ে

(কবিতাপাই : শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর)

এখানেও 'পুরোনো লাইন' পর্বে, কড়া নিয়ম অনুসারে, এক মাত্রা বেশি আছে দেখতে পাই। স্বরবৃত্ত যে চারমাত্রার ছন্দ, ছন্দশাস্ত্রের এই ম-মা-ত-ক-কেও যদি অগ্রাহ্য কবিতা অমান্য করেন তা হলে আমরা নাচার। রবীন্দ্রনাথের হাতের পা স্বরবৃত্তে কবিতা লেখার রেওয়াজ প্রায় উঠেই গেছে। কিন্তু স্বরবৃত্ত যেহেতু গ্রাম্য ছড়ার ছন্দ, তাই এর চর্চায় বাংলা কবিতাশৈলীর একটি মূল্যবান ঐতিহ্যের ধারা রক্ষিত হবে। সুধীন্দ্রনাথ একবার এই ছন্দে অনেকগুলি নিখুঁত কবিতা লিখেছিলেন : 'অর্কেস্ট্রা'র 'হিরণ নদীর বিজন

উপকূলে, 'বেলাভূমে শুনিয়েছিলেম তোমার প্রেমে' এবং 'সংবর্তে'র 'তোমার আমার বাতির মতো ঘরে' স্মরণীয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তিনিও আজকাল স্বরবৃত্তে তেমন উৎসাহিত নন। বিষ্ণু দে-র কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এই জন্য যে তিনি স্বরবৃত্তের চর্চা ছাড়েননি। তার চাইতেও বড়ো কথা, প্রায় ছত্রায় অন্তঃশীল প্রাণময়তা আর সকলের তুলনায় তাঁর রচনাতেই সব থেকে নৃত্যময় হ'য়ে ওঠে।

পরিশেষে আর একটি কথা বলতে চাই। অন্ত ভাবে সাজালে হলে এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা পাঠ করা সহজতর হ'ত। যেমন নিচের পঙ্‌ক্তিগুলি :

> তিলোত্তমা ঘড়ি কলের ঘোড়ার মতো—
> এ কি ঈশোপীয় বাণ এ কি কথাবীথি ভাষা। ০০
> বীচ ভোলে, আপো, আমার নিত্য উপধানী,
> এ কে বান করে এ কি অনন্তকালো ভাষা
>
> (তিলোত্তমা ভাষা)
>
> সায়াহ্নের পীত মাথায় ঘুলপি দুলে, মাছি ভ্রমর ;
> উড়ো ওড়ে তেপান্তরের ফুরা—
>
> (তিন আর্থে-তে)

'এ কি', 'এ কে' এবং 'মাছি ভ্রমর' বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে থাকলে অথবা ওদের একটু ঘুরে সরিয়ে রাখলে মাত্রার সঙ্গে একাকার হ'য়ে যাওয়া অনর্থ ঘটাতে না। ভালো কথা : 'রথযাত্রা ঈদমুবারকে' নামক আট-দশ মাত্রার অক্ষরবৃত্তে 'আজ মনে হয় আমাদের স্বপনে অদেখে' নিশ্চয়ই ছাপার ভুল ?

অরুণকুমার সরকার

শরতে এক ঋতু : র‍্যাঁবো। অনুবাদক : লোকনাথ ভট্টাচার্য

(নাতানা : ২,)

লোকনাথ ভট্টাচার্য নিজে সুকবি এবং অত্যন্ত সুস্থ কবিতার অনুরাগে হাত দিয়ে তিনি, শুধু সাহস নয়, ক্ষমতারও পরিচয় দিয়েছেন।

গত শতাব্দীর ফরাসী কবিতার বিস্ময়কর ঐশ্বর্যের মধ্যেও র‍্যাঁবোর জীবন ও কবিপ্রতিভা চমকপ্রদ। ইওরোপে বোহেমি কবি সাহিত্যিকের কথা বহুকাল ধরে' শোনা যায়, আর্ট পোএট থেকে এক্কালের সিং. বিদ্‌কে, বিয়ার্স প্রভৃতি অনেকের কীর্তিতে ও জীবনে দেখা যায় বিকৃত বা খণ্ডিত সমাজের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধাচরণের অদ্ভুত চেষ্টা। ছেলে বেলায় শান্ত শিষ্ট উইলিয়ম শেক্‌স্‌পিয়রের মধ্যেও দেখা যায় প্রতিভার অনন্যসাধারণ বোহেমিপনা : স্ট্রাটফরডের গ্রাম্য যুবকটি কেন যে প্রায় স্টিরিসের মুখে লেখক হয়ে গেলেন এবং "টেম্পেস্ট" লেখার পরে লেখা একেবারে ছেড়ে দিয়ে অলভরম্যানের মত জীবনযাত্রার শেষ ক'বছর কাটালেন, সে বিষয় র‍্যাঁবোর বিস্ময়করতার চেয়ে কিছু কম নয়, যদিও শেক্‌স্‌পিয়র ইংরেজমাত্র এবং র‍্যাঁবো ফরাসী।

প্রসঙ্গত মনে হচ্ছে এ দুজনের আরো যেন মিল আছে। তাঁর অনেক তীব্র মুহূর্তে শেক্‌স্‌পিয়রও এমন কবিতা লিখেছেন যা মানবজীবনের রূপ উদ্‌ঘাটিত করে যেন আবেগের বজ্রে বিদ্যুতে বা প্রখর রৌদ্রে বা দুরন্ত নিকষ রাত্রির অন্ধকারে, এবং সে সব লাইন র‍্যাঁবোর মতোই অমোঘ, অনিবার্য, পুনর্লিখনের বাইরে : অবশ্য শেক্‌স্‌পিয়র শুধু তাঁরই অল্পবিস্তরের বয়সে পাঁচ-ছ বছর কাটিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তাঁর গভীরতর ও ব্যাপকতর কবিসত্তা মিরাণ্ডা, পর্শিয়া, মারিনাকেও খুঁজে পেয়েছিল আপন স্বভাবের বিশ্বে।

লোকনাথবাবু যে শেক্‌স্‌পিয়রের আত্মীয় রহিত বালক ও অকালস্তব্ধ ফরাসী কবির আশ্চর্য কবিতার একটি গোটা বই আমাদের উপহার দিয়েছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতাটাই বড়ো কথা। ফরাসী আমরা কমই জানি, তাছাড়া র‍্যাঁবো তাঁর সংযমে, তাঁর অপরিবর্তনীয় রীতিতে কঠিনও বটে। লোকনাথ-

ধাবুর নিষ্ঠা তাঁকে সফল করে তুলেছে এই কঠিন অনুবাদের কাজে। ফরাসী কবিতার অনুবাদ বাংলায় আজো যা দেখা যায় তার মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদগুলি বিশিষ্ট। সুধীন্দ্রবাবুর অনুবাদে যাঁরা হাত পাকান তাঁর আদর্শগত মানদণ্ডের তাঁরি বক্তব্য-প্রধান গৌড়ী রীতি। এমনই স্বপ্রতিষ্ঠ তাঁর কবিস্বভাব ও রীতি যে প্রায়ই দেখা যায় যে, তাঁর, ধরা যাক, মালার্মের অনুবাদে মালার্মের কবিস্বরূপ মিলিয়ে যায়, থাকে আমাদেরই এক অগ্রগণ্য কবির পর্বে পর্বে নির্বাহে নির্বাহে অবলম্বী রচনা, যার বৈদগ্ধ্যগত ও আঙ্গিকগত নৈপুণ্য স্বতন্ত্র।

লোকনাথবাবুর নমনীয় কবিস্বভাবে যা আক্রমণের ক্ষমতায় বাঁধোয়া কবিস্বভাব কিছুটা অব্যাহত বলে মনে হল এবং আশা জাগায় তাঁর হাতের আরো অনুবাদ-গ্রন্থের। অবশ্য এ গ্রন্থেও তিনি হয়তো আরো অবহিত হতে পারতেন, অনুবাদের প্রচণ্ড দুরূহতা সত্ত্বেও। যাক সে-সব প্রত্যাশা, খৃস্টান নরকের ঐতিহ্য যাঁদেরো মনের পিছনে, কিন্তু তাতেই আমরা পাপ বলতে যা বুঝি, তা খৃস্টানের পাপবোধ নয়। অনেক সময়ে লোকনাথবাবু কেন যে কথা লাগাতেছেন, তা আমি ঠিক বুঝি নি, পণ্ডিত ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন। যেমন প্রথমেই তিনি লিখেছেন: আগেকার দিনগুলোর: অথচ কথাটা একটি কথায় বলা যেতে পারে: "আদিম" বা একদা, আক্ষরিকার্থেই একদা।

"একদা, যদি ঠিক স্মরণ থাকে, আমার জীবন ছিল এক উৎসবভোজ, যেখানে খুলেছিল সব হৃদয়, যেখানে ঝরেছিল সব রকম সুরা। এক সন্ধ্যায় আমি নিলুম সুন্দরীকে কোলে। যেখলুম সে তিক্ত এবং তাকে আমি অপমান করলুম।

আমি অস্ত্র ধরলুম ন্যায়ের বিরুদ্ধে।

আমি পালালুম। ওগো জাদুকরী, হে দুঃখ, হে ঘৃণা, তোমাদেরই কাছে আমার সর্বস্ব রইল গচ্ছিত।

আমি পারলুম আমার মধ্যের প্রতিটি মানবিক আশা নিভিয়ে দিতে।

চৈত্র ১৩৪১

প্রতিটি আনন্দের উপরে আমি পরমুহূর্ত ছিল পশুর সতর্ক দাঁতে, ছিঁড়ি ছিঁড়ে খাবে।

যেমনি Qu'il vienne, Qo'il vienne,

Le temps dont on s'éprenne এর বাংলা তিনি করেছেন :

হোক্ সময়, সময় তার হৃদয় প্রেমে পড়বে যার।

অথবা Au bourdon farouche

De tres sales mouches—এর বাংলা করেছেন : নিষ্করুণ মোমাছির যেমন খুঁজে মাছির ছিন্ন।

শেষ লাইটি তিনি লিখেছেন : এমন যদি চাই দেহের মধ্যে, মনের মধ্যে সত্যকে ধারণ করতে, সেই-দাবি ব্যর্থ হবে না আমার।

—et il me sera loisible de posséder la verité dans une âme et un corps—এখানে আমি যা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না পাবব এক মনে ও একদেহে সত্যকে লালন করতে যা করা। দুটির ঝোঁক এক নয়। র‍্যাঁবো চেয়েছিলেন সত্যকে ধারণ করতে একটি মনে ও দেহে।

বিষ্ণু দে

প্রাপ্ত

চিত্রবিচিত্রা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রিত। 'সহজ পাঠ' ও 'পত্রপুটে'র সমকালীন ছোটোদের কবিতার সংগ্রহ। ঐ দুটি গ্রন্থের অনেক কবিতার পাঠান্তর এখানে পাওয়া যাবে। কবিতাগুলি মনোহর। দাম তিন টাকা। মাসি : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'মাসি', 'সরলতা', 'হাতে খড়ি' এই তিনটি গল্পের সমাবেশ। আড়াই টাকা। প্রবন্ধসংগ্রহ : প্রমথ চৌধুরী, দ্বিতীয় খণ্ড। এই গ্রন্থ তিন অংশে বিভক্ত : 'ভারতবর্ষ', 'সমাজ', 'বিবিধ'। লেখকের প্রতিকৃতি সংবলিত। পাঁচ টাকা। চার-ইয়ারি কথা : প্রমথ চৌধুরী। বিখ্যাত গ্রন্থের নূতন সংস্করণ। ২।০ ও ৩।০। সাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নূতন সংস্করণে এগারোটি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত হ'লো। ৩।০। সমবায় নীতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী-সংগ্রহ, ৷৷০। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান : প্রমথ চৌধুরী। বিশ্বভারতী-সংগ্রহ, ৷৷০। কাকলি : প্রথম খণ্ড। অতুলপ্রসাদ সেনের গানের স্বরলিপি। ২।০। শেষোক্ত সাতটির প্রকাশক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, অন্যগুলির বিশ্বভারতী।

ভীমরাজের দাঁতের প্রবন্ধ-তালিকার সংযোজন

['কবিতা'র যত সংখ্যা প্রকাশিত হবার পরে ফোলো-ফোলো পাইক ভীমরাজের অন্যান্য প্রবন্ধ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তাঁদের পত্র থেকে বিষয়ের তালিকাটি সংকলিত হ'লো।]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	দেশ,	বর্ষ ১৮,	সংখ্যা ২২, চৈত্র ১৩৫৮
বিদ্যার কথা	,,	,,	৪৪, ভাদ্র ১৩৫৯
শিক্ষা সংস্কার	,,	,,	৪৫, ,, ,,
সাহেবিয়ানা	মাসিক বসুমতী		আশ্বিন ১৩৫৮
অসমাপ্ত আলোচনা	চতুরঙ্গ		ত্রৈমাসিক-পৌষ, ১৩৫০
উত্তরাধিকার বাংলা-কাব্য	যমুনা		ত্রৈমাসিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৫১
(রামমোহন কলেজ পত্রিকা থেকে সংকলিত)			
কবিয়াল আন্টা ও পাঁচালি	পাঞ্চালিকা বসুমতী		আশ্বিন ১৩৫৪

কবিতাভবন, ২০১ রাসবিহারী এভিনিউ থেকে বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক প্রকাশিত ও পূর্ণিমা প্রিন্টিং হাউস, ৫৪ গণেশ এভিনিউতে সত্যপ্রসাদ বসু কর্তৃক মুদ্রিত।

দেশবিদেশের খবরের জন্য

(১) **উইকলী ওয়েষ্ট বেঙ্গল**—পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬ টাকা ; ষাণ্মাসিক ৩ টাকা।

(২) **কথাবার্তা**—সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থনীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩ টাকা ; ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা।

(৩) **বসুন্ধরা**—গ্রামীন অর্থগতি সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিক-পত্র। বার্ষিক ২ টাকা।

(৪) **স্বাস্থ্যশ্রী**—স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টিবিজ্ঞান ও খেলাধূলা সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিকপত্র। বার্ষিক ৩ টাকা ; ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা।

(৫) **পশ্চিম বংগাল**—নেপালী ভাষায় সচিত্র পাক্ষিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ১৷৷০ টাকা।

(৬) **মগরেবী বংগাল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩ টাকা ; ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—(ক) চাঁদা অগ্রিম দেয় ;

(খ) সবগুলিতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় ;

(গ) বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই ;

(ঘ) ভি পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক **মাইটাস' বিল্ডিংস্**, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রচার অধিকর্তার নিকট লিখুন।

কবিতা
আষাঢ় ১৩৬১
ঊনবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
ক্রমিক সংখ্যা ৮২

পৃথিবীলোক

জীবনানন্দ দাশ

ঘুরে আসে কেবলি নগর, ঘর আসে ;
গ্রামগুলোর শব্দ হয় ;
মানুষেরা ঢের ঘুম কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,
যেখানে তাদের ছাড়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,
বিহ্বলতা ব'লে মনে হয়।

এ সব নূতনতা ছাড়া কোনোদিকে আজ
কিছু নেই সময়ের তীরে।
শুধু ব্যর্থ মানুষের গ্লানি ভুল চিন্তা সংঘর্ষের
অবিরল মরুভূমি ঘিরে
বিচিত্র দুঃখের শব্দে মিশে এক বেশ
এ পৃথিবী, এই প্রেম, জ্ঞান, আর হৃদয়ের এই নির্দেশ।

মূল 'খাতা' পত্রিকা থেকে সংকলিত

স্তব্ধী

অমিয় চক্রবর্তী

বোধিসত্ত্ব

কালো পাথরের ভিতে অচল মূর্তির সারি জমে
প্যালিথিক তীরে মুজিয়মে।
স্তিমিত তলাংশ কাল, যাদু-হারা তাঙা দেবে ছায়
বিকীর্ণ হস্তক বায়ুকোণ।
পণ্যের সংগ্রহে দম্য, সঙ্কেত বিস্তৃত বক্ষে তারি
পটচিত্র করে পাচোরি:
এরি মধ্যে অধিকার বোধিসত্ত্ব তুমি আছ ব'সে
নির্বাসিত যুগের প্রদোষে—
তারা এসে ফেলে গেছে এশিয়া-রাশির যত কেনা,
মণ্ডপ টিকিটে যাবে চেনা,
আদি ধাত্রী আলোকের প্রয়াণ তোমার পদ্মচোখে
আজো নিমীলিত ধ্যানলোকে,
জটিল যুগের দৃষ্টি হঠাৎ প্রস্তর-উজ্জীবনে
খুলবে কি এই অন্ধ কণে?

মন্ত্রাজ

মণিপদ্ম মণিময় তুমি
ও
ইলেকট্রনিক ঘরে আজ
নেত্রকোণে বহু পূর্বী
ও
নিয়ন্ত্রিত অনন্তর

ক্যাস্‌ট্রির মন্দার মেঘে মেঘের পালক
অন্ধকারে
আদি রাশি সাংখ্য বৃষ্টি ও ভারতীর
ঊর্ধ্ব জ্যোতিষ্কিক কারা মিশরের
শান্ত সূর্য চীন সমাজের
উত্তাল ভিয়েন বীজ আমেরিকার
কোথাও আরব লাল সমুদ্রের প্রাণিত্তিক
উজান নবম-অন্তরেখা
ও
তুমি সেই হৃদয়ের রক্তকোষ বেদ্‌নি রশ্মি
দিক্‌-নাবিক
পর্বতী ভিক্ষতী ঐ
ধ্বনি ও
দুরন্ত অন্বিষ্ট পথে
তোমার মুখের জ্যোতি পৌঁছিয়ে দেবে।

মহাজ

বাহিরে ট্রাক্টিকে প্রৈতি বিশ্বের অন্বেষী
(জাগো জনদেব জনে জনে)
দুপের ঘর্ষর ক্রমে বেশি।
সীমান্তেই মনোচেউ শানে মাথা কোটে
(জাগো জনদেব)
সংঘে সংঘে শক্তির সংকটে।
(জাগো জনতার দেব জনে জনে)
সৌরেন্দ্রী সুস্থতায় শিল্প কারা ধাত্রী বিশ্বে দেরে
—সাম্য সেও হয় মন্ত্রে দেরে—

(জাগো জনদেব)
জাতির যৌবনে কোন অনাদ্যির মানচিত্র আঁকা
দেশে গ্রামে শুধু ছায়া-পাখা।
(জাগো জনতার দেব অনে অনে)
যে-প্রভব ঐশিতার মূলে যীশু চালে
মহার্ঘতা যার মহাকালে
(জাগো জনদেব)
প্রলয়প্রস্তুতি দিনে আত্মাহুতি মহত্তায় কাঁপা।
সে-দৃষ্টি যায় না তবু চাপা।
জাগো জনতার দেব অনে অনে
(জাগো জনদেব)
যে-আগুন দাহ নয়, দীপে দীপ্তি, সংবাহের দিনে
ঘরে ঘরে নিতে হবে চিনে
(জাগো জনদেব)
কৌশলীর কালো ধূমে আগত-ঘরের লগ্নে ভাবি
(জাগো জনদেব)
গড়া হবে কার শুভ দাবি।
(জাগো জনদেব অনে অনে)
যে-মৈত্রী ও-মুখ ছোঁয়, তোলে শুভ করুণা তর্জনি
(জাগো জনদেব)
ক্ষয়িষ্ণু-প্রবিষ্ণু দিনে তারি মুক্তি গণি।
(জাগো জনদেব অনে অনে)

* সাতারা কর্তৃক অভাগিতবা দেবতের 'পালা-বদল' গ্রন্থ থেকে

ইচ্ছেরা

সঞ্জয় আচার্য

যত নদী ছিল যত পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝরা,—
যত না হ্রদের হৃৎপিণ্ড-জোড়া নাড়ী,
ফটিক, লোহিত, নীল, দুধ-সাদা ঝুরোদের ঘর,
মনে এনে সব-কিছু ভাসিলাম কাকে তাড়াতাড়ি,
বেতে হবে ব'লে—কা'কে ডাকি ?

যতো দিক ছিল চোখে পশিতের মতো,
আকাশের বুকে নীহারিকা-ইতস্তত,
পাতালের ঝিরঝিরে বালুর সরণি—
চুল-ছোঁওয়া পায়ে-ঠেওয়া বাসর-রজনী
নাহে ওঠে মনে—সব ডাকি।

সব ছেড়ে চ'লে যাওয়া এতো চুপচাপ !
গেলো তো কতোই আরো, নেমে গেলো সাপ
সরল-গমনে, বৃত্তি পলকের সবে নেই আর,
তেমন আমারে যাত্রা মৃত্তির সমুদ্রে অনিবার,
পাইনে তোমায়, ফিরে আসি।

তুমিও তপস্যা ছেড়ে গেলে যদি তুলা রাশি কোথা।
বেবে আর কোন মুক আলাপন-স্রোতা
মুখানীর বারিধারা কণ্ঠে নিতে কের জলাহরে ?
বেবে যদি বলে কেউ, ফিরি তবে ঘরে,
ফিরে তোমাকেই ভালোবাসি।

তপতীর মৃত্যু

বিষ্ণু দে

তোমার অভাবে বেঁচে আছি
নিত্যই অভাব
মেঘের যেমন রৌদ্র প্রতিদিন,
কখনও কখনও অবশ্য শ্রাবণ আসে
তাতায় শুকায় কখনও বৈশাখী
তালের কিশোরে হাসে কখনও বা ছায়িকা আশ্বিন
কখনও পৌষের রুক্ষতমে তপোবায়।

জানি আছ, সেই ঘর আছে,
আজ-ও উঠানে নিষ্পাপে আলোছায়া ঘরো,
বাদামের কোণে সেই আরামকেদারা পাতা,
মাথা ঘুরে যেল এলোচুল
আর ভ্রমরের গান করো।
চক্রের অভাবে তবু ঘরোঘরো তোমার অভাব,
মেঘের যেমন রৌদ্র কিংবা শিরীষের
যেমন ছায়ায় শাখা। পাতার শুভভাব এবং ঝড়ের।

তাই কি করে না তবু অভ্যাসেই বসে
চলে এক অর্থহীন প্রাকৃতিক অস্তিত্বের দিকে?
এই তো তোমার ঘর, তোমার আস্‌বাব
তোমারই সকাল সন্ধ্যা, চারদিকেই অনুপম তোমার প্রভাব,
তবুও অভাব, একটি মানুষ আনে আরেকের,
সবাই অভাব অভাবের হাতে-হাতে মেপে রৌদ্রে
রৌদ্রেরকে শিকড়ে শিকড়ে।
প্রতিদিন তপতীর মৃত্যু যাই দেখে ঠেকে শিখে।

সনেটগুচ্ছ

বুদ্ধদেব বসু

কোনো কুকুরের প্রতি

আমাকে দিলো না দৃষ্টি। বিচ্ছেদে ভ'রে আছে মন।
বন্ধ পাখি মানা, তবু ম'রে যায় ঘুম আর কাছে।
বহুদিন-প্রতিশ্রুত আজ আর কালের চুম্বন
অবশেষে ঠেকে যায় স্বচ্ছ এক ক্ষমাহীন কাচে।

বরং, কখনো যারা কাগজের নৌকোর চ'ড়ে
যেখানে সাগর-পাখি, যেখানে মাও তাদেরই কাটকে,
সাধে ধাড়ি, মাংস-ভাত ; গন্ধের অন্ধকারে ঢুকে
ঘুমোবে, ঠুলুরঘেনা, মেয়েদের হাতের আদরে।

যাবে না ? তবে কি তাদের সমানুকম্পনে
উঠবে হঠাৎ বেজে আমি এক অদ্ভুত বাঁশরি,
এঁকে রেখো তোমার হরিণ-চোখে স্মরণের ছবি ?

…কেবল অর্ধেক ঠিক। আমি আমি, স্বর্গের অন্যরা
তুমি, শাপভ্রষ্ট। কিন্তু সেই শাপের মোচনে
আমার আসেনি ডাক। এখনো যথেষ্ট নই কবি।

নির্বাসন

তোমার নরম হাত কিছুতেই ছাড়াতে পারি না।
এত ছোটো, এমন দুরন্তে ভরা, অথচ কেমনে
ছড়ায় ফুলের রেণু, স্পর্শদিয়, এই নির্বাসনে,
ব'য়ে যায় তৃষ্ণার পাথর ঠেলে আঁধার ঝরনা—

অরণ্যে, হারিয়ে পথ, চোখে যারে ডাকে না পথিক,
কানে শোনে প্রাবণ, চুম্বন, অবিরাম। বুঝিনি এখন হবে
বিরাট পরিশ্রম শেষ হ'লে। বহু কষ্টে, গতানুগতিক
গ্রামের আদের ঘর পার হ'য়ে, হিমেল গৌরবে

অবরোধ সরেছি আকাশ ছুঁয়ে ; টাক-পড়া শিহল বেরাল,
দাতপলা কাঁটাতার, তারা কাচ বিলোল দাঁতের মতো ;—
ভয় নেই, ক্ষমা নেই, নেই কোনো করুণ কলুষ।

কিন্তু এই পূর্ণ আজো টিঁকে আছে, না-হ'লে, অনবরত
তুমি তারে ছুঁয়ে আছো ব'লে। নির্বাণের অসীম অকাল
তোমাতেই অস্বীকার দিয়ে ভরা। তারে ছাড়াতে পারি না।

রাত তিনটের সনেট

(১)

শুধু তা-ই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত। গভীর সন্ধ্যায়
নরম, আদরে আলো ; হলদে-ম্লান বইয়ের পাতায়
লুকোনো নক্ষত্র ঘিরে আকাশের মতো অন্ধকার ;
অথবা অন্ধ চিঠি, মধ্যরাতে লাজুক ভদ্রার

দূরের বন্ধুকে লেখা। যীশু কি পরোপকারী
ছিলেন, তোমরা ভাবো ? না-কি বুদ্ধ কোনো সমিতির
মাননীয়, যাচাল, পরিশ্রমী, অর্থীতির
মোহগ্রস্ত সভাপতি ? উদ্ভাবের অস্বীকারী

ব্যস্তিব্যস্ত পাওনাদের অপকম্প, চাষার, পাহারা।
এড়িয়ে আছেন তাঁরা উদাসীন, শান্ত, হালহাড়া।
তাই বলি, অসন্তোষে ছেড়ে যাও, যাক সে যেখানে যাবে।

হও স্বাধীন, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পুলকে বধির।
যে-সব খবর নিয়ে সেরকেরা উৎসাহে অধীর,
আর ষষ্ঠা নারীর আদরে তার ঢের বেশি পাবে।

(২)

এ নয় তোমার জন্ত। শুধু বই আছো আছে খোলা।
যারা হাসে, মন্ত্র পড়ে, চুংটোৎ চায়ের টেবিলে,
তারাই, শোবার আগে, পড়শির আলো নিবে গেলে,
হ'বে যায় উড়োর-ঘরের যাত্ত ইন্দ্রর, আরশোলা ;

ঘুষ করে, খুঁটে খায় ; নিমন্ত্রণে অভ্যর্থনার
অস্তিত্ব না-জেনে শুধু উচ্ছিষ্টের তাবে ইতিহাস।
এ নয় তোমার জন্ত। ফুল, ফল, বন্ধু, যারো যশে
ঘুরে-ঘুরে যা বলে তা শিখে নাও। ঠিকানা রেখো না আর

কোনোখানে ;—বাস্পলীন, ধবল, সরল ডিসেম্বরে
বিস্তৃত, চক্রাস্তকারী, নিরুদ্দেশ বসন্তের মতো
যাও ঘুরে, বেদাস্তরে, সাগরের শেষ দ্বীপান্তরে ;

অনামী অসাধ্যবান, চেষ্টাহীন, অপ্রতিহত,
নতুন ভাষায়, সোমো, নক্ষত্রের দীপ্ত মহিমায়
চরাচর, চিরকাল নিমন্ত্রিত তোমার শিয়রে।

২

স্বর

ঠোঁট বড়ো দেখেছি প্রথমে। মেহোগায় পড়েনি প্রথম টান,
যবনিকা আলোয় সিউরে ওঠে। মনের উল্লাসে
টুকরো এক দিগন্ত ঘটিয়ে যেন সকল আকাশে,
মুহূর্তে-মুহূর্তে আরো লাল হ'তে, চুম্বনের চকল পুলাগ—

অর্থাৎ, নতুন দিন, হঠাৎ যৌবন ফিরে পাওয়া।
তারপর কণ্ঠস্বর। জানি, প্রাণ, বীজের ভাণ্ডার
ভ'রে যায় বিনাশে, মথিয়ে, যেন শচীর ঘণ্টায়
ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি ছিনিয়ে, মৃত্যুর মতো হাওয়া।

সিক্ত করে স্মৃতির তবের বৃন্ত—দুঃখের কৌটোয়।
কিছু না, কেবল হাওয়া ; কম্পন, চমুর ঢেউ, অথবা প্রমাণহীন
মনের শিশুর কান্না ঠেলে ওঠে সুখের বোঁটায়।

জানে, সে অসহায়ের। কিন্তু, হে হস্পতী, যারা আজ
শিরের লেপের তলে নাগরিক আলিঙ্গনে লীন—
জানো কি, বন্দর ছেড়ে এইমাত্র চ'লে গেলো সে কোন জাহাজ?

মরুপথ

যতক্ষণ খেয়ার উপায় ছিলো, কিছুই বোঝেনি।
তারপর চেয়ে আছে, শুধু বালি ; দিগন্তের নেই অন্তরাল।
যাযাবর, কাঁটার ঝোপ, দু-একটা উটের কঙ্কাল।
তাবুর পল্লীরে ঘিরে আকাশের বিরাট বন্ধনী

ক্রমশ, ধীরে, সব তাপবাষ্পে জমে পরিণত
ক'রে দিয়ে স্থির হয়। মৌন মেঘ ধারা ক'রে তার
যায়, মেঘ, যেন তারে অন্ধ রেখে পাতালে আধার ;
আর তার তৃষ্ণা চলে দিনে-দিনে, একপাল কুকুরের মতো।

অবশেষে, যখন মরীচিকার পর্দা ছিঁড়ে, দেখা দেয় প্রথম খেজুর,
হালিতে কালোর বৃন্তে প্রসবের দৃঢ় অনুমান—
হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়ে, আকুল পাগল হ'য়ে খুঁড়ে তোলে জল :

অল্প জল, তৃষ্ণায় যথেষ্ট নয়। তবু স্পর্শ নতুন জন্তুর
বীজাণু ছড়িয়ে দেয় ; সিক্ত হাত, কনুইয়ের লোমকূপে ক'লে ওঠে জল ;
এবং ঘর্মসিক্ত কণ্ঠ ঠেলে ফুটে ওঠে সভ্যতার আজান।

স্মৃতির প্রতি

(১)

তোমারেই বেশী ক'রে মানি। কিছু নেই, যা তোমার নয়।
তা-ই তো তোমার ঘুম, যাকে বলি আরম্ভ, কারণ ;
চলে সে গোপনে, তার দিগন্তেও নেই জাগরণ :
কিন্তু যদি আবেক তাকিয়ে তুমি পাশ ফেরো, ফুটে ওঠে ফুলের বিস্ময়,

পৃথিবীর মাটিরে মথিয়া ক'রে চূর্ণো যার উজ্জ্বল আকর।
তাই পট শূন্য প'ড়ে থাকে, পাথর নিলোভ, বীণা
শুধু বিসংবাদী, যতক্ষণ, তটের উদ্বেল ঢেউ পেরিয়ে, তুমি না
দেখাও সাগর-যাত্রা, মুহূর্মান রাত্রি আর দিনের বন্ধুর

আষাঢ় ১৩৬১

পথ দিয়ে ফেলে, নিয়ে যাও মিনারের শান্ত সমতলে,
দূর থেকে আরো দূরে, অন্যান্তরে, প্রাগৈতিহাসিক
নীলিমায়—যেখানে, মাতার গর্ভে, নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জলে

মানবের ভাগ্য আর অফুরান ঐশ্বর্য তোমার।
আঁধার তোমার বক্ষ, কিন্তু তা-ই আলোর অধিক ;
তুমি যা অনন্ত হাতে ফেলে যাও, তারাকড়ি মূল্য নেই তার।

(২)

'গাছ', 'ফুল', 'পুতুল', 'মেঘলা দিন'—এরা শুধু লিপিতের কঠিন সংকেত
হ'য়ে প'ড়ে থাকে : তারপর তুমি যাও পর্দা তুলে ; চেয়ে দেখি, দৃষ্টিও তোমার।
সা রেরে আঙুরলতা বেড়ে ওঠে, হঠাৎ হলুদ ফুলে মিগন্তের খেত
আকাশ বাড়িয়ে দেয়। এইভাবে, পৃথিবী, নক্ষত্র, সব কবি অধিকার।

ঘুরে যাবে, বৃষ্টি যায় দেশান্তরে, সমুদ্রের তীরে-তীরে ছায়াযান ;
মুহূর্তে হারিয়ে যায় চিঠি, ছবি, পাণ্ডুলিপি, ঈহিত ভাণ্ডার ;
কিন্তু শুধু তোমারে সে হারাবে না, ধ্রুবতারা তোমার নিশান
কখনো যাবে না অস্ত দিগন্তরে ; সে-ই সব সফলের অন্তঃসার।

শুধু পথে আমাদের চলা। পিপাসের কণ্ঠে মিছিল
ব'য়ে চলে প্রকাণ্ড লোকার পথ, নৈশব, যৌবন পার হ'য়ে ;
এমনকি মূল থেকে মূলান্তরে টেনে নেয় নদিপত্র, শাকড়, ধলিল :

তাই রক্তে বুকো হ'য়ে ব'য়ে পড়ে মানবের অগ্রগা সন্ততি।
কিন্তু কেউ ফিরে যেতে চায় যদি, তার পথ তোমারই হৃদয়ে—
কেননা কেবল তুমি জানো সেই স্তব্ধ, বাঁকা, ছোঁয়াহীন গতি।

(৩)

আমাদের পরিবর্তনের
অর্থ : এই দেহ মিয়মাণ,
জ্যোতিময় অন্তর উদ্যান
তাও শুধু পিতৃভবনের

নাভীপাঠে কাজল ফুরায়।
কৈশোরের মসৃণ মুখোশ
ঢেকে রাখে জরার আক্রোশ;
প্রগতির দৃশ্য পাহারায়

অবিরাম চলে অবঃপাত।
বাঁচে শুধু, যা তোমার হাত
চিরকাল মূর্ছার কন্দরে

রেখে দিয়ে, করে উন্মোচন—
রূপান্তর থেকে রূপান্তরে—
পৃথিবীর প্রথম যৌবন।

কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'কবিতার অনুবাদ পোড়ো না, ওতে কিছু পাওয়া যায় না।' গুরুদেবের এই নির্দেশ আধুনিক কবিরা পালন করেননি ; তাঁরা, অনুবাদ-কবিতার অবলম্ব জোকা তো বটেই, উপরন্তু নিজেরাও অনুবাদক। কবিতার অনুবাদ সম্ভব কি সম্ভব নয়, এই মস্ত বড়ো অর্থহীন তর্কটা উপকে গিয়ে আমি একবারেই বলতে চাই যে কবিতার অনুবাদও একটি সপ্রাণ, সৃজনাত্মক, মূল্যবান সাহিত্যকর্ম, এবং কখনো-কখনো—কবি আপন ভাষায় কবি হ'লে—তা সৃষ্টিকর্মেরও মর্যাদা পায়। যাকে লেখা বলে, তাও তো এক রকমের অনুবাদ—ভাষার সাহায্যে চিন্তার অনুবাদ. কেউ-কেউ একাধিক ভাষায় একই চিন্তার অনুবাদ করেছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলা আর ইংরেজি কবিতায়—আর নিজের ভাবনার অনুবাদ যে-সব মানসক্রিয়ার ফলে ঘ'টে থাকে, অন্যের ভাবনার অনুবাদেও তার ব্যতিক্রম হয় না। এবং, অনুবাদে 'কিছু পাওয়া যায় না,'—এই উক্তির বিরুদ্ধেও আমাদের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য আছে : আমরা অনেকেই ও-বস্তুর মধ্যে সারা জীবনের সম্পদ খুঁজে পেয়েছি, যেমন কীটস পেয়েছিলেন তাঁর মাতৃভাষার হোমার-কাব্যে। চটালিদানে থাকে পড়াটাই আদর্শ তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু এই আদর্শের প্রতি অন্ধ আসক্তিবশত আমরা যদি বারে-বারেই নতুন ভাষা শিখতে যাই, তাহ'লে—যদি-না কেউ মেধা এবং অধ্যবসায়ের পৌরীশৃঙ্গ থাকেন—সেই চেষ্টার পরিণতি ঘটবে বিশ্বসাহিত্যের প্রত্যাখ্যানে। কার্যত দেখা গেছে, আমরা যারা ফরাশি, জর্মান, ল্যাটিন, গ্রীক, চৈনিক প্রভৃতি ভাষা জানি না, আমরা সে-সব ভাষার কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তে পারি দুই-তিনটি অনুবাদ মিলিয়ে পড়লে ; জানতে পাই কবির মন, কী তিনি বলতে চেয়েছেন, হয়তো তাঁর অভিপ্রায়ও খানিকটা ; মূলের অনেক রমণীয়তা নিশ্চয়ই ধরা পড়ে, কিন্তু—যদি সে-কবি শুধু সুরের খেয়াতি না-ক'রে কিছু ব'লেও গিয়ে থাকেন—মোটের উপর এমন কোনো বাণী নিশ্চিন্ত পাওয়াই যায়, যা আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যে নেই, আর যার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সেই সাহিত্যের শক্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

এই অর্থে একথা পাউণ্ড বলেছিলেন যে অনুবাদও এক রকমের সমালোচনা। সাহিত্যের ভালো-মন্দের যাচ সিদ্ধান্তের দ্বারা না-বুঝিয়ে, প্রত্যক্ষতর উপায় হ'লো উৎকর্ষের উদাহরণ উপস্থিত করা—সম্ভব হ'লে নিজে লিখে, নয়তো অনুবাদের সাহায্যে। ইতিহাসের কোনো-কোনো সন্ধিক্ষণে এক-একটি অনুবাদ-গ্রন্থ সাহিত্যের স্রোত ফিরিয়ে দিয়েছে; এবং আজকের দিনেও, ইওরোপের প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে পরস্পরের ভাষাচর্চায় আগ্রহ যেমন বেড়েছে, পারস্পরিক অনুবাদের স্রোতও স্ফীত হয়েছে সেই পরিমাণে। এর মধ্যে একটি বড়ো অংশ জুড়ে আছে কবিতার অনুবাদ, পুরোনো কাব্যের নতুন অনুবাদ, একই কাব্যের দু-তিনটি সমসাময়িক বিভিন্ন রূপায়ণ। এই কাজে যাঁরা হাত দেন, তাঁরা হয় নিজেরা কবি, নয় 'প্রেমিক'—অর্থাৎ, খাঁটি amateur, নয় তো রসজ্ঞ পণ্ডিত—কিংবা শুধুই পণ্ডিত। শেষোক্ত সম্প্রদায় বিষয়ে কিছু না-বলাই ভালো; কিন্তু অন্যদের মধ্যে কোন দলের কৃতিত্ব বেশি তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। আমরা সেই তর্কের মধ্যে যাবো না; কিন্তু—পণ্ডিত এবং প্রেমিক অনুবাদকের মূল্য, উপকারিতা ও অপরিহার্যতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ক'রে নিয়েও এ-কথা বলবো যে কবিতা বিষয়ে সবচেয়ে ফলপ্রদ মন্তব্য যেমন কবিতাই করতে পারেন, তেমনি তার অনুবাদেও প্রথম এবং সহজ অধিকারী তাঁরাই। যদি কখনো কোনো কবির মধ্যে রুচি, অবসর ও হার্দ্য অনুকম্পার যোগাযোগ ঘ'টে যায়, তাহ'লে তাঁর হাতে যে-অনুবাদ বেরোবে, সেটা হবে নিখাদ নয়, সৃষ্টি। শুধু কোনো বিদেশী কাব্যের প্রতিলিপি নয়, মাতৃভাষাতেই নূতন একটি স্থায়ী সংযোজন, যা থেকে অন্য কবিরা শিখতে পারবেন, এবং—হয়তো—কাব্যে-কাব্যে রচনার ধারা বদলে যাবে। এই রকম সৃষ্টিশীল কবি-অনুবাদক আমাদের মধ্যে দু-জন অন্তত আছেন: বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; এবং সম্প্রতি একখানি অনুবাদ-গ্রন্থেও বাংলা কাব্যের সমৃদ্ধি ঘটলো: সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'প্রতিধ্বনি'।

* প্রতিধ্বনি: সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সিগনেট প্রেস, ৩৪৩

২

'প্রতিধ্বনি' নিয়ে আলোচনার আগে অনুবাদ বিষয়ে আরো একটু ব'লে নেবো—অনুবাদ, তার সঙ্গে অনুবাদকের সম্বন্ধ। অনেকে অনুবাদ করেন পরোপকারের প্রেরণায়—চান প্রিয় লেখকের প্রচার, দেশের সাহিত্যের উন্নতি—কিন্তু কবির পক্ষে এই কর্ম তাঁর পরম স্বার্থের সাধন; শিক্ষা, সংযম, আত্মশোধনের জন্য উৎকৃষ্ট একটি উপায়। রিলকে, রোদ্যাকে দেখে, এই ভেবে আক্ষেপ করেছিলেন যে সাহিত্যে কোনো কায়িক শ্রমের অংশ নেই, যাসের প্রতিটি দিন উদয়াস্ত তা নিয়ে প'ড়ে থাকা যায় না—যেমন কোনো ভাস্কর তাঁর পাথর নিয়ে থাকতে পারেন। ভাস্করের পক্ষে যা 'হাতের কাজ', সাহিত্যিকের পক্ষে তা কী হ'তে পারে তা নিয়ে অনেক ভেবেছেন রিলকে: ভেবেছেন তেমনি ভাবে শিখতে, কোনো-একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করতে (পারেননি), মাঝে-মাঝে অনুবাদও করেছেন। কবিমাত্রেই জানেন, কোনো-একটি কবিতা লেখা শেষ ক'রে ওঠার পর সেটা নকল করা কত আরামের, কত ভালো লাগে তার প্রুফ দেখতে, কিন্তু মনে হয় এমন কোনো কাজ যা নতুন সৃষ্টি নয়, কিন্তু তারই সম্পূরক। আর এর মধ্যে অনুবাদকেও গণ্য করবো আমরা, সাহিত্যের মধ্যে কায়িক বা যান্ত্রিক শ্রমের প্রতিরূপ হিশেবে একেই বলবো সবচেয়ে উপকারী। যান্ত্রিক বলতে এ-কথা বোঝাতে চাই না যে 'বললেই' অনুবাদ করা যায়; ভালো অনুবাদও দৈবাধীন, কোনো-এক রকম প্রেরণার মুখাপেক্ষী, কিন্তু অনুবাদে চিন্তার অংশটা অন্যে জুগিয়ে দেয় ব'লে, কবি তাকে প্রায় একটা প্রকরণগত সমস্যায় পরিণত করতে পারেন, অনেক বেশি নির্ভর করতে পারেন ভাষা, ছন্দ, মিল ইত্যাদিতে তাঁর পরিশ্রমী দক্ষতার উপর। যদি এ-ব্রতে তাঁকে বর্ণান আর সংস্কৃত অভিধান ঘাঁটতে হয়, পড়তে হয় মূল লেখকের জীবনী অথবা সময়ের ইতিহাস, এ-সব কাজ তেমনি তৃপ্তিকর হবে তাঁর পক্ষে, যেমন ভাস্করের পক্ষে মর্মরিমা। যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলার কথা খুঁজে পাওয়া যায় না (এমন সময় সব কবিরই আসে), তখন পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তির বদলে অনুবাদকর্মই শ্রেয়স্কর,

তাতে চর্চার এবং ব্যায়ামের সুযোগ মেলে, 'হাত' ঠিক থাকে, লেখক একটা বিষয়ের অধীন হ'য়ে অপচয় থেকে রক্ষা পান, এবং এই সচেষ্টতার ফলে হয়তো কবিতার প্রকৃতি বিষয়ে একটু তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি, কলাকৌশলে আরো নিশ্চিত একটু নৈপুণ্য তাঁর আয়ত্তে আসে—যে-উপার্জন তিনি মূলে খাটাতে পারেন পরবর্তী স্বকীয় রচনায়।

মূল প্রচর তা'র তোলার জন্য, অথবা বেলাশেষে, কবিরা অনেক সময় অনুবাদ ক'রে থাকেন : কিন্তু এর সত্যিকার প্রেরণা জেগে ওঠে তখনই, যখন কোনো বিদেশী কবির সঙ্গে তিনি আত্মীয়তা অনুভব করেন, কিংবা কোনো অপেক্ষাকৃত গৌণ কবিতাও হঠাৎ তাঁর অত্যন্ত ভালো লেগে যায়। বাণী হোক বা কবিতা হোক, ভালো লাগলেই মনের মধ্যে একটা বেগ জেগে ওঠে, আর সেই বেগের পরিণতি মূলভাষাকে দখল করার আকাঙ্ক্ষায়। এবং, বাণীর মতোই, কবিতাও তাকে 'পেতে' হ'লে নিজেকে আমরা মিলিয়ে দেবো তার সঙ্গে, নিজের একটা অংশ দান করবো তাকে। এই পরম মিলনের নামই অনুবাদ। প্রিয় কবিতা বার-বার পড়তে পারি আমরা, কণ্ঠস্থ রাখতে পারি ; কিন্তু অনুবাদের চেষ্টা করামাত্র তার সঙ্গে যে-অন্তরঙ্গতা জন্মায়, তার কিছুর ধারাই তা সম্ভব হয় না : কবিতাটিকে ভাঙে-ভাঙে খুলে দেখতে হয় তখন ; ধ্বনি, পংক্তি, স্তবকের বিশ্লেষণের ফলে নতুন ক'রে তাকে উপলব্ধি করি এবং অনুবাদ শেষ ক'রে উঠে মনে হয় কবিতাটি এতদিনে 'আমার' হ'লো, কিংবা আমার একটা অংশ মিশে গেলো আমার মূলানুবর্তী প্রিয় কবির মধ্যে। তাঁরই কবিতার অনুবাদে আমাদের আগ্রহ আসে, যাঁর মধ্যে যেন নিজেরই একটা সম্ভাবনার উন্মীলন দেখতে পাই, যাঁর বিষয়ে একবারও অন্তত মনে-মনে বলি—'আহা, আমি যদি উনি হতুম!' কিন্তু এই ঐক্যবোধের ফলেই মনের মধ্যে অন্য একটি ভাবও জেগে ওঠে : মাঝে-মাঝে এ-কথাও মনে হয়—'আহা, উনি যেন এ-কথাটি বললেন না।' অর্থাৎ, অনুবাদের প্রথমদিকে কবির নিজের ভাবনাও সজীব হ'য়ে ওঠে, কখনো-কখনো তাঁর চেয়ে হয় তুল কবিকে মুখোশের মতো ব্যবহার ক'রে কাকে-কাকে

নিজেরই কথা উচ্চারণ করবার। এবং, এই অবস্থায়, অনেক সময় রচনাটি দাঁড়ায়, অনুবাদ নয়, অন্য একটি প্রতিযোগী কবিতা, সাহিত্য থেকেই যে সাহিত্যের জন্ম, এই কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই রকম চরম পরিণতি যখন ঘটে না, তখনও, অনুবাদের ভেতর যে আবহ থেকেও, রং রেখার বিভঙ্গের মাত্রা সমান থাকে না; যে-ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে সে তার নিজের আইন-কানুন জারি করে; যিনি অনুবাদ করছেন তাঁরও ব্যক্তিত্বের সংস্কার অপ্রতিরোধ্য হ'য়ে ওঠে। এইজন্যে, কবি-অনুবাদক বিষয়ে পণ্ডিতি মহলে বড়ো একটি আপত্তি এই যে তাঁরা আক্ষরিক হন না, এমনকি, টেক্সটো পরিবর্তন করেন, মৌলিক পংক্তি অনুবাদের মধ্যে চালিয়ে দেন, এবং মূলের কোনো-কোনো অংশ স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা ক'রে যান।

এই আপত্তির প্রধান লক্ষ্য এজরা পাউণ্ড, যিনি এ-যুগের ইংরেজি ভাষায় সর্বপ্রধান অনুবাদক। মানতেই হয় পাউণ্ডের গলদ অনেক; তিনি সেক্সটাস প্রপার্টিয়াসকে ধ্বংস ক'রে প্রায় নিজের কবিতাই লিখেছেন (মিলিয়ে দেখলে বিচিত্র হাত-সাফাই বলা পড়ে), এবং চীনে ভাষার তাঁর জ্ঞান (শুনতে পাই) একটি বৃহৎ অভিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এ-সব অভিযোগ মেনে নেবার পরেও এই প্রশ্নটি বাকি থাকে: ইংরেজি ভাষার এমন কোনো ঘরানা আছে কিনা, যেখানে ঐ লাটিন কবির আর চীনে কবিদের আত্মা ওর চেয়েও সার্থকভাবে বিধৃত হয়েছে, কিংবা সেখানে পরিপূর্ণ রোম আর প্রাচীন চীনের সামাজিক, নাগরিক ও কাব্যিক আবহাওয়া ওর চেয়েও জীবন্তভাবে সংহত হ'য়ে উঠেছে। আর এই প্রশ্নের উত্তরে—পক্ষপাতেও শেষ পর্যন্ত মানতে হয়—না, কোথাও হয়নি; মূল কবিরা আধুনিক ইংরেজি ভাষায় লিখলে যা হ'তো পাউণ্ড যেন ঠিক তা-ই সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য, অথচ যাথার্থ্যের খাতিরে, 'মুলে'র প্রয়োজন, ভাষার ও ভঙ্গির যে-সব বৈশিষ্ট্য দরকার, তাও ঠিক-ঠিক মাত্রায় জোগাতে ভোলেননি। এই লক্ষণ-গুলোতেই তাঁর অনুবাদের বিশ্বস্ত-ঘোষণা। আসলে, আক্ষরিকতার দাবিটাই অর্থহীন: ফরাসি ভাষায় ব'লে থাকে যে অনুবাদ জিনিসটা মেয়েদের মতো,

প্রশংসা ক'রে সন্তুষ্ট হয় না, সন্তুষ্ট হ'লে কুণ্ঠিত হয়। উক্ত গুণের সমন্বয়কেই আদর্শ ব'লে মানতে পারি—এমন আদর্শ, যা বাস্তবে কখনো ধরা দেবে না। কেননা—একটু ভাবলেই বোঝা যাবে—'আক্ষরিক অনুবাদ' কথাটাই সোনার পাথরবাটির মতোশোনায়। কোনো কবিতার 'আক্ষরিক' মূর্তি শুধু সে নিজেই, সে এক ও অনন্য, অনন্তকালের মধ্যে ঠিক ঐ কবিতা আর-একবার সৃষ্টি হবে না। ছন্দের বিধান, ধ্বনির বিধান, বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও প্রকরণের বিধান—এই সমস্ত চীৎকার ক'রে ব'লে দিচ্ছে যে 'আক্ষরিক' ও 'অনুবাদ' এ দুটি সংজ্ঞা পরস্পর-বিরোধী, ভাষান্তরে নিতে গেলেই কিছু-না-কিছু পরিবর্তন অনিবার্য—বিশেষ্য বদল হবে বিশেষণে, কিংবা বিশেষণ বিশেষ্যে, কথা বাদ যাবে, যোগ হবে, আগের লাইন চ'লে আসবে পরে, শব্দের অনুক্রম এক থাকবে না। এই পরিবর্তন সচেতনভাবেই সাধিত হ'য়ে থাকে, কিন্তু যথেচ্ছভাবে নয়; ভাষার অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলার চাপে মৌলিক রচনাও আদি স্তবকের 'আক্ষরিক' অনুসরণ করতে পারে না, এবং অনুবাদও সেই একই নিয়মের অধীন। এ-অবস্থায় অনুবাদের উচ্চতম লক্ষ্য হ'তে পারে—(১) মূলের ভাব, বক্তব্য বা সংবাদের পরিবেশন, (২) চিত্রকল্প, ভাষার ভঙ্গি, ছন্দ, মিল ও স্তবকের বিন্যাস, অর্থাৎ সমগ্র রূপ-কল্পের অনুসরণ, (৩) মূল কবির দেশ ও কালের যথাসম্ভব, এবং (৪) অনুবাদের ভাষায় একটি সুন্দর—অন্তত সুপাঠ্য—নতুন কবিতার রচনা। অনুবাদের ভাষায় রচনাটি ভালো হবে, পাঠযোগ্য হবে—এই দাবিটাই সবচেয়ে জরুরি।

৩

(ক) That time of the year thou mayest in me behold,
When yellow leaves, or none, or few do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruin'd choirs, where late the sweet birds sang.

In me thou seest the twilight of such day,
As after sunset fadeth in the West,
Which by and by black night doth take away,
Death's second self that seals up all the rest.
In me thou seest the glowing of such fire,
That on the ashes of his youth doth lie
As the death-bed, whereon it must expire,
Consum'd with that which it was nourish'd by.
This thou perceiv'st, which makes thy love more strong,
To love that well, which thou must leave ere long.

(৮) আমার মাঝারে হের সংবৎসরের সেই কাল,
যখন পল্লব পীত, ফুরোবটি ফোলে কি না ফোলে,
ছিন্নবাসে কম্পমান শাখে শাখে বিরিঞ্চি কঙ্কাল,
কৃজন-আস্থিমা-শূন্য, মূকপ্রায় পাখী সেথে চ'লে।
আমার মাঝারে হের সন্ধ্যালোক গোধূলিলগনে,
সূর্যাস্তের পরে যবে দিন চলে পশ্চিমসাগরে,
আর ধীরে ধীরে কৃষ্ণ রাত্রি তারে টানে আলিঙ্গনে,
মৃত্যুর দ্বিতীয় সত্তা, ঘুমে ঢাকে সবারে আদরে।
আমার মাঝারে হের সেই বহ্নি যৌবনশিখা যার
ভাসন যৌবনতন্তে জ্বলে যায় তবু নেলিহান,
যেন যা আপন চিতা জ্বালে দেখা মৃত্যু অনিবার,
জীয়ায় যা তাকে, সেই পুষ্টিতেই তার অবসান।
এ তো তুমি বোঝো, তাই ভালোবাসা প্রবল তোমার,
অচিরে হারাবে যাকে তাও তাকে প্রেমের সৎকার॥

(৯) যে-তনু আমার মাঝে দেখো তুমি, তার মাঝ শীত,
শীত পত্র কতিপয় কাঁপে যবে হিমাহত শাখে,
যখন বিগত সুরে থেমে যায় বিহঙ্গসংগীত,
মৃত্তিপরিগ্রহ ক'রে সর্বনাশ মুহুর্মুহু হাঁকে।

সূর্য অস্তাচলে গেলে, যে-বিষাদ অনুক্ষণ আভাস,
রাঙায়ে পশ্চিমে দেখে অচিরাৎ নিবিড় আঁধারে,
সে-বিষাদে সমাকীর্ণ দেখো আজ মোর চিত্তাকাশ ;
হরষের সহোদর বিদায় জাগে সুষুপ্তির ধারে।
আমার হৃদয়ভূতে দেখো যেই বহ্নি চিরম্লান,
সে শুধু চিতাবশেষ, নৈশোত্তের ভস্মাক্ত উৎসাহ ;
একদা যে-রবি তারে ঘিরেছিল অনির্বাণ প্রাণ,
তারই অস্তিমেষে বুঝি অনিবার্য আজ অবসাদ।
এ-দুর্দশা দেখে, কিন্তু কত বাড়ে তোমার প্রণয় ;
মানুষ তাহারেই চায়, যারে শীঘ্র ছেড়ে দিতে হয়।

এই তিনটির উদ্ধৃতির মধ্যে (ক)-এর পরিচয় অনাবশ্যক ; (খ) ও (গ)-এর লেখক যথাক্রমে বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। মূলের সঙ্গে অনুবাদের, এবং দুই অনুবাদের পারস্পরিক তুলনা করলে এই দুরূহ কাজের প্রক্রিয়া বোঝার সুবিধে হ'তে পারে—তোমার তার বিষয়, তত্ত্ব তথ্য সমস্যা, এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে মূলের প্রতি নিষ্ঠার সম্ভাবনাই বা কতটুকু। প্রথম পংক্তি সুধীন্দ্রনাথে প্রতিফলিত, কিন্তু 'পীত' কথাটা ঘুলে নেই : 'পল্লব পীত'-এ বিশেষণের অপ্রগামিতা সুখের হয়নি, কিন্তু 'দুয়েকটি কোলে কি না কোলে'তে মূলের অস্থির ভাবটাকে পাওয়া যায়। তৃতীয় পংক্তিতে 'shake' ক্রিয়াপদ ইংরেজিতে যে-কোলা দেয়, সেটা বাংলা ভাষার স্বভাব-দোষেই বাদ পড়লো ; 'choirs' অর্থে 'কীর্তন' লোভনীয়, কিন্তু 'bare' আর 'ruin'd' এই দুটি বিশেষণের মধ্যে উভয় অনুবাদকই একটিকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। 'Where late the sweet birds sang'—'late' কথাটির বিশেষ ইঙ্গিত বাংলায় চালিয়ে দেয়া সম্ভব হ'লো না, অথচ এই অংশে উভয় অনুবাদই কিঞ্চিৎ ঠেকে উঠেছে ; 'বিবিক্ত কঙ্কাল' বা 'মৃত্তিপরিগ্রহ ক'রে সর্বনাশ মুহুর্মুহু হাঁকে'—এই দুটোই মহুন আবদানি, কিন্তু বাংলায় নিজস্বরূপে আদরণীয়। 'পশ্চিমসাগরে', 'বিষাদ অনুক্ষণ আভাস'—এ-সবও অনুবাদকের স্বরচিত ; 'আদরে' কথাটা মিল ফুটিয়ে দিলেও মূলের প্রসঙ্গে

অর্থগৌরব বাড়ানি ; 'whereon it must expire' একটিমাত্র 'নিয়মাণ' শব্দে সংহত হ'লেও 'must'-এর জোরটাকে পাওয়া যেলো না। বাকশ পংক্তি সুধীন্দ্রনাথে দুই পংক্তিতে পরিণত হয়েছে (অবশ্য মোট পংক্তিসংখ্যা সমান রেখে)—এটা আইনত দোষ ব'লে গণ্য হ'তে পারে, কিন্তু 'জীবনে যা আসে, সেই পুষ্টিতেই তার অবসান', এই মূলধর্মী বাক্যের তুলনায় পংক্তিযুগলের অর্থও নির্ধন, ধ্বনিও শ্রীহীন। 'Seals up all the rest'—এই ক্রিয়াপদ বাংলায় নেই দেখে, সুধীন্দ্রনাথ 'মুদ্রিত' ব্যবহার ক'রে ভালো করেছেন, শেষ দুটি পংক্তির মধ্যখণ্ডও মূলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

বলা বাহুল্য, এই বিশ্লেষণের দ্বারা অনুবাদ দুটির মর্যাদা আমি কমাতে চাচ্ছি না ; অনুবাদের মধ্যে বাড়ানো, কমানো এবং পরিবর্তন কেমন ক'রে অনিবার্য হ'য়ে ওঠে, সেটুকুই দেখিয়ে দেয়া আমার উদ্দেশ্য। কোনো পাঠক যদি এ-কথা মানতে না চান, আমি তাঁকে আমন্ত্রণ করবো ঐ দুই সনেটের অনুবাদের চেষ্টা করতে ; তাহ'লে তিনি অচিরেই উপলব্ধি করবেন এই কাজে একসঙ্গে কত দিক সামলে চলতে হয়, এবং রচনার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য এবং মূলের সমাচার পাবার পরেও ছোটো-ছোটো বিষয় নিয়ে আপত্তি করাটা কত অযৌক্তিক। উপরন্তু, বর্তমান লেখকের বিশ্বাস, শেক্সপীরিয় সনেটের অনুবাদের পক্ষে আমাদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কেউ নেই, 'প্রতিধ্বনি'র অন্তর্গত চৌদ্দটি সনেটের প্রত্যেকটি শেক্সপীরির দাবি তরপুর, এবং কোনো-কোনো স্থানে মূলানুসরণেও নির্দোষ। এই নিষ্ঠাগত নৈপুণ্য অবশ্য সবসময় প্রথম পাঠে ধরা পড়ে না—কেননা সুধীন্দ্রনাথের বাক্যগঠন সংস্কৃত-ঘেঁষা, আমাদের বাংলা অভ্যাসবশত সেখানে হোঁচট খেতে হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই আবিষ্কারের আনন্দ পাওয়া যায়।

> Lo thus by day my limbs, by night my mind,
> For thee, and for myself, no quiet find.
>
> দিবা কাটে কায়ক্লেশে, যামিনী বিফল যন্ত্রণায় তাই,
> ততদিন শান্তি নাই, যতদিন তোমারে না পাই ॥

'কাইরেশ' আর 'ধনঞ্জয়ে'র মধ্যেই যে 'limbs' আর 'mind' বিকৃত আছে, সেটা বুঝে নিতে একটু দেরি হ'তে পারে—কিন্তু সেইজন্যই মূলটার অভিঘাতও প্রবল হয়।

> And other strains of woe, which now seem woe,
> Compar'd with loss of thee will not seem so.
>
> তোমার বিয়োগ, জানি, আমাদের যে-অসহ্য নির্বেদ,
> যেন ব'লে গণ্য নয় তার পাশে উপস্থিত খেদ।
>
> So shalt thou feed on Death, that feeds on men,
> And Death once dead, there's no more dying then.
>
> মর্ত্যভক্ষী মৃত্যু তোর উপজীব্য হবে তাহলেই ;
> এবং মৃত্যুর মৃত্যু যে ঘটাবে, তার মৃত্যু নেই ॥

শেক্সপীয়রীয় ককণ্যরসের আস্বাদটুকুও বাংলায় পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে।

৪

কিন্তু আমি সুধীন্দ্রনাথকে সাধুবাদ দিতে চাই, মূলের অনুসরণে তাঁর কৃতিত্বের জন্য নয়, বাংলা ভাষায় একটি হৃদয়গ্রাহী কবিতাগুচ্ছ সংযোজন করেছেন ব'লেই। এ-কথা, শুধু, শেক্সপীয়রের সনেট নয়, সমগ্র 'প্রতিধ্বনি' বিষয়েই প্রযোজ্য। সনেটের শেক্সপীয়রের পরেই সর্বাধিক অনুবাদ আছে হাইনরিখ হাইনে থেকে ; এই জর্মান কবি, যিনি হেগেল আর ব্যঙ্গ, হাস্য আর হার্দ্য তত্ত্বের সমন্বয়ে 'ফণিকা'র কবির সমধর্মী, কিন্তু 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রুসী'র কবির সঙ্গে যাঁর দূরত্বের ব্যবধান, তাঁকে অনুবাদ করতে গিয়ে—বলতে খুব ভালো লাগছে—সুধীন্দ্রনাথের নতুন দু-একটী গুণপনা প্রকাশ পেয়েছে ; হাইনের হালকা চালের অনুকরণের প্রয়াসে তিনি বাংলা পদ্যের হালকা চালটা আরও ক'রে নিয়েছেন—যা আগে করেননি ; 'মহাকাব্য', 'স্মৃতিবিধ',

কিংবা অপ্রত্যাশিত ধরনের লেখা 'পরিবাদ' ('সাচ্চা কিছুই নেই জগতে ; দুই সবই দোষে'), অনুবাদ হ'লেও, বাংলা ভাষার হালকা কবিতার মনোহর দৃষ্টান্ত। আরো বেশি বাংলা এই কারণে যে এখানে বৈদেশিক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা নেই : 'বেদবেদান্ত', 'বৃন্দাবন' 'শকুন্তলা', 'তানসেন' প্রভৃতি উল্লেখের ফলে হাইনে যেন সুযোপুরি ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গত হ'য়ে গেছেন। এই রকম পরিবর্তনে আমার মনে মৌলিক আপত্তি জাগে—আমি জর্মানিতে গিয়ে রাইনওয়াইনই পান করতে চাই—যদিও এ-বিষয়ে আমি সচেতন যে হাইনের বিরুদ্ধ উদাহরণগুলো ব্যবহার করলে বাঙালি পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ্য হবার আশঙ্কা ছিলো। অনুবাদের যাদের জন্যই এটা হোক না যে লাইলাক ফুলটা লাইলাকই থাকবে, এবং আরব পর্যন্ত বিস্তারে প্রসারিত হবে না ; তবু, 'পরিবাদে'র মতো যেখানে একটি বাংলা কবিতা হাতে এলে তখনকার মতো এই আপত্তি প্রত্যাহার করতেও আমি রাজি।

মালার্মে আর ভালেরির অনুবাদের সুধীন্দ্রনাথ শুধু সাহসের পরিচয় দেননি ; প্রমাণ করেছেন যে বাংলা ছন্দের উপর, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার উপর এবং সাধারণভাবে কাব্যকলার উপর তাঁর অধিকার—আমরা তাঁর আগে পাঠকরাও এতদিন ধ'রে যা জেনেছি, তার চেয়েও দৃঢ় ও ব্যাপক। যদিও অত্যধিক সংস্কৃত শব্দের জন্য মালার্মের সনেটের কোথাও-কোথাও ওজন নেমে গেছে, তবু 'ফনের দিবাস্বপ্ন' আর ভালেরির 'আদিনাগ', এই দুটি বিখ্যাত, দীর্ঘ, জটিল ও দুরূহ কবিতার অনুবাদ বাংলা ভাষার কত বড়ো কীর্তি যা কবিতা দুটির বহিরঙ্গের বর্ণনা দিলেই পাঠক বুঝতে পারবেন। 'ফনের দিবাস্বপ্ন' সপ্তাধিক পংক্তির সমলম্বিক পদান্ত মিলের কবিতা ; আর 'আদিনাগে' স্তবকের সংখ্যা একত্রিশ, তার প্রত্যেকটিতে পংক্তির সংখ্যা দশ, পংক্তিগুলো ছোটো এবং সমান মাপের, আর মিলের জটিল ব্যবস্থা (ক্রসকবগপদয়ন্ত) প্রত্যেক স্তবকে অনিবার্যভাবে একই রকম। তাছাড়া এই সমস্ত লক্ষণ বজায় রেখে চলা প্রথম দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হ'তে পারে—কোনো-কোনো ইংরেজি অনুবাদক সে-রকম কোনো চেষ্টাই করেননি—কিন্তু

সুধীন্দ্রনাথের হাতে তা সম্ভব হয়েছে তাঁর বিরাট শব্দসম্ভার এবং কাব্যরচনায় বহুকালের পরীক্ষিত দক্ষতার ফলে। কিন্তু পরবর্তী কবির পক্ষেও এই অনুবাদ দুটি সন্ধানযোগ্য : 'মনের দিবাস্বপ্ন' আঠারো মাত্রার পয়ার ছন্দে এবং বিচিত্র যতিপাতে পদে-পদে মিল দিয়ে প্রবহমান, সংস্কৃত শব্দের ঝাঁকে-ঝাঁকে চলতি বাংলার ক্রিয়াপদ-প্রয়োগে উজ্জ্বল। (শেক্সপীরীয় সনেটে তিনি 'সবে', 'বেহারি' প্রভৃতি পুরোনো ভাষা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বাক্যবন্ধে আধুনিক ভাষার আস্বাদ পাওয়া যায়।) আর 'আদিবাসে'র ৩১০ পঙ্‌ক্তি জুড়ে ব্যবহৃত হয়েছে দশ মাত্রার পয়ার—যা, আমরা জানি, ছোটো শিশিরের পক্ষেই উপযোগী : একটু ঢিলে হয়নি কোথাও, একটি মিল বাদ পড়েনি বা তার ব্যবস্থা বদলানো হয়নি, যা মিলের ঝংকারে অপপ্রয়োগও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কলাকৌশলের ছবিতে, এই দশ-না-ফুরোনো নির্বাক অনুবাদ দুটি সুধীন্দ্রনাথের আর বাংলা ভাষার দুটি শ্রেষ্ঠ রচনা ব'লে গণ্য ; আর কয়াদি কবিদ্বয়ের বিষয়ে তাঁর চেয়েও অনুরাগী আর তীক্ষ্ণ সমালোচকের বক্তব্য যদি ভুল না হয়, তাহ'লে সাহস ক'রে নিশ্চয়ই বলা যায় যে 'মনের দিবাস্বপ্ন' বা 'আদিবাস' অন্তত মূল রচনার চাইতে একটুও বেশি দুর্বোধ্য নয়।

৫

বাংলা ভাষায় লেখা কবিতার নমুনা হিশেবে 'মনের দিবাস্বপ্নে'র সঙ্গে তুলনীয় সুধীন্দ্রনাথের 'সংবর্ত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'যযাতি', যার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে, রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন মাত্রা'র সঙ্গে ব্যাবোর 'মাতাল তরণী'র অনন্য অন্বয়সাধন ক'রে, তিনি অনুবাদ, হরণ, ও মৌলিক সৃষ্টিকে একাকার ক'রে দিয়েছেন। এই দীর্ঘ কবিতাটি, তার আঠারো মাত্রার জটিল, বহুর বিন্যাসে, যতিপাতের বৈচিত্র্যে, লুকোনো এবং দেখানো মিলের বিন্যাসে বাংলা কাব্যে কলাসিদ্ধির একটি প্রোজ্জ্বল উদাহরণ, ঠিক যার পাশে, 'মনের দিবাস্বপ্ন' ছাড়া আর কোনো কবিতাকেই আমরা বসাতে পারি না।

কিন্তু এখানে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে এই : 'যযাতি' কবিতায় আঠারো মাত্রার যথার্থ ইচ্ছা পেয়েছে কিনা, না কি এটি আসলে অমিত্রাক্ষর পয়ারে লেখা, শুধু চাক্ষুষ স্তবির ভাগিয়ে সমমাত্রিক রূপে সাজানো। দৃষ্টান্তস্বরূপ এর প্রথম কয়েক পংক্তি—

> উত্তীর্ণ পঞ্চাশ : যযাতির প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে
> অন্তঃস্থ অগ্নিবারণীর ; এবং বিজ্ঞানবলে
> পশ্চিম পণ্ডিত আয়ুর সাধ্যের সীমানা বাড়িয়েছে
> ইদানীং, শুধু সেখানেই মৃত্যুহত যৌবনের
> প্রভু, বার্ধক্যের আস্তাপচারক। আক্রান্ত তারও…

অবায়াসে বদল ক'রে এই ভাবে সাজানো যায়—

> উত্তীর্ণ পঞ্চাশ :
> যযাতির
> প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে অন্তঃস্থ অগ্নিবারণীর ;
> এবং বিজ্ঞানবলে পশ্চিম পণ্ডিত
> আয়ুর সাধ্যের সীমা বাড়িয়েছে ইদানীং, শুধু
> সেখানেই মৃত্যুহত যৌবনের প্রভু,
> বার্ধক্যের আস্তাপচারক।
> আক্রান্ত তারও…

শুধু বদল করা যায় তা-ই নয়, পড়বার সময়ে মনে-মনে তা করতেই হয় আমাদের, বদল করে না-নিয়ে পড়া যায় না, দৃষ্টিদোষের পংক্তিবিন্যাসের সঙ্গে তান সায় দেয় না কিছুতেই : যেমন লেখা আছে, তেমনি ক'রে পাঠ করতে গেলে বাংলা ছন্দের ধ্বনির শাসনে যযাতির জড়ত্বপ্রাপ্তি ঘটতে দেরি হয় না। উদাহরণত—'পশ্চিম যদিও আয়ুর সাধ্যের সীমা বাড়িয়েছে'—এই পংক্তিটিকে টানা পয়ারের ঢঙে পড়া অসম্ভব, চাক্ষুষ পংক্তিবিন্যাস না-থাকলেও 'যদিও'র পরে থামতেই হবে। আসলে এই রচনায় -দৃষ্টান্তস্বরূপ পাঠকের কাছে একটা প্রকল্পনগত হৈয়ালি উপস্থিত করেছেন ; চেয়েছেন যেখানে টানা আঠারো মাত্রার, কিন্তু ছক দিয়েছেন 'কলাকা'র অথবা 'ক্রমদী'র আকারে—

পাঠককে গাঁটে-গাঁটে তাল ঠুকে নিয়ে পড়তে হবে। ছন্দের আভ্যন্তরিক এবং আন্তরিক ধ্বনির সঙ্গে তাল রাখার জন্যই 'বলাকা'র পংক্তিগুলিকে আদম হ'তে হয়েছিলো, দেখার সঙ্গে শোনা সেখানে মিলে গেছে—প্রত্যেক পংক্তির পরে (সে-পংক্তি যতটা ছোটো হোক), অর্থের জন্য না-হ'লেও ধ্বনির জন্য পাঠককে একটু থামতে হয়। 'হাট। যাত্রিকারে আমি প'ড়ে আছি, তাবলুক সে এখানে নাই'—এখানে 'হাট' একটা আলাদা পংক্তি না হ'লে বিষম বিভ্রমের সৃষ্টি হয়। এই চাক্ষুষ সুবিধাটাকে রবীন্দ্রনাথ উড়িয়ে দিয়েছেন; ফলত, 'বলাকা' বা 'ক্ষণিকা'র সঙ্গে আটলান্টিক আন্তে-গোন্তে মিলনেও 'বলাকা'র ছন্দে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চরিত্র দেখা দিয়েছে। আঠারো মাত্রার কোমর ভেঙে দিয়ে তিনি তাকে সুন্দরী সাপিনীর মতো বহুল গতিপাকে এঁকে-বেঁকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন এবং এই প্রচণ্ড পরীক্ষার ফলে যে-বস্তুটি জন্ম নিয়েছে তাকে বলতেই হয়, বাংলাদেশে অমিত্রাক্ষরের আধুনিক প্রকরণ, কিম্বা আধুনিক কবিতা হাতে তার পরিণতি।

অবশ্য আমার
পক্ষে সংগত যে নয় অনুতাপ, সে কথা স্বীকার
করি; তারপর যদিচ বয়স শৈলে আমার মাতাল
নৌকা বানচাল হয়ে, বর্তমানে বিলিটি কলাল—

ভেলা
আমি ভাসিয়েছিলুম একদা তাদেরই মতো, আজ
এইটুকুই আমার পরম পরিচয়।...

পড়বার সময় হ'য়ে ওঠে—

অবশ্য আমার পক্ষে
সংগত যে নয় অনুতাপ
সে-কথা স্বীকার করি:
তারপর যদিচ বয়স শৈলে

আষাঢ় ১৩৬২

আমার আকাশ নৌকা বানচাল হয়ে,
বর্ডমানে বিলিটি ভক্তাল—

কেন।
আমি ভালিয়েছিলুম
একলা তাদেরই মতো,
আজ এইটুকুই
আমার সরল পরিচয়।

—কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগ এবং অবধান সত্ত্বেও 'আমি ভালিয়েছিলুম'-এ এসে সন্দেহ জাগে যে 'প্রতিপক্ষ' এই খেলায় নিয়ম লঙ্ঘন করলেন। এই রকম কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মনে হয় বাংলা ছন্দের মজ্জাগত মৌল বিশ্বাসের উপর বড্ড বেশি জবরদস্তি চ'লে গেছে। এই ছন্দ, যাতে মাইকেলের কল্লোল শোনা যায়, আর মাঝে-মাঝে গিরিশচন্দ্রের উদাত্ত নাটকীয় উচ্চারণ, এবং যা সুধীন্দ্র দত্তীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত—'মনের দিবাস্বপ্ন' এই ছন্দেই রচিত। এ-সব রচনা বার-বার পাঠ করার পর মাইকেল বিষয়ে আমার একটি পুরোনো এবং কুখ্যাত উক্তি প্রায় প্রত্যাহরণ করতে লুব্ধ হচ্ছি : বলেছিলুম মাইকেল 'নির্বীজ', কিন্তু এই পূর্বসূরীর সঙ্গে—এমনকি মিল্টনের সঙ্গে—সুধীন্দ্রনাথের আত্মীয়তা ক্রমশই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে ; আর যদিও 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'ও 'সমর্পণ' কবিতার হার্দ্য আবেদন সুদূরপরাহত, তবু সুধীন্দ্রনাথ অন্তত একটু প্রমাণ করেছেন যে মাইকেলের কাছে বাঙালি কবির এখনো কিছু শেখবার আছে। এও একটি কারণ, যার জন্য আমাদের অত্যন্ত লাগে যখন তাঁর মুখে শুনি যে 'বাল্মীকি-প্রবর্তিত কাব্যদর্শনই তাঁর অভিষ্ট।'

এ থেকেই বোঝা যাবে সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদ বিষয়ে সবচেয়ে বড়ো আপত্তি কোন দিক থেকে উঠতে পারে। তাঁর হাতে—কেউ-কেউ ইতিমধ্যেই বলেছেন—বিভিন্ন কবি নির্বিশেষ ছন্দ ধারণ করেন, সব কবিতা একান্তরূপে তাঁরই রচনা ব'লে মনে হয়, মূল কবিদের স্বতন্ত্র রূপ প্রকাশ পায় না। এ-বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে অনুবাদক নিজে কবি হ'লে তাঁর রীতিবৈশিষ্ট্য

একেবারে এড়ানো অসম্ভব, তবু মূল কবিতার চরিত্রলক্ষণ, এবং তাঁদের দেশকালগত আস্বাদের জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে বৈধ, এবং অনুবাদকের পক্ষে স্বীকার্য। এবং এই আকাঙ্ক্ষা যে সুধীন্দ্রনাথ সর্বত্র পূর্ণ রাখেননি, তাঁর শেক্সপীয়র আর চাটুয়ে-অনুবাদেই তার প্রমাণ মিলবে। কিন্তু 'প্রতিধ্বনি'র একটি রচনা, তাঁর দুর্বার মৌলিকতার জন্যে, ক'রে উঠেছে মূলের অনুবাদের বদলে প্রতিবাদ : সেটি ডি. এইচ. লরেন্সের 'On the Balcony', যার নতুন নামকরণ হয়েছে 'কালস্রোত'। এই নামকরণ প্রমাদ-প্রসূত, কেননা 'The Ship of Death' কবিতাটিকে লরেন্সের কোনো পাঠকই সহজে ভুলবেন না, আর নাম দেখে সেই কবিতার আশা ক'রে কেউ-কেউ ধাঁধায় পড়বেন। এবং, এই একটি অনুবাদে, সুধীন্দ্রনাথের চরিত্রলক্ষণ মূল কবিকে একেবারেই আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে ; ছাপার অক্ষরের সাক্ষ্য সত্ত্বেও বিশ্বাস করা শক্ত যে 'কালস্রোত'র সঙ্গে ডি. এইচ. লরেন্সের কোনোরকম সম্বন্ধ আছে। লরেন্স তাঁর ভাবে ঠিক তা-ই ছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ চন্ত না নন—দুজন (তা-লো-মন্দ দুই অর্থেই), বেগবান, উল্লাসপ্রবণ, মৌখিক ভঙ্গিতে আসক্ত। এই রকম কবিতাকে মিল্টন-মধুসূদন-সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরাবার ফলে যে-অঘটনটি ঘটেছে, তার উল্টো উদাহরণ একদা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন অবশ্যই 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' লেখার চেষ্টা ক'রে। কিন্তু হয় না, অবশ্যই যেমন অভিজ্ঞাকর সম্ভব নয়, তেমনি সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের চাপেও লরেন্স বধ আটকে যাবেন।

In front of the sombre mountains, a faint,
lost ribbon of rainbow ;
And between us and it, the thunder ;
And down below in the green wheat, the labourers
Stand like dark stumps, still in the green wheat.

গম্ভীর গিরির আগে ক্ষীণ ইন্দ্রধনুর চিহ্নলেখা—
এ-পারে ভূমি ও আমি—চারধার ঘনঘোরিগ্রহত
অবরোধী পাষণ্ডেশে ছন্নছাড়া শ্রমিকের দল,
অসিত স্থাণুর মতো, বদ্ধমূল সবুজ গোধূমে।

'গিরি', 'তাল', 'তিলক', 'প্রদোষপ্রহত', 'অবরোহী', 'অদিত', 'স্থাণু'—প্রায় প্রত্যেকটা কথাই যথাসম্ভব অ-লক্ষ্যবেধীয় ; এবং আঠারো মাত্রার তাবি পয়ারের সঙ্গেও ঘুলের সজাতীয় মুক্তছন্দের কিছুই মেলে না।

The thunder roars. But still we have each other !
The naked lightnings in the heaven dither
And disappear—what have we but each other ?
The boat has gone.

এই উচ্চণ্ড দুর্যোগে, আমার সম্মুখে তুমি, আমি
আছি তোমার পাশেই—নিশ্চয় বিদ্যুতের জ্বালা
নিঃশেষে পুনরায় চমকিত সূক্ষ্মের জগতে—
অস্তিসাক্ষী আমাদের দৃষ্টিবিনিময়—চরাচরে
অন্য কেউ আর যা সমস্ত কিছু : ঘর ভাঙলেও

ঘুল রচনা হয়তো ক'রে উঠেছে 'we have each other'-এর ঈষৎ বক্রাভাস পুনরুক্তিতে, 'dither'-এর মতো কথা ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, শেষ, ছোটো পংক্তির দীর্ঘশ্বাসের মতো মিলিয়ে যাওয়ায়, এবং সব মিলিয়ে তাদার সরল স্বাচ্ছন্দ্যে। অনুবাদে এই লক্ষণগুলোর অতিসূক্ষ্ম কিছুই ধরতে পারেননি—এমনকি, যদিও শেক্সপীয়র, মার্লার্মে ও ভালেরির অনেক বেশি প্রমথনাপেক্ষ মিল নিয়ে তিনি প্রভূত ঘরের প্রমাণ দিয়েছেন—এই কবিতার দুটি মাত্র মিল (limber-limber, whither-dither), যা বাংলায় দুটো ঘর নিয়েও দুস্প্রাপ্য হ'তো না, তাও সুধীন্দ্রনাথ যেন ইচ্ছাকৃতই ব্যবহার করলেন না। আমরা ধ'রে নিতে পারি এই কবিতা তাঁর যোগ্য মনে হয়েছে ব'লেই তিনি অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন ; কিন্তু যদি যোগ্যই মনে হবে তাহ'লে এই উপেক্ষা কেন। হাইনের অনুবাদে তিনি দেখিয়েছেন, তিনি প্রাকৃত বাংলার ব্যবহারও জানেন , ঠিক সেই ভাষারই প্রয়োজন ছিলো এখানে—ribbon অর্থে ফিতে ; thunder, বাজ বা বজ্র ; stump, খুঁটি ; the boat has gone, নৌকো

চ'লে গেলো। তিনটিতে চলতি বাংলা, গদ্যছন্দের সঙ্গে যুক্ত হ'লে, লরেন্সের স্বভাবের পক্ষে অনুকূল হ'য়ে ওঠে; অন্যান্য বাঙালি কবিরা গদ্যছন্দেই তাঁর অনুবাদ করেছেন, এবং সদ্যপ্রকাশিত 'মিশু দের শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় এই কবিতাটিই 'ব্যাবান্ধার' নামক যে-অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে, তার গদ্য ছন্দে মূলের প্রত্যেক ঢেউ সুখ পাওয়া না-গেলেও লরেন্সকে নিষ্কলঙ্কভাবে চেনা যায়। সুধীন্দ্রনাথ, যতদূর জানি, গদ্যছন্দে বিশ্বাসী নন; চীনের দু-একটি অনুবাদে ছাড়া, ঠিক মৌখিক ভঙ্গিতেও গদ্য লেখেননি কখনো; তাই, ছন্দ-শিল্পী হিশেবে তাঁর আকর্ষণ সম্ভব হ'লেও, লরেন্সের প্রতি অনীহাই মনে হয় স্বাভাবিক। অবশ্য 'প্রতিধ্বনি'তে লরেন্সের কবিতা একটিমাত্রই আছে, এবং যত ভালো জিনিশ পাবার পর একটি ব্যতিক্রম নিয়ে অত্যন্ত বেশি খুঁতখুঁত করাকেও নিষ্ঠাচার বলে না: তবু, অন্যান্য ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ প্রজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন ব'লে, এবং লরেন্সের প্রতি আমার দুর্বলতা দুর্বার ব'লে, এই মন্তব্য অপ্রত্যাশিত হ'য়ে উঠলো। প্রসঙ্গত, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের একটা সাধারণ লক্ষণও এখানে উল্লেখ করতে চাই; সেটা তাঁর সংস্কৃতের প্রতি আসক্তি, যার ফলে তাঁর রচনা হয়তো এবং সংস্কৃতিপূর্ণ ঈর্ষাযোগ্য, শব্দার্থের যাথার্থ্যে লক্ষ্যভেদী, কিন্তু কখনো-কখনো স্বাচ্ছন্দ্য-রহিত এবং পাঠকের পক্ষে দুরধিগম্য। যেমন একদিকে শৈথিল্য তাঁর কিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না, তেমনি মাঝে-মাঝে (যেমন 'সংবর্তে'র 'আতঙ্ক (২)' সনেটে) ক্রিয়াপদের বিরলতায় ও অতিথন বাক্যবন্ধের ফলে গঠনটিকে প্রায় বাংলা ব'লেই আর মনে হয় না—সংস্কৃতের মতোই বিশ্লেষণ ক'রে-ক'রে ধীরে-ধীরে প'ড়ে উঠতে হয়। অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যেও এই গঠনটি ব্যতিক্রম, কিন্তু তাঁর আরো স্বভাবী গঠনেতেও এখন নতুনো কথাই পাওয়া যায়, যেখানে, অন্তত আমার মতো স্বল্পশিক্ষিত পাঠককে দু-একবার বড়ো অভিধান ঘাঁটতে না হয়। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই পরিচ্ছন্নতার পুরস্কার মেলে হাতে-হাতে, যখন দেখা যায় শব্দের অর্থটি কাব্যের প্রয়োজনের সঙ্গে আক্ষরিকভাবে মিলে গেছে;—কিন্তু এই রকম বুদ্ধির সুখই

এক কথা, আর হৃদয়ের উপর কবিতার অভিঘাতই অন্য। আর সেই অভিঘাতের সবচেয়ে দৃষ্টান্ত সুধীন্দ্রনাথ যেখানেই দিয়েছেন, সেখানেই, যেন এক দৈব মুহূর্তে, হঠাৎ রচনা থেকে সংস্কৃতের ভার ক'মে গেছে, যেন উচ্চারণের সরল বাংলায় অব্যবহিত, উত্তপ্ত উচ্চারণ।

চাই, চাই, আজও চাই তোমারে কেবলি।

সে তোলে তুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি তুলিব না, আমি কভু তুলিব না।

…সে এখনো বেঁচে আছে কিনা
তা শুধু জানি না।

উপরন্তু লক্ষ্যণীয় যে 'সংবর্ত' নামক কবিতাটিতে অচলিত সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, বাক্যের ক্রিয়াপদবহুল এবং অনেক স্থলেই বাংলা মৌখিক রীতির অনুগামী। এবং সেই কবিতা তার মৃদু আরম্ভ থেকে হাতুড়ির ঘাড়ির মতো শেষ পংক্তি পর্যন্ত অব্যর্থ, সুসংবদ্ধ, একমুখী, বহুল জটিলতার মধ্যে উদ্দেশ্যময়। এই রকম সিদ্ধি যে-কোনো ভাষার সাহিত্যের মধ্যেই দুর্লভ। আমরা কি ফল করবো, যদি 'সংবর্ত' কবিতার সিদ্ধির সঙ্গে তার ভাষার অজস্র কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্থাপন করি? অন্তত এটা স্পষ্ট যে ভাষাকে সহজ ক'রে তোলার জন্য কবি এখানে সচেতনভাবে প্রয়াসী ছিলেন; এবং এই পথেই কতদূর তিনি অগ্রসর হবেন কিনা, বাংলা ভাষার কবিতার পক্ষে এটি একটি জরুরি প্রশ্ন। কবিতার ভাষা ও রীতির যে-সব সমস্যা থেকে কোনো লেখকেরই আজ নিস্তার নেই, তার সমাধানের এক অংশ সুধীন্দ্রনাথের পরবর্তী ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করছে।

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৪

দুটি কবিতা

অরবিন্দ ভঞ্জ

মূল্য

বৎসরান্তে সবাই ছিলো
হা-ও তো উড়ালি খেলায়,
নিজেকে নিয়েই তাসলি নিজের ভেলায় :
সে-ভেলা সইতে পারলো না তোর দুঃখের ভার,
দিদি-পাচারায় সে-রাতে ছিলো যে-চৌকিদার,
সে-ও পারলো না, বাকি চাইলো না উঠিয়ে আনতে
তোকে অন্ধ খেকে ডাঙার প্রান্তে।

ঘটনা হিসেবে আত্মহত্যা অতীব তুচ্ছ।
পরলোক ব'লে যদি কিছু থাকে
তুই যা চাহালি পাবি না তো তাকে—
আর কার, বল, তোর দুঃখের মূল্য দুঃখ।

সে-দুঃখ কেউ মনে রাখলো না, সবাই ভুললো ;
যুক্তি-বিচার-বিবেচনাহীন
লোকে বলে তোকে শুনি নির্নিমিখ—
কিন্তু কী ক'রে ফুটি তোর ভালোবাসার মূল্য।

আলেখ্য

তুমিই আমাকে বড় করেছো,
বারবার আমি ভেঙেছি বড়;
পূর্ণ করেছি আমার হৃদয়,
ভুলেছি ছুটিন মরুর দৈন্য।
নিছে ফেলে সব দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব
আগে তো বুঝিনি কোথায় ছন্দ
কেন হারানো ঘরে আনে আনন্দ,
কেন ভালোবাসা অপ্রণয়।

আমাকে পূর্ণ কে করেছে? তুমি।
তুমিই আমার নারীরূপ দুঃখ।
সম্ভাবনার পথে পা গেলো না,
সমস্ত পথ সমান রুক্ষ।
পরিবর্তনহীন বারো মাস,
সমুদ্র ছুঁয়ে রয়েছে আকাশ,
সে-বিশালতার মতো আয়াস—
তুমি তেমনিই কঠিন শূন্য।

তিনটি কবিতা

রণেন্দ্রনাথ দেব

আষাঢ়

যখনি চেয়েছি আমি প্রভাত আলোকে
তিনি সকালের মেঘতায়,
যখনি অশোকগুচ্ছে লেগেছে বালক
ছেয়েছে নদীর ধারা পাড়,
আকাশে ঝরের নৃত্য ছুঁড়েছে আষাঢ় ॥

অন্তরিক্ষ

সোনালি চায়ের কাপে, ঝিলম আলাপে আর মুহুর্মুহু গানে
আসর জমাই, উষ্ণ পুষ্পদাহ, সঙ্গে কিছু কবিতা-ব্যাখ্যানে
মুখস্থর অন্তরিক্ষ, সাক্ষ্য তার টেবিল-ধোকাই-করা দানে।

আয়নার ভ্রান্তি বাসে, কালপুরুষের দৃষ্টি আসে জানালাতে,
বাসি গন্ধ অন্ধকারে চাই ছেড়ে শয্যা পাতে মরুভূম্য রাতে
তন্দ্রী নয়, লোলচর্ম বৃদ্ধা কোথো, শিরা-আঁকা ঠাণ্ডা সাদা হাতে ॥

চেনা পথ

চিরস্থির রেখাচিত্র। পরিচিত ভিড়
ঘাস, গাছ, ফুল আর শালিক পাখির।
প্রান্তিকের উচ্চারণ। দিগন্তের ঘোড়ে
তির্যক সূর্যের দুখ যেই নেমে পড়ে,

কবিতা।

আষাঢ় ১৩৬২

অবনি আকাশে জ্বলে গ্রহ-নীলাবলি
সত কালকের মতো। এ সহস্রতলি
পুরোনো লোহার পদ্ম। কেঁপে ওঠে শ্বাসে
কিসে-কিসে আঁকে শুধু পাখি-ফুল-ঘাসে।
আজ তোরো ছুটি নেই? কতকাল আর
বানাবে সে একটানা ঝিঁঝির সেতার?

সহজ কবিতা

ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য

আবিষ্কারের ঘোর যেন তোমায় আমায় পেয়ে বসেছে।
কিছু একটা উদ্ভাবন
কিছু একটা নতুন অভিজ্ঞতা
অন্তত কোনো একটা কিছু—
অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য কিছু নতুন,
যা নিয়ে উইয়েকা ক'লে
দুরন্ত যৌবনের আবেগ ভরা এই অতীত মুহূর্তটিকে
ইচ্ছা উজান আরম্ভে বিহ্বল ক'রে তুলতে পারি।

ধরো, মকরীমাংসে কাঁটাকোপের মধ্য দিয়ে
দুটো মানুষ আমাদের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রয়েছে।
জলন্ত রোদের মধ্যে হঠাৎ যেন চোখ জুড়িয়ে গেল।
এটা কি কিছু কম একটা পাওয়া?

ধরো, দূরে নদীর বাঁকে দেখা গেলো
পদ্মদিঘলদের নৌকোয় ভাড়া একটা মাদল।
সে কি বড়ো কম দেখা?

ধরো, পার্বত্য পথের ধারে এক টুকরো ভাঙা পাথর।
সে কি কিছু কম পুরাতত্ত্বের সন্ধান?

এই যে আমরা এগিয়ে চলেছি—
গ্রামের শেষে আটচালার পাশের বাঁক পেরিয়ে
এই যে এসেছি এই আপাহার অঞ্চলে

কবিতা

আষাঢ় ১৩৬২

এর মধ্যে এই যে একটা চেনা-চেনা ফুলের গন্ধ ভেসে আসে,
এটা কি কিছু নয় সম্ভাবনা ?

বিদিশির অন্ধকারের গন্ধ ব'য়ে আবির্ভূত হয়েছিল রাজলক্ষ্মী।
আর এই মুকুলতার ঝাঁকে-ঝাঁকে
এই যে ফুলের গন্ধ হাতছানি দিচ্ছে
তার প্রলোভন থেকে মুক্ত হওয়া কি সাজে আমাদের ?
কে জানে এই স্তূপীকৃত শুকনো সেওনপাতার মধ্যেই
কোনো ইতিহাস লেখা আছে কিনা ?

হঠাৎ পরশুদিন হ'লো—আষাঢ় থেকে পড়লুম শ্রাবণে।
চোখ বুজে গেল।···

চোখ খুলে দেখি—যৌবন অবলুপ্ত প্রায়,
অবসাদের ছায়া রক্তের প্রতিটি কণায়।
মাথার নিচে কঠিন পাথরের উপাধান
আর, ওপারে নীল আকাশে পড়ন্ত রোদ্দুরের ছটা,
আর তুমি—
আঁচলে চোখ মুছে হাসলে, হাসলে, হাসলে।
হাত দুটো বাড়িয়ে বললে—ধরো।

আমি বললুম—ধরবো না।
বাইরে ওপরে আমি কিছু ধরেছি—মনুন কিছু ধরেছি
যার খোঁজে যৌবন কেটে যাচ্ছে।
তুমি হাসলে।
পাথরের দিকে চেয়ে
বিস্ময়ে বললাম—তাখো। তুমি হাসলে।

আনন্দে বললাম—তাখো। তুমি হাসলে।
দুঃখে বললাম—তাখো। তুমি হাসলে।

অর্ধ নগ্ন এক নারীর প্রস্তর মূর্তি
কালবনের অন্তরালে মুখ ঢেকে প'ড়ে আছে।
আমি চেয়ে রইলুম…
প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বিচার করুন এই ঔদ্ভিন্নযৌবনার
বয়স কত হবে।
ঐতিহাসিক বিচার করুন তার শিল্পনৈপুণ্য,
ঐতিহাসিক সন্ধান করুন
কোন বিলাসপরায়ণ নৃপতির এটা ছিল প্রমোদকানন।
ও-সব বিচার আমি চাইনে, চাইনে, চাইনে।

আমি অবলোকন করলাম বসন্তের কমলাবর্ণ,
স্পর্শ করলাম নারীর কমনীয় দেহবল্লরী,
অনুভব করলাম পাথরের নবনীত কোমলতা,
দৃষ্টিপাত করলাম অনবদ্য অনুপম যৌবনে—
কালের সীমায় যা শুদ্ধ হয়নি,
জরার আক্রমণে যা আজো বিজয়িনী
তুচ্ছ যার কাছে মৃত্যুর করাল গ্রাস,
এ যেন অমরতার ব্রত নিয়ে
কালে-কালে স্ত্রীত্বের, যৌবনের প্রতিনিধি
অটুট, অক্ষয়।

* * * *

মনে পড়লো, আমি সেই উন্মাদ উদ্দাম অতিযাত্রী
নিলাবতে যার প্রেম শুদ্ধ হ'য়ে গেলো।

আষাঢ় ১৩৬২

আগাছার জঙ্গলে মেঘে এলো নীরন্ধ্র আঁধার.
আমার চোখে কিন্তু অস্ত গেলো না সূর্য।
তার আলোয় চেয়ে দেখি।
দুই বাহু প্রসারিত ক'রে তুমি তেমনি হাসছো।
এ যেন জীবন্ত মূর্তি, এই পাথর যার অনুকরণ।
সমস্ত পাথরের ইতিহাস স্থির ক'রে
আমার অবসন্ন দেহমনে উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে।
নির্জন অরণ্যে বিদ্যুৎ-চালিত হ'য়ে
চিৎকার ক'রে আমি ঘোষণা করলাম—
পারবো না, পারবো না আমি অবহেলা করতে
তোমার এ বাহুর ভঙ্গি, চোখের চাউনি,
মুখের উত্তপ্ত ওঠা-পড়া,
তোমার প্রাণচঞ্চল ঐ পদক্ষেপ।
ধরবো, ধরবো, নিবিড় ক'রে ধরবো।...
ধরলুম তোমাকে,
মুক্তিলতা কালের কেঁপে উঠলো
শুকনো সেগুনপাতা চাওয়ায় হ'য়ে গেলো
সজীব পাতায় লাগলো বাঁচন,
যৌবনের বুকে জাগলো ঢেউ।
নতুনত্বের অসীম সম্ভাবনা
ছেনো সেই ফুলের গন্ধে ছড়িয়ে গেল দিকে-দিকে।
তুমি তার মধ্যে হাসলে, হাসলে, হাসলে,
হেসে লুটিয়ে পড়লে আমার বুকে,
রক্তমাংসের কাছে পাথরের হার হ'লো সেদিন।

মুহূর্ত

বিকাশ লাহা

শুধু দিন, বিবর্ণ আকাশ।
বর্ষার হলুদ মতো চাষা দেয় দুঃসাহসী রক্ত।
বিরাজ নগর-গ্রাম, বিবাক্ত নিশ্বাস
কাঁপায় পাহাড়, বন, অথাধ প্রান্তর।

শুধু বুনো-যৌবাহির অলস শুশ্রূষে ছেয়ে
স্বপ্ন দেখে অরণ্যের মেয়ে।
চন্দন যোগ্যুধ কাঁপে, কড়িয়ের অন্যোষ ডানায়
জীবনের ছন্দ তার অফুরান আনন্দ জাগায়।
আমারো নির্জন মনে এক বাঁক স্বপ্ন করে ভিড়,
মুহূর্তের স্পর্শে মোছে সময়ের অনাদি চিহ্নিত।

শাদা

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তোমার ওস্টেলে
দ্বিপ্রহরে কোনোদিন গেলে
চোখে পড়ে আশেপাশে
খোপাদের ভীড়।
আঁটাআঁটি
ছোটো-ছোটো লাল-টালিঘর।
জীবনের শীতল আকর
পুকুরের নীল জলে। মাঠে আর ঘাসে
জাগতিক বসন্তবাতাস।
আর
শাদা-শাদা
কাপড়ের গাদা।

পা-পীষা যত্নের মতো ধবল কাপড়
এলোমেলো হাওয়ার জোয়ারে
যারে যারে শাদা ঝাড়ে।
ভ্রান্ত যেন পাই শুভ্রতায়
হঠাৎ দুপুরে কোটা অগণন রজনীগন্ধায়।

শাদায় সে-ভাক
আমাকে তো বার বার করেছে অবাক।
আমি চিরকাল,—
আকাশের রং দেখে নীলবর্ণ হয়েছি শৃগাল।

আমার আকাশময় অবিশ্বাস, ঘোঁয়া কালো-ধলো
তবু এ শাখার গান আমাকে কী দুর্বাদলীন
স্বাগত জানালো।

দুপুর-দুপুর ঘোরে সাদা পাতা চুপ।
মুখচুপ
সময়ের খালি-পায়ে ডাকে
ছন্দ শাদার ঘরে রাতে।
দৈনিক গ্লানির স্রোত দুই হাতে ঠেলে-ঠেলে শেষে
সে-সময় মনে হয় এইখানে এসে
তোমার বাসার কাছে
জীবনের পলাশের শুভ্র কটি বিফল কামনা
পাশাপাশি আজো শুয়ে আছে।
মনে হয়,
তবে বুঝি যাবনি সময়।
আজো বুঝি এই মাঠে, এই ঘাসে, নীল-ঢেউ জলে
এ-মলিন ছন্নছাড়া চরাচরে যা কেঁচে-কেঁচে
যাচ্ছা ভরা চলে।

সরীসৃপী

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাশাপাশি, তবু অদৃশ্য দেহ অন্ধকারে,
শত্রু প্রবল সাপের গর্বে ধর্বে ;
বেদমূত্ত পট, তবু ক্ষণে ক্ষণে বাত্যা বাড়ে :
দৃষ্টি কেন উড়ে যায় ঘোর হাত সন্ধে।
তবু এ-ই ভালো : বলুন সে চুপে,
নিশীথনিমিত্ত মহত ভূপে
যে-ভেষজ, তবু মুগ্ধ স্বপনে
করে সুন্দর নিত্য ;
পাশাপাশি, তবু চর্ম্য বিভায় আলোকিত অস্তিত্ব !

মানসীর চেয়ে মানবী তবুও কাম্যতর,
প্রকৃতিতে তবু মনে হয় অনুভব :
সে পরশ-পাশে বিস্তৃত হয় সৌরকর-ও :
উত্তাপে যাঁর মৃতসঞ্জিবন আজ।
সব ঘ্রাণ লাগে যদি সে না আসে,
নীল নির্জন বিষাদে বৃথা সে
আজো জলপট, বেদনা বিলাসে
সব সুর লাগে সুস্থ :
তবু শাদা যাঁর বিবিক্ত লাগে মতিভ্রমার গুরু।

মানসপ্রয়াসে জানি, জানি, তারে মনে হয় ধরা,
অনুরাগে ঘটি বৃথাই চিত্রকর।

একোন্মাদ বক্ষ আমার বাক্যহারা—
সে-বাণে বিমূঢ় করার শক্তি আর।
যদি সে তাকায় মদালস চোখে,
পটভূমি তবে সৌম্য আলোকে ;
লাজিনী বিথারি অসিত অলকে
জ্বলে খদ্যোৎ স্নিগ্ধ।
সতত সে ঘোর অন্তর্বিবাদে ভাব্য গগনে ধীর।

আজও ঘোমা চায় অপহাস বলি প্রতন পাপে :
ধূলিশরে ন্যাসী কণেকে বিয়োগ কাঁদি,
ধূর্জি ক্ষণসী তাই অতোনিশি সেই বিলাপে
অশ্রুদৃষ্টি ধূমে ধূসরিত কাঁথি !
প্রাজ্ঞ পুরুষ প্রোথিত প্রয়াগে :
চন্দনচাঁদ যদি স্মৃতি আনে,
আজও নায়ক সুরভি পরানে
বিরহে বিপ্রলব্ধ ;
তবু অপলক চয়ন অলখ তরে মৃদু পদশব্দ ;

নিদাঘে-প্রাবৃটে-শরতে-শিশিরে অন্ধ রাতে
তন্দ্রিপারবে স্রাবিত হৃদয় অন্ত।
যামিনী যাপিত নর্মসখীর বন্ধনান্তে,
সে জানে নিশুট কত কৌতুকী রঙ্গ।
বলল সে চুপে : তবু এই ভালো,—
অপরাহ্নে যে-মেঘ ঘনালো,
তারে ছিঁড়ে ফেলে প্রীত দীপ জ্বালো
যামল প্রতিমা আনতে।
তবু সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে লঙ্ঘিত অপরাহ্নে।

যেখানে তুমি

আবদুর রাহমান

আজো তো সাপের ফণার অবাধ
একটি আশায় যদি জ্বলে একা দীপ্ত কামনায়।
রুক্ষ দিনের তৃষ্ণা বুকে নিয়ে, হয়ে ধূসরান্তে কখনো নিঃশেষ
একটি আশায় রক্তিম হয়ে তুলি দিই রোজ।

সব দিকে যার বন্ধ দরজা, জানলা খুড়িয়ে
কাটে যার কাল জীবনের কস্তি হেলায় খুইয়ে,
জীবনের নীল বিদায় মুছে ফেলা করে যার নিপুণ আঙুল—
তারো আছে বাকি—কিছু তার বাকি, কিছু তার ভুল।

সুদীর্ঘজীবীর নিরেট ঘুমোয় দিয়েছি বিঁধিয়ে
প্রাণের ঘুরো : উঠবে কি আর কখনো ঝিকিয়ে
ছন্ন-ছাড়া সেই অমাবস্যার তারা-হীরে হয়ে? জীবনের ধন
একদা আমিও খুঁজিনি জেনে ফেলিনি কোথাও এক কণা তার, তবু তীক্ষ্ণ মন
হারিয়েছে কত প্রীত সকল প্রতারক ক্ষণে।
সত্তার বিরোধী ওঠে জড়িয়ে ত্রস্ত হরিণের মতো প্রাণপণে
চেয়েছি মুক্তি—জানিনি কালের মত্ত প্রতাপ হেলায় প্রাণের স্বর্গ গুঁড়িয়ে
করে খানখান : জীবনের ধন অবেলায় যায় নিবেদে ঘুরিয়ে।

অন্তরঙ্গ ছায়া-করা সেই প্রাঙ্গণে তুমি অজানা সাড়ায়
কোটাও প্রাণের মুগ্ধ মুকুল, নিত্য গানের ঝর্ণাধারায়
অবগাহনের ধীর মুহূর্তে ছড়াও তোমার অজস্র চুল, কালো উদাস—
তোমার সকল ভাবনা-ছড়ানো প্রাঙ্গণটুকু পৃথিবী আমার—তাই জানপাশ।

একটি স্বরের ছায়া রেখে মনে সকল সময়
হৃদয় আমার কতবার ফিরে বন্ধুর হাত প্রত্যাশা করে।
দৈবের কোনো গভীর সাড়ায় শুনি সবুজের ডাকাডাকি-ধূলি,
হাওয়ায় বেহালা-মেঘেদের ভুলি
ঘুরে ফিরে যায়: দেখি চোখ মেলে; অজানা আশায় কত ফাঁদি খুলি
কখনো আমার জানা ঘরের উঠানে ডাকে। তবু প্রাণে ভয়:
যেই উঠানে তুমি থাকো তার দূর অধিকার হারিয়ে কখনো যদি এ হৃদয়
কল্পনে ভরে, তা হ'লে কী ক'রে কী নিয়ে বাঁচবো—এতকাল ধ'রে
যেই তীব্র দৃষ্টি দুর্বিষহিলাম তা-ও যদি যায় কোনোদিন ম'রে!

আজো তো সাদের কণায় অবাধ
একটি আশার যদি জ্বলে একা দীপ্ত কবাধ।

তিনটি কবিতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

চতুর্দশপদী

আমি তার করবো না এ-কথা বলেছি বারে-বারে,
তরী বা তীরের কথা কিছুতেই মনে আনবো না ;
যতোক্ষণ আছে প্রাণ সন্তরণ ছাড়া জানবো না,
চলবো না যদি পথে সিন্ধুযায়ী বোঝা চাপে ঘাড়ে।
প্রেম, ভক্তি, প্রশান্তিকে এককালে সর্বত্র খুঁজেছি,
প্রেমিক যেমন ক'রে মধ্যরাত্রে খোঁজে প্রিয়তমাকে,
না পেলে বিবর্ণমুখে অন্ধকারে তাড়া করে যাকে,
অন্যায় তেমনি ক'রে ন্যায়ের বিরুদ্ধে যুঝেছি।

যৌবন-উৎসবে এসে আধা নেড়ে গভীর চুম্বন
তাকায় সতৃষ্ণে-পিছে, আর ভাবে কোন দিকে যাই
কলঙ্কিনী সত্যভাষ, কোনপথে যায় ভ্রান্তি হয়
যশোদীকে জড়াবে না, মাদুরে খুঁজবে না কভি।
শ্রীত্ব, ধর্ম—সৃষ্টি এলো, একে-একে সব অপগত,
সবার রূপসী নারী, আজো থাকি তাদি পদানত।

রমণী

মেঘ নয়, ঝড় নয়, শুরু-গুরু ধ্বনি তাও নয়,
ধোঁয়া নয়, বহ্নি নয়, অট্টহাসি নয় তো ভয়ের ;
বাহিরে প্রকাশ নেই, রমণীতে শুধু তার ঢের,
দুঃসহ পাষাণভার সে-রমণী নিরুত্তরে সয়।

সবি শান্ত নীলিমায়, সবি শান্ত মাটিতে প্রান্তরে,
সুদিন সকালে কিংবা বিপ্রহরে অথবা সন্ধ্যায়
সংসারের চাপা পথে জনতার জীবন গড়ায়,
অন্য দিকে ধমনীতে আদিমের বেদবিদ্ধ ঝড়ে।

সুখ, শান্তি, আতিশয্য সবি ঠেলে রেখে একদিকে
কী যেন আড়ালে খোঁজে যাযাবর তৃষিত যমনী,
বুকের উত্তাপ তাকে আজো টানে দিক হ'তে দিকে,
সর্বত্রই তীব্র বেগ, সর্বত্রই ত্রাস্ত পদধ্বনি।
বাহিরে প্রকাশ নেই, ভিতরে সে আগ্নেয়গিরির
গলিত উত্তপ্ত স্রোত প্রকাশের ব্যথায় অধীর॥

কথা

কাউকে কাছে পেয়ে বলতে পারিনি সেই কথা,
অথচ কথার চাপে রুদ্ধশ্বাস আমার জীবন ;
প্রত্যেকাল আমা ঘাটে তোমাকেই ক'রে অন্বেষণ
নিকট সান্নিধ্যে পৌঁছে কণ্ঠে তার করে নিরবতা
আসন্ন মৃত্যুর মতো ; সারা দিন সারা রাত ভ'রে
কতোবারে কতোভাবে ভেবেছি কী করে বলা হ'লে
অন্তরঙ্গ সখ্যতারে, কী কথায় দীপ হ'য়ে জ্বলে
উঠবে বাসনা-বেগ, হৃৎপিণ্ড বাজবে সজোরে

বুকে আলোড়ন তুলে। আর তুমি স্মিত অধরে
দীর্ঘ ম্লান শঙ্খ তুলে উঠবে ঈষৎ যেন হেসে
কী জবাব দিতে হবে ভেবে। আমায় অস্পষ্ট স্বরে
বলতে পারবো সব সে অধিক দুরাশা নিরেবে ?

আজিও হয়নি বলা যে-কথায় মাতাবো তোমাকে,
কথা ছেড়ে কথা রবি ; সবগুলো প্রতীক্ষায় থাকে॥

প্রাণশিল্প

শান্তিকুমার ঘোষ

মানুষের ভিড়ে মিশে তাদের উৎকণ্ঠা আমি নিয়েছি হৃদয়ে,
নশ্বর জীবনভোর সত্তায় শিকড় মেলে একান্ত উন্মুখ :
দুঃখের হাহাকার হরন্ত হাসি কত রেখেছি বাঁচায়ে ;
নিঃসঙ্গ যদি বা দিন, সৃষ্টির গভীরে শুধু জাগে সব দুঃখ।

অন্ধ যুক নারী কোন আদো আলো, স্পর্শ, গান খোঁজে সারা দিন,
প্রতিটি প্রত্যন্ত তাকে, চেয়েছি, পাপড়ি ছিঁড়ে কোটাক সহজে।
ছুতোর পালিশ রেখে ছেলেটি প্রতীক্ষা করে পাথরে কঠিন :—
প্রেমের সন্ধানে তার স্বর্গের চাবি ছুড়ে জলন্ত অক্ষরে।

অনেক কবি ও শিল্পী হৃদয়ের গাঢ় রঙে এঁকেছে পৃথিবী
কী এক আগুনে পুড়ে উত্তাপ ছড়িয়ে গেছে মরণ অবধি।
'কালকে উজ্জ্বল ভোর'—আশা নিয়ে ডুবেছিলো সমুদ্রে নাবিক ;
গভীর প্রত্যয় প্রেমে অন্ধকারে রেখে গেছে বিস্তীর্ণ পরিধি।

জীবনকে শিল্পে ধরা অবিরাম পটে তাই আমার এষণা—
রূপাবলী এঁকে যাই উপন্যাসপ্রতীকে কত তড়িৎ রেখায়,
অঘোষ ভূমিতে ফোটে অন্ধকার-কেটে-পড়া সূর্যরশ্মিকণা :
মহাদেশ লোকালয় কাঙ্ক্ষিত পৃথিবী এক মানবিক প্রেমে।

'পারাপার'-প্রসঙ্গে

গত দশ বছর ধ'রে 'পারাপারে'র এই কবিতাগুলি একে একে মনের মধ্যে সঞ্চয় ক'রে চলেছি। তার মধ্যে আমি বিশেষভাবে আপনকালের সুর এবং সবার চেয়ারা দেখতে পাই। কৈশোর পার না-হ'তেই একালের যারমূর্তি হাজির হয়েছিল আমাদের সামনে। তারপরে তারা সে-সুযোগ এখনো কাটার লক্ষণ দেখছি না। যা কিছু সুন্দর, সৎ এবং মহতের আসর তার সবই যখন চারদিকে ক'মে পড়তে লাগল তখনো পরীক্ষিত অক্ষয় জীবনে যদি কোনো আস্থা রেখে থাকি, তার মূলে এই কবিতাগুলির স্থান অনেক পরিমাণে রয়ে আছি। এবং, আমার বিশ্বাস, আমি একা নই। অঘটনের সবটা মেনে নিয়েও, দুঃখের ধুলোবালিতেই অবিরত চিরন্তনের কিছু সন্ধান দিতে পেরেছিল এই সব কবিতা। হকের কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে উঠে অস্তিচারী সে-সব দিবারাত্রি কোথায় ডুবে গেছে। কাব্যের চোখে না-দেখলে, আপাত-তাৎপর্যহীন চলতিকালের প্রকাণ্ড অংশটা সেদিন তারা ক্ষতির তালান ক'রে উঠত। তাই 'পারাপারে' গ্রথিত সেই সব কবিতাবলী হাতে নিয়ে এই উপলক্ষে কবির কাছে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

'পারাপারে'র কবিতা পড়তে পড়তে বাংলাকাব্যে অভাবিত একটি চিরপথিক মনের চরিত্র ক্রমে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। অনেক দেশ-দৃশ্য-দৃশ্যান্তর ছাড়িয়ে, বিচিত্র সংসারের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে, সেই পথিকের মন আরো কোনো দূরে চ'লে গেছে। এই ব্যাকুল অস্থির পথিকমূর্তির উপলব্ধি তাঁর বেশির ভাগ কবিতার প্রেরণা। অথচ তিনি যে বাস্তবিমুখ, উদাসীন সে কথাও তাঁর কবিতা প'ড়ে মনে হয় না। বরং 'তারুণ্যশ্রী নির্জনমনস্কতা'র অনুভবস্তরে মনের প্রতি ছলছল মমতার ভাবই সেখানে ব্যক্ত হয়েছে। 'বাঙলার সুচিরদীর্ণ বাড়ি ফেরার আশা' বারবার প্রসঙ্গেই ঘুরে ফিরে আসে, যেমন নিচের কবিতাংশে :

* পারাপার। অমিয় চক্রবর্তী। সিগনেট প্রেস, ৭৮

কলকাতা : ভিয়েৎনাম

পথলা বড় ক'রে বকুল ফুলের মালা, এলো
বসন্ত সন্ধির বন্ধু বৃষ্টিধারা একটি সে কার্তিক
ফুল্ল-সংকীর্ণ গলি, কোথা সেই সরলা নারীর
গাঢ় পরিচ্ছন্ন ভাষা। ভিক্ষাজীবী। প্রবাসী পথের
ধুলোয় ধূসর চিঠি। স্নেহ-ঘন মনের সান্ত্বনা। (শিউলি বা')

কবিতা বিদেশের ঘরে নিরালোতে জর্মান অরণ্যতট শুনেও মনে পড়ে 'মন্ত্র পাঠে জলসী বৈরবী'র তাজতী ফুলদলের ছবি। এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো রচনায় বাংলার প্রতি এমন স্নেহাতুর মমতা এবং ভালোবাসার কথা পড়িনি। অথচ কবির চক্ষুবর্তী, বলতে গেলে, জন্মপ্রবাসী।

মনে হয়, প্রেম কল্যাণ এবং মনুষ্যত্বের তাঁর মতো প্রত্যয়ী কবির পক্ষে এই ধরনের পথিকবৃত্তি অনিবার্য ছিল। মানুষের সংসার এবং জীবনকে কেন্দ্র ক'রেই তাঁর মনের সমস্ত কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা। তার ফলে সমাজ সংসারের প্রতিটি দুঃখ গ্লানি বিকার তাঁকে শুধু কবি হিসেবে নয়, সামাজিক মানুষ হিসেবেও বিচলিত করে। মনের এই স্বভাব নিয়ে এ-দুর্যোগ কল্যাণে এবং মঙ্গলে আস্থা রাখতে পারাটা প্রায় অবিশ্বাস্য। জটিল সাম্রাজ্যিকের পটভূমি ক্রোধে হিংসায় আগুনে আর্তনাদে ধ্বনিত হচ্ছে। দুই প্রলয়ংকর যুদ্ধ গেল।[১] সর্বস্ব-খোয়ানো অসহায় মানুষের ভিড় দেশবিদেশের পথে ঘাটে। এই সব কিছুকে আমার আগলে দাঁড়িয়ে আছে বিজ্ঞানের দারুণ দৈত্য, তার আকাশ-প্রমাণ হা। হত্যার উৎকণ্ঠায় অবিশ্বাসে মানুষের সংকীর্ণ নরক আবিল হ'য়ে উঠেছে। সকালের এই চলচ্ছবি 'পারাপারে'র বিভিন্ন কবিতায় বিস্তৃত দেখতে পাই। বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষী মৃত্যি বোমাবাজির পরীপমে একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়নি। কোরিয়ার মানুষের হাহাকার, আফ্রিকার 'উচ্চনীচ জাতমানা দলের' অপকীর্তির বেদনা, জর্মানির 'বোমা আজ অবসানে' সবই ধরা পড়েছে কবিতায়। এই অবস্থার মধ্যে চোখ বুজে বিশ্বের দিকে মন ফেরাতে পারা আদৌ সম্ভব এবং সংগত কিনা সন্দেহ।

মুক্তি ছেয়ে, কেউ দেখতে পাই আশ্রম অন্বেষণে মুখরিত রাজনীতির শিবির ;
গির্জে ঘরে ক্রুশের পরশ নিয়েছেন অনেকে। অন্ত যারা দায়হীন সুখ-যৌবনতায়
কাটান, তাদের মত রজনী পাড়ার পাড়ায় ওলটায়। ধর্ম বাতিল, বিজ্ঞান
বিমুখ, রাজনীতি অন্ধকূপে। কিন্তু আর কোনো পথ যে অভিযাত্রী সন্ধানী
মানুষের সামনে খোলা নেই তাও নয়। ভারতবর্ষে গান্ধী সে-পথের সন্ধান
দিয়েছিলেন, সৃষ্টিহীন মানুষের সহযাত্রী দীর্ঘের পথ। আন্তর্জাতিক কল্যাণ-
পন্থীদের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর যোগ দীর্ঘকালের, এ-কথা স্মরণ রাখলে তাঁর
অন্তহীন পথিকমনস্কতাকে আর শুধু প্রেমের ফের ব'লে মনে হবে না। মানুষের
যে পরাজয় নেই, প্রাণের আরোগ্যশক্তি যে অযোধ, সেটা দেখে দেখে
কল্যাণব্রতী সৃষ্টিধর্মী মানুষের সঙ্গে মিলিত কর্মযোগের মধ্যে দিয়ে তাঁকে
প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছে। কবির পক্ষে প্রত্যয়ী হওয়ার এটাই একমাত্র
পন্থা, সে কথা বলতে চাই না। কিন্তু নিজের ও সমাজের বিচিত্র পারিপার্শ্বিক কারো
সঙ্গে যদি এক হ'য়ে গিয়ে থাকে, একের অভিজ্ঞতা যদি অন্যকে প্রভাবিত
করে, তাতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে কবি এবং
কল্যাণব্রতীর ভাবনা এক হ'য়ে মেশা দিয়েছে। আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিদের
মধ্যে এ-বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র এবং একক। রাবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—আনন্দের যথার্থ
মুক্তিটা সহযাত্রী দুঃখের সঙ্গে ; মলার্মে যুগের কবি বলেছেন—সহযাত্রী সুখ নয়,
বেদনার সঙ্গে। ভারতবর্ষে গান্ধী, ধর্ম-আফ্রিকায় আলবার্ট শোয়াইৎজার তাঁদের কর্মের মধ্যে এই উপলব্ধির পূর্ণ অভিজ্ঞান রেখে গেলেন।
'পারাপারে' বহু কবিতায় এই মনোভাবের লিখিত রূপ আমাকে গভীর ভাবে
স্পর্শ করে। অর্থাৎ এর মধ্যে গ্রাম্যযাপনের চোখে দেখা দেশবিদেশের
বিবরণ নেই।

মনে মনে করেছনু অর্ঘরচনা শেষে আপনার
তোমারেই দৃষ্টি দিয়ে খুঁজি ইচ্ছা অন্তরেবাহির,
যে প্রসাদে ধন্য করো তোমাতায় নত হাতাকাশ। ('ভূমিলক্ষ্মী')

আষাঢ় ১৩৬২

এতে আছে আমাদের মধ্যবিত্ত বাসনার একটি সর্বজনতাত্ত্বিক সুর, যা শুনে আমাদের বিশ্বাস হ'তে পারে যে 'আধিবিকল্প তত্ত্ব নেই তারা ঠেকবার।' জীবনে জীবনের গূঢ় সংযোগ ঘটিয়ে, সমবায়ী সাধারণ মানুষের মধ্যে এক একত্বের সন্ধান চলেছে আজ। তার রিপোর্ট সংবাদপত্রে নেই, কবিতায় চিহ্নিত আছে। উৎসর্গপত্রের ক্ষুদ্র কবিতাটির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আলোচ্য কবিতাগুচ্ছের একটি প্রধান সূত্র ঐ থেকে আমরা খুঁজিয়ে নেওয়া যাবে।

২

এই কবিতাগুলি দশ বছর ধ'রে লেখা এবং সংখ্যায় পঞ্চাশের বেশি। কাজেই প্রকরণ এবং উপাদানের মধ্যে সর্বত্র কোনো প্রকট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিষয়ের মধ্যে স্থির মহাদেশ ভ্রমণের প্রাসঙ্গিক রচনা সংখ্যায় বেশি। অল্পস্থিতে বিরহ লিরিক, অব্যবস্থিতের সংস্পর্শ একাকার সুখ সংঘর্ষী প্রেমের, মৃত্যুর, এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কবিতাও কম নেই। ফলে এই গ্রন্থে এমন একটি বিস্ময়কর বহুবৈচিত্র্যের সমন্বয় হ'য়েছে যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। বৈচিত্র্যই প্রধান কথা নয়, বিষয়গত অতীত বাক্যের আড়ালে রচিত কবিতার আধিক্যও লক্ষ করবার মতো। চলমানবেগের প্রকাশ কারণে অমিয় চক্রবর্তী সর্বদাই অতিমাত্রায় কুণ্ঠিত। চোখ-ইসারা-জানানো বা গলা-নুইয়ে আসা ভাব তিনি সযত্নে পরিহার করে চলেন। স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে, তাঁর রচনায় কোথাও 'চাই' কিংবা 'আহা' দেখিনি। বাম দক্ষিণ উত্তরপন্থী বাঙালী কবির রচনাতেই এটা একটু অপ্রত্যাশিত। অমিয় চক্রবর্তীর মনের চরিত্রই এই রকম যে তাঁর লেখা মৃত্যুশোকের বিদীর্ণ কবিতাতেও আত্মবিস্মৃতির ভাব নেই :

> মুখে প্রণাম এঁকেছি ঘরে, চলনে ভাই,
> তবে চিঠিতে কম বলেছি শুধু, যাই
> —যাই।

অনুযোজনের চিহ্ন সবটাই মুছে ফেলা হয়েছে। ঐ 'জানো ভাই' শব্দ দুটি যন্ত্রতো ঈষৎ বাস্পাঞ্চল। প্রত্যক্ষ দুঃখ বেদনাকে ছুঁয়ে, কখনো তাচ্ছিল্য, কখনো যন্ত্রণার মতো সৌকর্য এবং দৃঢ়তা আছে এর মধ্যে। এবং এটাই তাঁর প্রেমের কবিতারও বৈশিষ্ট্য। সেখানেও আশ্চর্য সংযম এবং মুন্সীয়ানার সঙ্গে, ছবির ভাষায়, অল্প পাঁচটা স্পষ্ট কথা বলবার মতো ক'রে কণ্ঠস্বর অবিচলিত রেখে অল্প বলা। বুকফাটা ভাষার চেয়েও দুঃসহ শোক মানুষ জানতে পারে। সেখা দিয়ে মিলিয়ে যায় না, প্রাণের শক্তি দিয়ে আত্মীবনের সাধনায় কচিৎ কখনো যে-শোককে বশ করা যায় হয়তো, যখন তা আর আমাদের বুকখান, বিহ্বল এবং বিক্ষত না রেখে, রূপান্তরের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে শক্তি এবং মুক্তি—সেই অনুচ্ছ্বাস শোক তাঁর প্রেমের কবিতায় স্তব্ধ হ'য়ে আছে। এই রকম একটি ছোট্ট লিরিকের সবটা এখানে তুলে দিই :

এবার বলল সেদিন—
সবকিছু ঐ সুখ সুখের
এলে ঘনাবে বন্ধ দুয়ের
আলোয় ভরা ঘর—
তুলে শোনাবো আমার ভালটা
বোঝাব তোমায় শুদ্ধ পালটা
ভরল হৃদয়টা—
এতদিন বুঝে সবই নেবে।

আর বলল সেদিন—
সাদা আকাশ কিছুই-না-এই
খোলা জানলা তুলো পাখির
কারাবার খালি—
মেঘলাদিনে ছাতের ঘুরে
নক্ষত্রালো এই দুপুরে
ঘিরে কেউ-না-একলা
এত কি তোমার মেঘে॥

কাহিনীগত অনুষঙ্গের সবটাই এখানে না-বলা, অবশ্য পাঠক যদি প্রথম পংক্তির প্রথম পর্বকে এড়িয়ে যেতে পারে। উদ্ধাস অদ্রির চক্রবর্তীর কাব্যে কোথাও

নেই, মূলত হৃদয়বেগ থেকে যার জন্ম সেই প্রেমের কবিতাতেও না। তাঁর ভক্ত পাঠকের সংখ্যা এখনো যদি আশানুরূপ না হয়ে থাকে—এটাই বোধ করি তার প্রধান কারণ। বিবিধ সংকর্মী সুরের এই প্রেমের কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় গৌরব হয়ে রইল।

প্রেম আর সৌন্দর্যোপলব্ধির সমুন্নত মানুষের প্রতি গভীর প্রত্যয়ী এই কবির এ-গ্রন্থের কিছু কবিতায় আলো কোনো চিহ্নের সন্ধানী দেখতে পাই। একজনের ব্যবধান সত্ত্বেও সেখানে তাঁর আত্মীয়তা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। আধুনিক বাংলা কাব্যে তিনিই যে এখন একমাত্র 'মিস্টিক' কবি, 'পাষাণার' পাঠ করার পর সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। অতিলৌকিকের আভা-দেওয়া এই কবিতাগুলি পড়ে বিস্ময় বোধ করি। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সঙ্গেই কাব্যে আধ্যাত্মিকতার যুগ শেষ হয়েছে ব'লে ভাবতেই আমরা অভ্যস্ত। অথচ নিঃসংশয়ে আমাদের যুগেরই পুরোধা কবি অমিয় চক্রবর্তী আধ্যাত্মিক। যে-জটিল সন্ধেতে টীকা তার ছায়া করে আছে আধুনিক পাঠে' তার প্রতি তিনি কিছুমাত্র উদাসীন নন। এবং তিনি যে-অলৌকিকের কথা তাঁর কবিতায় ব'লে থাকেন সে-অলৌকিকের প্রত্যক্ষ রাখা এই অস্তিধাত্রার বাস্তব পৃথিবীরই সংসার প্রকৃতি। সৃষ্টিছাড়া বৈরাগ্যের মধ্য দিয়ে পৌঁছনো যায় না, রূপের কারুকৃতির মূর্ত মনকে আঘাত করলে, তখনই বিশ্বের আত্মার পরম ঐক্যকে দেখতে পাই, বাহিরের আবরণ যখন খ'সে পড়ে :

> ভিতর না, এই তো ভিতর, আমার হৃদয়ের কিছু বাকি।
> আকাশের ঐ ওই নেত্রের হরিৎ পূর্বদিকে :
> প্রথম শিশুর চক্ষে যা'র ছায়া। নৌকা মহিমা ;
> ত্রিভুবন জুড়ে কলা এর চেয়ে কোথায় অসীমা ?
> আকাশের কান কালা, তৈল আই হয়েনার খেঁকে,
> প্রত্যেক মানুষ তৈল—
>
> ('কোথি আমিতাভ')

হেন দৈবতার দৃষ্টিকে নমস্কার। প্রত্যক্ষ সর্বলোকের প্রতি মমতাভরা এই আত্মীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতী মন নূতন মূল্যচেতনায় সংগতি পেয়েছে।

অপার্থিবতার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিতে হলে যাদা-ট্রেন-থেকে-দেখা গাঁয়ের বসতি, ঘাট, লোকের আনাগোনা—এটুকুই তাঁর চোখে যথেষ্ট। অন্যত্র দেখতে পাই :

আমার ঐ মেয়ে ফুলে-ফলে ভোরটিকে
যাদে ফেলে ছুটে,
সাঁঝ বাতে ফেলে তাকে ঘুমে ঘুমে ঘোরে।

এই ছত্রের মধ্যেই 'ধূলোর প্রত্যহে দেখা' অলৌকিকের আভা লেগেছে অমিয় চক্রবর্তীর পরিণত কাব্যে। সাংসারিকতা এবং দৈবতার দৃষ্টিকে একই সময়ে এ-ভাবে কাব্যে ধরা দিতে পারা তুলনীয় সার্থকতা ব'লে মনে করি। সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে একটি প্রবল নতুন সুরের যোজনা করলেন তিনি।

৩

অনেকের ধারণা, প্রচলিত ছক-মিলের বে-ঘাটের সঙ্গে আমরা পরিচিত, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা কেবলই তার সঙ্গে আড়ে চলে। এবং তাঁর অধিকাংশ রচনাই দুরূহ। এ-অভিযোগ যদি সত্যও হোতো কাব্যের সার্থকতা বিচারে তবু সে-প্রশ্ন অবান্তর। তাছাড়া প্রকরণের ঐতিহ্য-মানা রচনাতেও তাঁর দক্ষতা যে কত অসাধারণ তার দৃষ্টান্ত 'সাহানায়ে'র একাধিক কবিতায় উপস্থিত। প্রচলিত পদ্ধতি-মানা, অথচ পদে-পদে চমক লাগানো। অমিয় চক্রবর্তীর অমিল ছন্দের বৈশিষ্ট্যের কবিতা আমার কাছে কম প্রিয় নয়। কিন্তু, বোধ করি, স্মরণশক্তির সহায়ক বলেই, তাঁর সমিল কবিতাবলীর দিকেই আমি অধিক আকৃষ্ট বোধ করি। ছন্দের মধ্যে প্রায়ই অক্ষরবৃত্তের ব্যবহার করেছেন। ক্বচিৎ মাত্রাবৃত্তও চোখে পড়বে। কিন্তু স্বরবৃত্তের সাহসী দিলুল ব্যবহার কিছু কবিতায় যে-রকম আসাড়-হালকা চালের নাটকীয় গুণ এনে দিয়েছে, সেটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টান্ত—'সাবেকি', 'বৈশাখিক', 'লিরিক', 'নিশন্তে' ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে স্বরবৃত্তের ব্যবহার নিয়ে একটু তর্কে প্রবৃত্ত হতে চাই। প্রায় ছড়ার ছন্দই স্বরবৃত্ত একথা মেনে নিয়েও সম্প্রতি কেউ কেউ বলছেন, এ ছন্দের পর্বে পর্বে

চারমাত্রার কড়া আইন কোথাও শিথিল হলেই ভাঙ্গে যাবে। ছন্দনায়ী কে-বিদ্যাটি দিন, রচিত বাংলা কবিতায় কে কবে এ আইন মেনেছেন ?

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান'

এ যদি বাংলা ছড়াতেই চ'লে গিয়ে থাকে তাহ'লে আধুনিক কবির লেখায় দেখতে পেলেই তাকে কাঠগড়ায় তুলব কেন ? আসল কথা কি এই নয় যে কানের সঙ্গে ছন্দটা যেন অত্যাচার হয়ে না দাঁড়ায়। কানের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে মনের সঙ্গে ধড়ফড় করা যায় না। কিন্তু যা চলে, তা চলবে।

১। সকাল যদি প্রকাশ পায়,—
বেরিয়ে এলেই শেষ। ('হৈমন্তিক')

২। ভিতরে কতো ছলনা রয়, কখনো বেলা সমাপন (.)

৩। [illegible] অমিয়ের মন্ত্র ধ্বনি ভেসে হলো অদৃশ্য ('সাবেকি')

অবশ্যই লেখা এসব পংক্তি চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব নিয়েও কবিতার কোনো ক্ষতি সৃষ্টি করেছে বললে মানব না। বাংলা ছড়াতে রবির যদি নাও থাকতো। শুধু এই বিষয়তাটা অবশ্য বাংলা কবিতাকে চলে যাবে। অন্তত এ ভাবলেই চলে যাবে যে অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুর মতো ছন্দ-কুশলী জ্যেষ্ঠ কবিরা তার মুক্ত ব্যবহার করতে পেরেছেন।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা দুরূহ—এ অভিযোগ বিষয়ে সহজে আমি মনস্থির করতে পারি না। দুরূহ না ব'লে 'সহজ নয়', এবং তাও কখনো-কখনো, এই রকম দুরূহতা বলা চলে। চলতি ভাষার ইডিয়ম, এবং প্রাত্যহিক সহজ শব্দের ব্যঞ্জনাময় ব্যবহার আধুনিক জ্যেষ্ঠ কবিরা সবাই প্রায় ক'রে থাকেন। জীবনানন্দের লেখায় তো হয়ে হয়ে। কিন্তু অন্য প্রত্যেকের মধ্যেই হয় বিন্যাসের, নয়তো বিশেষ-বিশেষ শব্দের নির্বাচনে, কিংবা সমগ্র বাক্যের গঠনে, কোথাও কোথাও দেখা যাবে মৌখিক সহজের স্পষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গেল। আমার মনে হয় একমাত্র অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাতেই স্বাধীন অথচ সংস্কৃত যে-চলতি ভাষা, সে তার আটপৌরে

হালের পোষাক দিয়ে, নিষ্ঠাকৃতাবে একেবারে বাংলা কাব্যের সাধনের সামিল গিয়ে আসর নিয়েছে। যৌগিক গদ্যের তাবার পদবিন্যাসের দীর্ঘতা অপ্রাহ্য, আমির চক্রবর্তীর বাক্যগুলিও সেই কারণে ছোটোখাটো, অনেক সময় ভাঙা-কাটা। গদ্য থেকে গদ্যে আসতে গেলে কিছুই তেমন করার নেই। তবে এখন পর্যন্ত কবিতার পংক্তিতে, বাক্যের শব্দ পরম্পরা সময় সময় একটু ওলোটপালোট করতেই হয়। তখন মাঝে-মাঝে ছন্দও লাগা অসম্ভব নয়। যেমন, 'ওক্রাকোমা' কবিতার এই শেষ স্তবকের পংক্তি :

> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]।

অন্যত্র 'লাল ঘরনা' কবিতায়

> [illegible]

এই বাক্যে 'পরিষ্কার' কথাটা বিশেষণ, না বিশেষ্য? 'ফক্ক' যদি ফকফকা, তাহলে 'পরিষ্কার' [-টা] ই তো কর্তা? তবে, এমন দুটোকে খুঁজলে আর কয়েকটা একটু ছুট পাওয়া যাবে। কাজেই ছন্দহত্যা যদি কোথাও থাকে তো তাতায় নেই। কিংবা তাতায় ব্যবহারে আছে, শব্দচয়নে নেই। এবং তাতায় যখন ফাঁকি সেখানেই ছন্দত, কবি যেখানে কাব্যপ্রসঙ্গকে অতি বিশদ করতে অসন্তুষ্ট। 'ওক্রাকোমা' কবিতাটির উল্লেখ ক'রেছি। সেই না-বুঝেও যে-সব কবিতা আমরা ভুলতে পারি না, এ-কবিতাটি সেই রকম। অনেক প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় ক'রে আসতে পারে 'সাক্ষাৎ সন্তান এই দেহেছ কি এটে এখনে?'—কে কাকে প্রশ্ন করছে? উপলক্ষ্য কোনো আত্মহত্যা? ('মোক্ষো অবসান')। 'সাক্ষাৎ সন্তান' কিসের? (উত্তর—'কে তুমি?' কিনা?) ক্যাথলিক নির্দেশের পরেই কাকের প্রসঙ্গ কেন? (ক্যাথলিক বিয়ে আত্মার মুক্তি নেই। তবে, হায়, কাকের আত্মার কী

হবে। কথাটা কি এই?)। সাহেবের পাশে টমাস্টি কেন,—সব কিছু জিজ্ঞাসার সমাধান ক'রে দেবো বাস্তবমিটের আবছায়ে এবং নির্ঘণ্ট অন্যোতাবে বুঝিয়েছে কিনা? এবং কবিতাটির মোট কথার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' কবিতার ঐক্য আছে কিনা?

> বিশ্বের সে দূর
> সে এক প্রান্তিল পশ্চিম সাগরতীরে,
> বিদায় সন্ধ্যায়—
> কে তুমি।
> সেদিন না চিনি।

বলা বাহুল্য, বিশদ নয় ব'লে আমার কোনো অভিযোগ তো নেইই, বরং বেশির ভাগ কবিতার তার ফলে যে প্রগাঢ়তা এবং সংহতি এসেছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ বোধ করি। ভাষা-ছন্দের আশ্চর্য মিতব্যয়িতা না থাকলে 'বিনিময়', 'পদ্য', কিংবা 'লিরিক'-এর মতো কবিতা কখনো সম্ভব হোতো না।

'পালাপার' কাব্যে ছন্দ এবং ভাষার এই আশ্চর্য মূল্যনী ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে। ভাষাছন্দের মূলকম্পনীরসর্ব বাংলা কাব্যে এখন বিগত বললেই চলে। তার মধ্যেও 'পালাপার'-এর স্বতীক্ষ্ণ অস্তিত্ব। শৈলবাদের আপেক্ষিক ক্ষীণতা অনেক অগ্রসরমান পাঠকদের এখন পর্যন্ত কিরিয়ে দেয় ব'লে জানি, কিন্তু বাংলা কবিতার ধ্রুব আজ অনিবার্যভাবে এই দিকেই।

সরোজ গুহ

পালাপার। বুদ্ধদেব বসু। সিগনেট পালাপার। মূল্য তিন। ২৮১ থেকে ২৯৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। পূর্বাশা লিমিটেড-এর পক্ষে প্রবাস বসু কর্তৃক ৩ অবনীশ্বর মুখার্জি লেন হ'তে মুদ্রিত ও কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ থেকে পালাপার কর্তৃক প্রকাশিত।